ঝড়ের পাখী

ঝড়ের পাখী

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পৌষ—১৩৩০

দুই টাকা
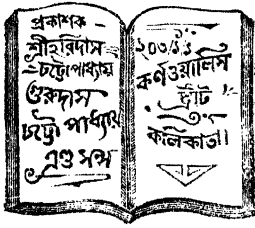
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবি-বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের করকমলে—

——বিবর্ত্তনে মানুষের হাত, পা, আকৃতিরই শুধু পরিবর্ত্তন হয়েছে। পশুত্বের খোলস তার অঙ্গ থেকে ঝরে গিয়েছে বটে, কিন্তু তার আসল জায়গাটা পশুই থেকে গিয়েছে। তাই অমানুষরা আসল মানুষদের মহামানুষ বলে কল্পনা করে।——

ঝড়ের পাখী

১
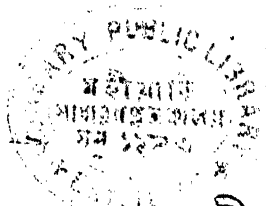
সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ী-বুকে জাপানী ছবির মতন ছোট্ট একটি সহর। সহরের চারিদিকে দূরে দূরে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, উট ইত্যাদি নানান্ আকারের ছোট বড় পাহাড় মাথা উঁচু কোরে চিরদিন এই ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, আজও যেমন দাঁড়িয়ে—। দূরের এই রহস্যময় পাহাড়গুলো চিরকাল ধরে পল্লীবাসীদের কল্পনার খোরাক জুগিয়ে আস্‌ছে। বৈশাখের জ্বলন্ত দ্বিপ্রহরে পাহাড়ের চূড়োয় যখন দাবানল জ্বলে উঠ্‌ত, সরল সাঁওতালেরা তখন ভাব্‌ত, দেবতা বুঝি খুসী হোয়ে তাদের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে; আবার শ্রাবণের কাল মেঘ যখন সেই বিপুল কাল পাহাড়গুলোকে নিজের কোলে টেনে নিত, বিস্ময়ে অবাক হোয়ে তারা ভাব্‌ত, দেবতা কোথায় সরে গেল!

আকৃতি অনুসারে সেখানকার লোকেরা এই পাহাড়গুলোর এক একটা নাম দিয়েছিল। কোনটার হাতীবসা, কোনটার নাম ঘোড়দৌড়। সহরের বুকের ওপর দিয়ে একটা চওড়া বালির রেখা এঁকে-বেঁকে দূরে শালবনের ভেতর দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে, সেটা একটা পাহাড়ে নদী। বর্ষার সময় অতি ক্ষীণ একটা জলের ধারা সেই রৌদ্রতপ্ত বুকে একটুখানি ঠাণ্ডা প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়—পুত্রহারা জননীর মৃত সন্তানকে স্বপ্নে বুকে পাওয়ার মত।

ঝড়ের পাখী

অনেক দিন আগে নাকি একবার বর্ষাকালে এই নদীতে প্লাবন এসে দেশ ভাসিয়ে দিয়েছিল, সাঁওতালদের মুখে সে গল্প-শুনতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের গায়ে ক্ষেতগুলো থাকে-থাকে সিঁড়ির মতন সাজানো রয়েছে। এই ক্ষেতের ফসল খেয়ে আর তাদের পাকা সোনার মতন রং দেখেই সাঁওতালেরা সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে দিত।

জায়গাটার নাম সোনালী। কে যে এখানকার এমন বাহারের নাম দিয়েছিল তা জানা যায় না। অনেক দিন আগে একদল ইংরেজ এই অঞ্চলে বেড়াতে এসেছিল। তারা পাহাড়ের গায়ে এই সোনালী রংয়ের ফসল দেখে মুগ্ধ তো হোলোই, উপরন্তু সেখানকার মাটির নীচে যে থাকে থাকে সোনা ফলে আছে সেটারও সন্ধান নিয়ে গেল।

সহরের পত্তনী হবার আগে এখানে খনির ইংরেজ মালিকরা আর তাঁদের জনকয়েক বাঙালী কর্ম্মচারী ছাড়া এ-অঞ্চলে কোন ভদ্রলোকের বাস ছিল না। ক্রমে এক এক কোরে সৌখীন বাঙালীরা এদেশে হাওয়া বদ্‌লাতে আস্‌তে আরম্ভ করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এদেশে বাড়ী তৈরী কোরে বসবাসও সুরু করলেন। আস্তে আস্তে জায়গাটা একটা ছোট-খাট বাঙালী উপনিবেশের মত হোয়ে দাঁড়াল।

পল্লীবাসীদের অধিকাংশই ব্রাহ্ম পরিবার। এঁরা আবার দুটো তিনটে আলাদা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেদের একটা কোরে আলাদা উপাসনা-মন্দির তৈরী করলেন। দিন যাওয়ার সঙ্গে সোনালীতে লোকও বাড়্‌তে লাগ্‌ল, লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোঁট, দলাদলি প্রভৃতি মানুষের যত রকম দোষ-গুণ আছে সেগুলোও সেখানে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শেষে সেই দুশো কি আড়াইশো ঘর লোকের মধ্যে পাকা তিনশোটী দল হোয়ে দাঁড়াল।

পল্লীবাসীরা বেশ সুখেই তখন দিন কাটাত। তার কারণ, জিনিষ-পত্তর

সেখানে ছিল খুব সস্তা! আর পেটের চিন্তা তেমন না থাক্‌লে দলাদলিগুলো যেমন জমে, এখানে তার কোনই ত্রুটি হোতো না,—তবে ক্রমবিকাশের ফলে এখানকার কলহগুলির মধ্যেও একটুখানি মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যেত।

ব্রাহ্মরা নিজেদের বিশেষত্ব বজায় রাখবার জন্য সম্প্রদায়-বিশেষে সেখানে নিজেদের আলাদা উপাসনা-মন্দির স্থাপন করলেন। প্রতি বৎসর উৎসবের সময় তাঁদের মধ্যে উৎসবের জাঁক-জমক নিয়ে বেশ প্রতিযোগিতা লেগে যেত। কিন্তু ক্রমেই তাঁদের এই উৎসাহ কমে আস্‌তে লাগ্‌ল; কোন কোন বছর হঠাৎ দেশলাইয়ের বাক্সে আগুন লাগার মত তাঁরা দপ্‌ কোরে জ্বলে উঠ্‌তেন বটে, কিন্তু সেটা স্থায়ী হোতো না।

কয়েক বছর সোনালীতে কোন উত্তেজনার অভাবে পল্লীবাসীরা একটু মুষড়ে পড়েছে, ঠিক এমনি একটা সময়ে অজ্ঞাতকুলশীলা ভুবন পুরাণো-গোলা নামে সাঁওতাল-পল্লীর মধ্যে মস্ত জমি কিনে সেখানে এক সুন্দর বাড়ী ফেঁদে বস্‌ল। নতুন এই রহস্যময়ীর আগমনে পল্লীবাসীর সকলেই সচকিত হোয়ে উঠ্‌ল—কে এ!

ভুবনের জীবনের একটু ইতিহাস আছে। তার পিতা রামতারণ চৌধুরী বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। রামতারণের এক পুত্র আর এক কন্যা। পুত্র জগদীশের বিবাহ দেবার পর কিছুদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। জগদীশের স্ত্রী গিরিবালার বাবা, মা কেউ ছিল না, সে মামার বাড়ীতে মানুষ হচ্ছিল। রামতারণ সুন্দরী মেয়ে দেখে গিরিবালার মামাকে ভাগ্নীদায় থেকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু বিয়ের পর বছর ফির্‌তে না ফির্‌তে গিরিবালা পতিহীনা তো হোলোই, উপরন্তু অলুক্ষণে মেয়ে বলে শ্বশুর-বাড়ীতে ও গ্রামময় তার একটা ভীষণ দুর্নাম রটে গেল।

পুত্রের মৃত্যুর পর ভুবনই রামতারণের পুত্রের স্থান অধিকার কোরে

বসল। তিনি ঠিক করলেন যে, এমন ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ দেবেন যার পৃথিবীতে কেউ নাই। ভুবনকে শ্বশুরঘর না করতে হয় এমন পাত্রের তিনি সন্ধান করতে লাগলেন। পাত্রের জন্য রামরতনকে বেশী খোঁজ করতে হয়-নি, তাঁদের গ্রামেই অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একটি পিতৃমাতৃহীন যুবক তার খুড়োর অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছিল, এই অবিনাশের সঙ্গে রামতারণ ভুবনের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির কোরে ফেল্লেন।

বিয়ের পর দুই কি আড়াই বছর ভুবনের পরম সুখেই কেটেছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হোলো—।

একদিন সকাল বেলা উঠে দেখা গেল যে, অবিনাশ ও গিরিবালা অন্তর্দ্ধান করেছে। দুই একদিন পরে জানতে পারা গেল যে, ভুবনের গায়ে যে গয়নাগুলো আছে সেগুলো ছাড়া আর সমস্তই অবিনাশের সঙ্গে চলে গিয়েছে, তা ছাড়া গিরিবালার গয়না তো আছেই। মাসখানেক পরে টের পাওয়া গেল যে, অবিনাশ সিন্ধুকের চাবির জোগাড় কোরে রামতারণের নগদ টাকারও কিছু ভার কমিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

স্বামীর এই ব্যবহারে ভুবনের পুরুষ জাতটার ওপরেই ঘৃণা হোয়ে গেল। তখন তার ফুটনোন্মুখ যৌবন, নবযৌবন সবে মাত্র তার চোখে সেই মোহন অঞ্জন লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে, যার স্পর্শে পৃথিবীর যা কিছু সবই নতুন রূপ ধরে দেখা দেয়। হঠাৎ এই ব্যাপারে তার মনের ভেতরকার সেই সোনার রাজ্যের সামনে একটা কাল যবনিকা পড়ে গেল।

দেমাকী মেয়ে বলে গ্রামের মধ্যে ভুবনের একটা অপবাদ ছিল; সেইজন্যে ছেলেবেলা থেকেই তার কারো সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব হয়-নি, যার কাছে সে হৃদয়ের বোঝা নামাতে পারে। নিঃসঙ্গ জীবনের দীর্ঘ বিনিদ্র রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে ভাবত, এ কি রহস্য! সন্ধ্যার সময় গলা জড়িয়ে

সোহাগ কোরে যে বল্লে—তোমা ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না, সেই লোক রাত্রি পোহাবার আগেই—

ভুবনের অদৃষ্টের কথা গ্রামময় রটে যেতে বেশী দেরী হোলো না। গ্রামের দু-একটি রসিক যুবক এই অবসরে তাকে নানারকম প্রলোভন দেখাতে আরম্ভ করলে, কিন্তু কারো কপালে ভুবন-লাভ ঘটে উঠল না। ঠিক এই সময় সুবোধচন্দ্র রায় নামে একটি প্রিয়দর্শন যুবক ব্যবসা-সূত্রে তাদের গ্রামে এসে কয়েক মাস বাস করছিল। কেমন কোরে যে তার সঙ্গে ভুবনের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়, সেটা ভুবন ও সুবোধ ছাড়া আর কেউ জান্‌ত না। আবার একদিন সকাল বেলা উঠে রামতারণ শুনতে পেলেন—ভুবন বাড়ী নাই!

খোঁজ কোরে জানতে পারা গেল যে, ভুবন সেই সুবোধের সঙ্গে পালিয়ে কলকাতায় চলে গেছে।

অবিবাহিত সুবোধের সংসারে কেউ ছিল না। কলেজের খোলস ছেড়ে খুঁটে খেতে শেখবার আগেই তার নিজের লোকজন তাকে ফেলে চলে গিয়েছিল। নিজের চেষ্টায় কয়লার কারবার কোরে সে বিস্তর পয়সা উপার্জ্জন করেছিল।

সুবোধকে খনির কাজের জন্য জব্বলপুরের কাছে একটা জায়গায় সর্ব্বদাই থাকতে হোতো, সে জন্য সে ভুবনকেও সেখানে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। বিবাহ না হোলেও তারা স্বামী-স্ত্রীর মতনই ছিল। সুবোধের মৃত্যুর কয়েক বছর আগেই তাদের এক মেয়ে হয়। মৃত্যুর সময় সে তার অগাধ সম্পত্তি ও নগদ টাকাকড়ি যা কিছু ছিল সমস্ত উইল কোরে ভুবনকে দিয়ে যায়। খনির কাজে সুবোধকে মাঝে মাঝে সোনালীতে আস্‌তে হোতো; জায়গাটা তার বড় পছন্দ হয়েছিল, তার ইচ্ছা ছিল যে, শীঘ্রই কাজকর্ম্ম থেকে অবসর নিয়ে এইখানে এসে বাস করবে; কিন্তু কাজের

মেয়াদ ফুরোবার আগেই তার ইহজীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সুবোধ ভুবনকে অনুরোধ করেছিল, যেন তার মৃত্যুর পর সে লীলাকে নিয়ে সোনালীতে গিয়ে বাস করে।

এই ভুবনের জীবনের ইতিহাস।

ভুবন যখন সোনালীতে এসে বাস করতে আরম্ভ করলে তখন তার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। বাড়ী থেকে পালিয়ে এলেও একলা এ-রকম অসহায় অবস্থায় সে এর আগে কখনও থাকে-নি। অপরিচিত স্থানে এসে প্রথমটা সে বড়ই বিব্রত হোয়ে পড়ল। তাদের বাড়ীর একটুখানি দূরে একখানা সুন্দর বাগানওয়ালা বাড়ী ছিল। এই বাড়ীখানা ছাড়া আধ মাইলের মধ্যে আর কোন বাড়ী দেখা যেত না। বিকেলে ভুবন যখন লীলাকে নিয়ে সেই বাড়ীখানার ধার দিয়ে বেড়াতে যেত তখন প্রায়ই সে ভাবত যে, বাড়ীখানার ভেতরে ঢুকে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে। অনেকদিন এই সঙ্কল্প কোরে সে দরজার সামনে অবধি দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সঙ্কোচে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে পারে-নি।

সোনালীতে আসার পর মাসখানেক অবধি ভুবনের কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়-নি। বেশী লোকের সঙ্গে পরিচয়ও তার কোন দিন কোথাও ছিল না। প্রায় পনেরো ষোল বছর সে একলাই কাটিয়েছে, বাড়ীর ঝি চাকর ও কর্ত্তা সুবোধ ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা কইবার অবসর কিংবা আলাপ করবার সুযোগ এই ক-বছরের মধ্যে তার হয়-নি।

একদিন দুপুরবেলা ভুবন বসে সেলাই করছে আর তার সামনে বসে লীলা একখানা "আখ্যানমঞ্জরী"র পাতা ওল্টাচ্ছে, এমন সময় একটী বর্ষীয়সী মহিলা তাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

মহিলাটী বারান্দা থেকে হাঁক দিলেন—কৈ গো, বাড়ীর গিন্নী কোথায়?

আওয়াজ শুনে ভুবন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অপরিচিতাকে অভিবাদন কোরে বসবার জায়গা দিয়ে বল্লে—চিনতে পাচ্ছি না তো!

মহিলাটী গম্ভীরভাবে হেসে বল্লেন—আমার নাম বিরাজমোহিনী, আমি আপনাদের প্রতিবাসী, এইখানেই আমার বাড়ী। আপনারা এসেছেন শুনে রোজই আসব মনে করি, কিন্তু আসা আর হোয়ে ওঠে না।

ভুবন একটু সঙ্কুচিত হোয়ে উত্তর দিল—আমিও রোজ আপনার দরজা অবধি গিয়ে ফিরে আসি, ভেতরে ঢুকতে সাহস হয় না।

বিরাজ বল্লেন—আমাদেরই আগে আসা উচিত—আপনি যখন নবাগত। তারপর লীলার দিকে ফিরে বল্লেন—এটি কে? মেয়ে বুঝি?

লীলা বই ছেড়ে বিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, তাঁর কথা হোতেই সে আবার বইয়ের দিকে মুখ কোরে পাতার মোড়া কোনগুলোকে সোজা করতে লাগল।

ভুবন বিরাজের কথা শুনে স্নেহসিক্ত-নয়নে লীলার দিকে চেয়ে বল্লে—হ্যাঁ।

বিরাজ লীলাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি পড়?

লীলা একবার তার মার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আখ্যানমঞ্জরী।

বিরাজ ভুবনকে ক্রমে ক্রমে তাদের সংসারের কথা, তার স্বামী কি করতেন, তার কে আছে, এখন তাদের অভিভাবক কে, এই সব প্রশ্ন করতে লাগলেন। ভুবন চারিদিক বাঁচিয়ে যতটা সংক্ষেপে পারে এই কথাগুলোর উত্তর দিতে লাগল। ওঠবার সময়ে বিরাজমোহিনী লীলাকে বল্লেন—তুমি আমাদের বাড়ীতে যেও, আমার ছেলের সঙ্গে তোমার ভাব করিয়ে দেব। শেষে ভুবনকে বল্লেন—ওকে আমাদের বাড়ীতে রোজ বিকেলে পাঠিয়ে দেবেন, সুকুমারের সঙ্গে খেলা করবে।

ভুবন বল্লে—বেশ তো।

২

সোনালীতে যখন সবে মাত্র বাঙালীরা আস্‌তে আরম্ভ করেছেন সেই সময় বিরাজের স্বামী যোগেশচন্দ্র সেন সেখানে এসে কয়লার কারবার আরম্ভ করেন। পিতা বর্ত্তমান থাকতেই যোগেশ সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পুত্রের ব্রাহ্ম হওয়ার সংবাদ পেয়েই যোগেশের বাবা সেইদিনই উইল কোরে তাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করলেন এবং জীবনে আর পুত্র কিংবা পুত্রবধূর মুখ দর্শন করলেন না। যোগেশ স্ত্রীর গয়না বিক্রী কোরে কয়লার কারবারে নেমেছিলেন। এই গয়নার জন্য বিরাজকে ভবিষ্যতে কখনো আপশোষ করতে হয়-নি, কিছুদিনের মধ্যেই যোগেশ ব্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করতে আরম্ভ করলেন, পরে তিনি স্ত্রীকে সোনা দিয়ে মুড়ে ফেলেছিলেন। প্রথম বয়সে যোগেশের সন্তানাদি হয়-নি, সোনালীতে আসার প্রায় দশ বছর পরে তাঁর একটি ছেলে হয়, কিন্তু তাঁর সেই বিপুল সম্পত্তি ও পুত্রসুখ বেশী দিন সম্ভোগ করতে হয়-নি। সুকুমারকে বছর ছয়েকের রেখে তিনি মারা যান। বিরাজ যোগেশের উপযুক্ত স্ত্রী ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনিও বাড়ী ছেড়ে চলে এসে সুখে দুঃখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

ভুবনের সঙ্গে বিরাজের পরিচয় হবার কয়েক সপ্তাহ পরে বিরাজ একদিন তাকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। মন্দিরটা পুরানো-গোলা থেকে অনেকটা দূরে। অন্য অন্য ব্রাহ্মদের বাড়ী এই মন্দিরের কাছেই। বিরাজকে সমস্ত ব্রাহ্ম পরিবারের লোকেরাই বেশ সম্ভ্রম করত। তিনি সেদিন জনকয়েক মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বারকয়েক

মন্দিরে যাতায়াত করতেই মন্দিরের দরোয়ান থেকে পুরোহিত পর্য্যন্ত সকলের কাছেই ভুবন পরিচিত হোয়ে গেল।

বিরাজের চেষ্টায় ভুবন ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হোয়ে পড়্‌ল। মাঝে মাঝে বিরাজ তাকে সেখানকার দু-একটা সান্ধ্য সম্মিলনে নিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। সেখানকার দুই একটা জনহিতকর সভা সমিতিতেও ভুবন সভ্য হোয়ে পড়্‌ল। তার কাছে হরদম্ চাঁদার খাতা আস্‌তে লাগ্‌ল। এতদিন একলা থাকার পর এইখানকার এই জীবন ভুবনের মন্দ লাগ্‌ল না। ব্রাহ্মদের সঙ্গে তার মনের ও মতের মিল থাকলেও তাদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে এক জায়গায় একটু যে ফাঁক রয়েছে সেটা সে মনে মনে বুঝতে পার্‌ত। সভা সমিতি, সান্ধ্য-ভোজ ও ব্রাহ্ম মেয়েদের জটলার মধ্যে যে সব আলোচনা হোতো, ভুবন তার মধ্যে ষোল আনা যোগ দিতে পার্‌ত না। তার কারণ অধিকাংশ বিষয়ে সে ছিল সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুবোধ তাকে একটু আধটু ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়েছিল বটে, কিন্তু এই বি-এ, এম-এ পাশ করা মায়েদের কাছে তার সে বিদ্যা এমন তলিয়ে পড়্‌ত যে, সেখানকার একটা ছোট বুড়বুড়িও ওপরে ভেসে উঠ্‌ত না। কাজেই নেহাৎ সংসারের কথা না পড়লে অধিকাংশ সময়েই সে হোতো নির্ব্বাক শ্রোতা।

বিরাজমোহিনীর বয়স খুব বেশী না হোলেও তাঁর মধ্যে এমন একটা ভারীকি চাল ছিল যে, তাঁকে সবাই ভয় কর্‌ত। তাঁর কথার উত্তর দিতে কেউ বড় একটা সাহস কর্‌ত না। ছোট ছেলেমেয়েরা তো তাঁর ত্রিসীমানায় ঘেঁষ্‌তই না, ছেলের মায়েরা পর্য্যন্ত তাঁকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতেন। সাম্‌নে যে পড়বে তাকেই একটু উপদেশ দেওয়া তাঁর একটা স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই রকম উপদেশ দিতে দিতে তাঁর এই রিপুটা এতই প্রবল হয়েছিল যে, এ সম্বন্ধে তিনি বয়সের কোন

খাতির রাখতেন না, আর তাঁর ভারীক্কি চালের উপদেশ শোনা সেখানকার লোকদের এক রকম ধাতস্থ হোয়ে গিয়েছিল।

বিরাজমোহিনীরা যে পল্লীতে থাকতেন সে পল্লীতে ভুবন আসবার আগে অন্য কোন ভদ্রলোক বাস করত না। অভিভাবকহীন ভুবন তাঁদের বাড়ীর কাছে এসে পড়াতে বিরাজ সদাসর্ব্বদা বক্তৃতা দেবার একটা লোক পেলেন। প্রথম প্রথম বিরাজের উপদেশগুলো ভুবনের বেশ লাগ্‌ত, কিন্তু উপদেশ যখন উপদেবতার মতন ঘাড়ে চাপ্‌ত, তখুনি তার পালাই পালাই ডাক ছাড়্‌ত।

বিরাজমোহিনী একদিন ভুবনকে বল্লেন—মেয়েকে ইস্কুলে দাও না কেন? ওকে এবার ইস্কুলে দিয়ে দাও।

সোনালীতে একটা মেয়েদের স্কুল ছিল, কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ মেয়েই কলকাতার স্কুলে পড়ে, ছুটিতে সেখানে আসে আবার ছুটি ফুরোলেই কলকাতায় চলে যায়। সোনালীতে মেয়েদের যে স্কুল আছে, সেটা ভুবনদের বাড়ী থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে। লীলাকে সেখান' থেকে স্কুলে পাঠাবার কোন সুবিধা নাই। ভুবন লীলাকে স্কুলে দেবার কথা ইতিমধ্যে অনেকবার চিন্তা করেছে, কিন্তু ভেবে কিছু কোরে উঠ্‌তে পারে-নি। বিরাজের প্রশ্ন শুনে সে বল্লে—এতদূর থেকে মেয়েকে ইস্কুলে পাঠাই কি কোরে! আমি নিজেই ওকে পড়াই।

বিরাজ একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্লেন—তুমি! আরে—তুমি কি পড়াও? তোমারই যে এখন ইস্কুলে যাওয়া উচিত। না না ও-কাজ কোরো না, এখানে আসা যাওয়ার অসুবিধা হয় তো লীলাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও; মেয়েকে মূর্খ কোরে রেখো না।

লীলা কাছেই বসেছিল, বিরাজ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি লীলা কলকাতায় যাবে?

লীলা তার মার মুখের দিকে একবার চেয়ে ঘাড় নেড়ে জানালে যে, তার কলকাতায় যেতে অনিচ্ছা নাই।

লীলাকে ভুবনই পড়াত, সে জানত যে, তার মার মতন পণ্ডিত আর নাই। বিরাজ যখন ভুবনকেই স্কুলে পাঠাবার বন্দোবস্ত কোরে দিলেন, তখন তাঁর কথায় অনিচ্ছা জানাবার সাহস লীলার হোলো না।

বিরাজ সেদিন ভুবনকে মেয়েদের শিক্ষা ও সেই সম্পর্কে জননীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে খুব এক দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

সুবোধের মৃত্যুর পর লীলাই ছিল ভুবনের একমাত্র সম্বল। সুবোধ ও ভুবনের দুই জনেরই ইচ্ছা ছিল যে, লীলাকে লেখাপড়া শিখিয়ে তার ভাল জায়গায় বিয়ে দেবে। সুবোধ ভাবত যে, টাকা দিয়ে সে লীলার জন্মের দোষটা ঢেকে ফেলবে। সোনালীতে তাদের কথা কেউ জানে না, এবং সেখানকার ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিশে শেষ জীবনটা একটা কোন সমাজের মধ্যে থাকবার ইচ্ছাও সুবোধের হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর ভুবনের সোনালীতে এসে বাস করার মধ্যেও এই উদ্দেশ্যটুকু লুকোন ছিল। সে মনে করত, লীলার জন্মের মধ্যে আইনের যে গণ্ডগোল আছে ব্রাহ্ম-সমাজের উদারপন্থীরা সেটুকু বে-আইনি সহ্য কোরে তাকে তুলে নেবে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে বিয়ে দিতে হোলে মেয়েকে মূর্খ রাখলে কিংবা নাম মাত্র লেখা পড়া শেখালে চলবে না। কিন্তু লেখাপড়া শেখাতে হোলে লীলাকে যে চোখের আড়াল করতে হবে সেটা তার মনের কোনে স্থান পায়-নি। সে একটা মহা সমস্যায় পড়ে গেল। তার অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব ঐ একই ভাবনায় আচ্ছন্ন হোয়ে পড়তে লাগল। ভুবনের প্রকৃতি ছিল চিরদিনই দুর্ব্বল, আর সুবোধের প্রকৃতি ছিল ঠিক তার বিপরীত। সুবোধের আড়ালে থেকে থেকে তার নিজে কোন কাজ করবার শক্তি একেবারে রহিত হোয়ে গিয়েছিল।

সোনালীতে, শুধু সোনালীতে কেন, পৃথিবীতে তার অভিভাবক কিংবা এমন বন্ধু কেউ নাই যার কাছ থেকে এ সম্বন্ধে কোন উপদেশ পাওয়া যাবে। বিরাজ যা পরামর্শ দেন তাকে পরামর্শ না বলে আদেশই বলা যেতে পারে। লীলাকে স্কুলে পাঠান সম্বন্ধে বিরাজ তাকে যে সব কথা বলতেন, ভুবন বিরাজের আড়ালে সেই কথা নিয়ে নিজের মনের মধ্যে আলোচনা করত, নিজের যুক্তি দিয়ে বিরাজের যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করত, কিন্তু বিরাজ তার সামনে উপস্থিত হোলেই ভুবনের যুক্তি তর্ক সব উড়ে যেত। তাঁর বিরাট গাম্ভীর্য্য ও কথাবার্ত্তার মারপ্যাঁচের মধ্যে পড়ে সে বেচারা নিজের অস্তিত্বেই সন্দিহান হোয়ে উঠত, তা আর তর্ক করবে কি ?

লীলাকে স্কুলে যেতেই হোলো। বিরাজ ভুবনকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁরও সংসারে একমাত্র সুকুমার ছাড়া আর কেউ নাই, তবুও কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি তাকে কলকাতায় পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন।—

ভুবন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দোলায় দুলতে দুলতে লীলাকে কলকাতায় বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দিলে।

একবার বড়দিনের ছুটি ফুরিয়ে যাবার পর সোনালীর অন্য মেয়েদের সঙ্গে লীলা কলকাতায় চলে এল। এর আগে সে কলকাতায় কখনো আসে-নি। সোনালীতে এই সব মেয়েদের মুখে কলকাতার গল্প, সেখানকার বোর্ডিংয়ের গল্প শুনে শুনে কলকাতার ওপর তার একটা শ্রদ্ধা হোয়ে গিয়েছিল। সোনালীর স্কুলের মেয়েরাও কলকাতার বোর্ডিংয়ের মেয়েদের তাদের চাইতে অনেকটা উঁচু বলে মনে করত। এখন থেকে লীলাও সেই শ্রদ্ধেয় শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হোলো এই কথা যখনই তার মনে হচ্ছিল তখনই তার বালিকা হৃদয় গর্ব্বে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

বোর্ডিংয়ের প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান ইত্যাদি দেখে আর এমন জায়গায়

এতগুলি সঙ্গীর মধ্যে থাকতে পাবে এই সব চিন্তা তার মার বিচ্ছেদের কষ্ট অনেক লাঘব কোরে দিলে।

বোর্ডিংয়ের কর্ত্রী মিস্ রায়। গম্ভীর মুখ, মিশ্ কালো মূর্ত্তি, মাথায় আধহাত লম্বা কোঁকড়ান চুল, মুখে দিব্য একজোড়া গোঁফ। মিস্ রায়ের গলার আওয়াজটা দোতলা—কথা বলতে বলতে কখনো পুরুষের মতন মোটা হয়, আবার কখনো বা সরু ক্যাঁক ক্যাঁকে হোয়ে যায়।

বোর্ডিংয়ে উপস্থিত হওয়া মাত্র মিস্ রায় লীলাকে সঙ্গে নিয়ে তার বাক্স, প্যাঁটরা কোন ঘরে থাকবে, কোনটা কাপড় ছাড়বার ঘর, কোনটা স্নানের ঘর, সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে—খাবার ঘণ্টা কখন পড়ে, ঘণ্টা পড়ার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাবার-ঘরে গিয়ে হাজির হোতে হবে, স্নানের ঘরে ঢুকে বেশী দেরী কোরো না, বড় মেয়েদের কথা শুনবে ইত্যাদি বোর্ডিংয়ের সাধারণ নিয়মগুলি তাকে শুনিয়ে যেতে লাগলেন।

মিস্ রায়ের মুখে অত বড় গোঁফ দেখে লীলা তো প্রথমে হেসেই উঠেছিল, কিন্তু তাঁর কড়া মেজাজের কথা অন্য মেয়েদের কাছে আগে শোনা ছিল বলে সে তার হাসিটা মিস্ রায়ের চোখে পড়বার আগেই সাম্‌লে নিলে।

বোর্ডিংয়ে মিস্ রায়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। জোয়ান জোয়ান চাকর, দরোয়ান, সহিস কোচম্যানগুলো তাঁকে দেখলেই এমন সঙ্কুচিত হো'য় পড়ত যে, তখুনি বুঝি তিনি তাদের আস্ত গিলে খাবার মতলব করে না।

লীলা যেদিন বোর্ডিংয়ে গিয়ে হাজির হোলো তখন স্কুলেই বার দু-তিন দিন বাকী ছিল। সমস্ত দিনটা সে নতুন মেয়েদের [illegible]ল। স্কুল কোরে, বাগানে ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিলে, কিন্তু মুস্কিল[illegible]য়ে দেবার রাত্রি বেলা শোবার সময়। বোর্ডিংয়ের নিয়ম অনুসারে প্র[illegible] পারলে না।

আর্লাঙ্গী খাটে শুতে হয়। লীলার একলা শোয়া কোন কালেই অভ্যাস নাই, মার পাশে না শুলে ভয়ে তার ঘুমই হোত না। একলা শুতে তার বড্ড ভয় কর্‌ত। এদিকে আবার একলা শুতে ভয় করাটা বোর্ডিংয়ে ভয়ানক লজ্জার কথা। লীলা যখন দেখলে যে, তার বয়সী অন্য অন্য মেয়েরা দিবি যে-যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়্‌ল, তখন সে মনে সাহস এনে কোন রকমে নিজের বিছানায় গিয়ে শুলে, কিন্তু একটু পরেই আলো নিবিয়ে দেওয়া হোতেই লীলার বুকের মধ্যে গুর্‌ গুর্‌ করতে আরম্ভ কর্‌ল।

ঘরের মধ্যে ছোট বড় মিলিয়ে জন-পনেরো মেয়ে শুয়ে থাকলেও লীলার মনে হোতে লাগ্‌ল যেন অত বড় ঘরের মধ্যে সে একলা শুয়ে রয়েছে। বাতি নিভিয়ে দেবার পর কারুর সঙ্গে কথা বলা বোর্ডিংয়ের নিয়মবিরুদ্ধ ছিল, লীলার মনে হোতে লাগ্‌ল কারুর সঙ্গে যদি একটু কথা বল্‌তে পেতুম! ভয়ে তার কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিল না, অন্য মেয়েরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একে একে ঘুমিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ঘর্‌র্‌ ঘর্‌র্‌, পোঁ কোঁ ইত্যাদি নানারকম নাকের ডাকে ঘরের মধ্যে যেন কনসার্ট বাজতে লাগ্‌ল। কোন মেয়ে আবার ঘুমের ঘোরে বিড়্‌ বিড়্‌ কোরে বক্‌ছে—লীলার এ রকম অভিজ্ঞতা এর আগে কখনো হয়-নি; ভয়ে তার রক্ত জল হোয়ে যেতে লাগ্‌ল। দেওয়ালে একটা ঘড়ি টাঙান ছিল, তার টক্‌ টক্‌ শব্দ লীলার বড় ভাল লাগ্‌ছিল। তার মনে হোতে লাগ্‌ল, এই অন্ধকারের মধ্যে সেই ঘড়িটাই তার একমাত্র বন্ধু। সে তার নিজের গিয়ে অবিশ্রান্ত অভয় দিয়ে যাচ্ছে—ভয় নেই—ভয় নেই, বন্ধু তাদের চন। ভয়টা আবার যখন অসহ্য হোয়ে উঠ্‌ছে, তখন সেটা জোর সেই শ্রদ্ধেয় কোরে জানিয়ে দিচ্ছে--কে-কে? না কিছু ভয় নেই।
হচ্ছিল তখন কারে ভয়ে-ভাবনায় লীলার বোর্ডিংয়ে প্রথম রাত্রির অবসান
বোর্ডিংয়ে

৩

অনেকদিন আগে সোনালীর এক কয়লার খনিতে ঈশান সরকার নামে একটি ভদ্রলোক কাজ করতেন। ঈশানের অনেক গুণ ছিল, গরীব হোলেও তাঁর মতন পরোপকারী খুব কমই ছিল। সোনালীতে এখন যাঁরা বড়লোক বলে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে এখানে এসে ঈশানের সাহায্য না পেলে হয়তো আজ তাঁরা যে সুখ ও সৌভাগ্য ভোগ করছেন তা ভোগ করতে পেতেন না। ঈশান ব্রাহ্ম না হোলেও ব্রাহ্মধর্ম্মের ওপর তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। সেখানে ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের বেশী লোক থাকায় তাঁদের সঙ্গেই তাঁকে মিশতে হোতো। আর ব্রাহ্মরাও তাঁকে আলাদা সম্প্রদায়ের লোক বলে মনে করতেন না। ঈশান নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন না বটে, কিন্তু চারিদিকের এই ব্রাহ্মী আবহাওয়ার মধ্যে থেকে তাঁর পরিবারের ধরণ-ধারণ সবই ব্রাহ্মদের মতন হোয়ে পড়েছিল। শুধু বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলোর সময়ে তিনি যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তা বুঝতে পারা যেত। কয়লার খনিতে কাজ কোরে ঈশান সামান্য কিছু পুঁজি ও সোনালীতে ছোটখাট একখানা বাড়ীও তৈরি করেছিলেন।

এই ঈশানের এক ছেলে ছিল, ছেলেটীর নাম অমৃত। সে সোনালীর স্কুলেই পড়াশুনা করত। কিন্তু পড়াশুনা করার চাইতে পড়াশুনা না করার দিকেই তার ঝোঁকটা একটু প্রবল থাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীতেই বার দুয়েক ফেল মেরে সে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। স্কুল ছাড়বার পর ঈশান তাকে এটা ওটা সেটা নানা কাজে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন কাজই সে মন দিয়ে করতে পারলে না।

বছর দেড়েকের মধ্যেই তিনি টের পেয়ে গেলেন যে, অমৃতের শুধু লেখা পড়া না-করার দিকে নয়, কোনো কিছুই না-করারই সে পক্ষপাতী। ঈশান তার হাল ছেড়ে দিলেন, অমৃত আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। এইভাবে অমৃতের দিনগুলি বেশ কাটছিল, কিন্তু তার বাবার অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় সব গোলমাল হোয়ে গেল। সংসার অচল হয় দেখে সে তার বাবার আপিসের সাহেবদের গিয়ে ধরে পড়্‌ল। সাহেবেরা সকলেই ঈশানকে ভালবাসত, তারা তাঁর ছেলেকে সেই পদে বাহাল করলে!

অমৃত বখাটে হোলেও বাপের অনেক সদ্‌গুণ পেয়েছিল; কিন্তু বাপের সুনামের কোন অংশ সে পায়-নি। কারো বাড়ীতে কাজকর্ম্ম পড়্‌লে খাটবার সময় অমৃতের ডাক আগে পড়্‌ত, অসুখ-বিসুখে রাত জাগবার দরকার হোলে অমৃতের খোঁজ হোতো বটে, কিন্তু কাজ ফুরোলেই কেউ তার খোঁজ কর্‌ত না। সুনাম তো দূরের কথা, অমৃতের সেখানে বদ্‌নাম ছিল। লোকে বল্‌ত যে, সে রাত্রিবেলা দারোগা বাবুর সঙ্গে বসে মদ খায়।

অমৃত বেশ বুঝতে পার্‌ত যে, লোকে তাকে ঘৃণা করে, কতদিন সে মনে মনে সংকল্প করেছে যে, এবার কোথাও ডাক পড়্‌লে সে আর কিছুতেই যাবে না, কিন্তু লোকের বিপদ উপস্থিত হোলে সে তাদের সাহায্য না কোরে থাক্‌তে পার্‌ত না। বিপদের সময় লোকের বাড়ীতে গিয়ে সাহায্য না করাও তার পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, সন্ধ্যার সময় দারোগা বাবুর আড্ডায় হাজিরা না দেওয়াটা তার পক্ষে তেমনিই অসম্ভব ছিল।

অমৃতকে সবার চেয়ে বেশী ঘৃণা করতেন বিরাজমোহিনী। অথচ তাঁর ফরমাস অমৃতকে সব থেকে বেশী কোরে খাটতে হোতো। তার গুণ অনেক ছিল, কিন্তু সে দেবতা ছিল না, দোষও তার যে না ছিল তা নয়, তবে সে দোষ তাকে মনুষ্য-সমাজের বাইরের অন্য কোন জীবে

পরিণত করে-নি। সাধারণ মানুষেরই মতন তার চরিত্র দোষে গুণে গড়ে উঠেছিল, তবে হিসাব কোরে দেখ্‌লে তার মধ্যে গুণই বেশী পাওয়া যেত।

অমৃত যে মাতাল সে কথা বিরাজই প্রথমে কি কোরে জানতে পারেন, এবং তিনিই সোনালীর অন্যান্য পরিবারে এই কথা প্রচার করেন, তবে বিরাজ কিংবা অন্য কেউ কখনো তাকে মত্ত অবস্থায় দেখেন-নি। অমৃত যে খনিতে কাজ করে, বিরাজের স্বামীর সেই খনির কতকটা অংশ ছিল, এই সূত্রে নানা খবরাখবর পাবার জন্য বিরাজ অমৃতকে মাঝে মাঝে ডাকিয়ে কারবারের ভেতরকার অবস্থা জেনে নিতেন, শুধু তাই নয়, তিনি অমৃতকে দিয়ে আরও অনেক কাজ করিয়ে নিতেন—যা অমৃত হাসিমুখে কর্‌ত, কিন্তু অন্য কাউকে দিয়ে সে কাজ হওয়া সম্ভব ছিল না। কাজের সময় বিরাজ অমৃতর দোষগুলো এমনভাবে ভুলে যেতেন যে, তা দেখে অমৃতই আশ্চর্য্য হোয়ে যেত। বিরাজের দেখাদেখি সোনালীর প্রায় সকলেই তার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার কর্‌ত। বিরাজ যদি কখনো দেখতে পেতেন যে, তাঁর ছেলে সুকুমার কিংবা অন্য কারো ছেলে অমৃতর সঙ্গে গল্প কিংবা খেলা কর্‌ছে তা হোলে তার সাম্‌নেই তিনি তাদের শাসন কোরে দিতেন। ছেলেবেলা থেকে বিরাজের ধমক খেয়ে খেয়ে তাঁকে ভয় করটা অমৃতরও একটা সংস্কারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অমৃত নিজের অবস্থাটা বুঝতে পেরে ক্রমে ক্রমে সেখানকার লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ কোরে দিলে। সে সুকুমারদের চেয়ে বছর কয়েকের বড় ছিল, আর এই অল্পবয়সের মধ্যেই মানবচরিত্র সম্বন্ধে তার খুব অভিজ্ঞতা হোয়ে গিয়েছিল। সোনালীতে কে এল, কে গেল তার খোঁজ সে রাখ্‌তো না। বিকেলে আফিস থেকে বাড়ী এসে কয়েক মাইল বেড়িয়ে সন্ধ্যার সময় সে দারোগা বাবুর আড্ডায় গিয়ে ভিড়্‌ত, আর সেখানে রাত্রি এগারো বারোটা অবধি হল্লা কোরে বাড়ী

ফিরে আসত ; কেউ বাড়ীতে ডাকৃতে এলে সেখানে যেত, নইলে নেমন্তন্ন করলেও কোথাও যেত না।

অমৃতের বাড়ীতে তার বৃদ্ধা মা ও এক বিধবা বোন ছিল। সে বিয়ে করে-নি, চোদ্দ পনরো বছর বয়স হোতে না হোতেই তার মা তার বিয়ে দিয়ে একটি ছোট্ট বউ ঘরে আনবার জোগাড় করেছিলেন, কিন্তু অমৃত সে সময়ে মহা হাঙ্গামা বাধিয়েছিল বলে বিয়েটা তখন ভেঙে গিয়েছিল। তার বাবার মৃত্যুর পর অমৃত তার মাকে বিয়ের কথা আর তুলতেই দিত না। কয়েকবার চেষ্টা কোরে তার মাও শেষকালে তার বিয়ে সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

৪

লীলা কলকাতায় চলে যাবার পর প্রথম দিন কয়েক ভুবন বড় অস্থির হোয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে দেখ্‌ত যে, বিরাজ তাঁর একমাত্র ছেলেকে ছেড়ে বেশ আছেন, তখন সে-ও মনের মধ্যে থেকে অস্থিরতাটাকে দূর কোরে ফেল্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। ভুবন একদিন বিরাজকে জিজ্ঞাসা করেছিল—সুকুমারের জন্য মন কেমন করে না ?

ভুবনের এই কথার উত্তরে বিরাজ বলেছিলেন—মন কেমন করলে কি কর্‌ব, কর্ত্তব্যের জন্য সবই সহ্য কর্‌তে হয়।

ভুবন লক্ষ্য কর্‌ত যে, সুকুমারের অভাবে বিরাজের চরিত্রের কোন কিছুই বদ্‌লায়-নি। তাঁর উপদেশ দেওয়া, চাকরদের ধম্‌কানো, প্রতি রবিবারে নিয়ম কোরে সমাজে যাওয়া, ঘরে কিংবা বাইরের কোন আচরণের মধ্যেই জানিতে পারা যেত না যে, তিনি সুকুমারের চিন্তায় ব্যস্ত হোয়ে পড়েছেন। বিরাজকে দেখতে দেখতে ভুবনও নিজের মনকে শক্ত কোরে ফেল্লে।

বছরে তিনবার লীলাদের বোর্ডিং বন্ধ হোতো। সেই ছুটির সময় লীলা বাড়ী চলে আস্‌ত। লীলা যতদিন বাড়ীতে থাক্‌ত, সে কটা দিন তার স্বপ্নের মতন কেটে যেত। কলকাতার গল্প, সেখানকার নতুন বন্ধুদের গল্প, মাষ্টারদের ব্যবহার ইত্যাদি নানা বিষয়ে গল্প কোরে লীলা তার মায়ের মনকে এমন ব্যস্ত কোরে তুল্‌ত যে, অন্য ভাবনা ভাববার কোন অবসরই তার থাকৃত না। লীলা চলে গেলেই ভুবনের কাজকর্ম্ম সব ফুরিয়ে যেত, আর তখন যত রাজ্যের ভাবনা এসে তার মনটাকে জুড়ে বস্‌ত। কেমন কোরে লীলাকে সৎপাত্রে দেওয়া যাবে এই ভাবনাই তাকে সব

চেয়ে বেশী আকুল কোরে তুল্‌ত। অনেকদিন থেকেই ভুবন হৃৎপিণ্ডের রোগে ভুগ্‌ছিল। কখনো কখনো রোগটা বেশী রকমের চাগাতো, আবার হয়তো দু-মাস রোগের কোন লক্ষণই থাকৃত না। ভুবন শুনেছিল যে, এই রোগে যখন-তখন মৃত্যু হোতে পারে; বসে-বসেই মরে যাওয়াও অসম্ভব নয়। ভুবনের ভাবনা হোতো— যদি তাই হয়? তবে লীলার কি হবে! যদি কোনদিন লীলার জন্মের খবরটা এখানকার লোকেরা জানতে পারে! তবে কি কেউ তাকে বিয়ে করবে? এখানে যারা তাকে আপনার কোরে নিয়েছে, সেই সাংঘাতিক কথা শোনবার পরও কি তারা তাকে সেই রকম আপনার মনে করতে পারবে!

ভুবনের মাঝে মাঝে মনে হোতো, সুকুমারের সঙ্গে লীলার বিয়ে হোলে মন্দ হয় না। কিন্তু বিরাজ যদি লীলার জন্মকথা জানতে পারেন তবে তো তাদের সেখানে বাস করাই বন্ধ হোয়ে যাবে। সেই অবস্থাটা সে কল্পনাতেও আনতে পারৃত না। ভাবনায় হয়তো কখনো সে আপন-হারা হোয়ে বসে আছে, এমন সময় বিরাজের কণ্ঠস্বর তার চমক ভাঙিয়ে দিয়েছে। বিরাজের গলার আওয়াজ কাণে যেতেই তার দেহ-মন একসঙ্গে শিউরে উঠেছে।

প্রতি সপ্তাহেই ভুবন লীলার কাছে থেকে একখানা চিঠি পেত, আর তাকেও সপ্তাহে একখানা কোরে লীলাকে চিঠি লিখতে হোতো, সপ্তাহের মধ্যে এই দিনদুটো তার বেশ কাট্‌ত।

এই সময়ে ভুবনের এক বিপদ উপস্থিত হোলো। তখন সহরের গরীবদের মধ্যে কলেরা লেগেছিল। গরীবদের মধ্যে একটা আতঙ্ক লেগে গেল, কে যে কখন যায় সেই ভয়ে বেচারারা ত্রস্ত হোয়ে পড়্‌ল। সহরের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার যাঁদের ওপর ছিল, তাঁরা একবার ঢেঁড়া পিটিয়ে

সবাইকে সাবধান হোতে বলেই নিজেদের কর্ত্তব্য চুকিয়ে ফেল্লেন, কিন্তু তাতে এদের ভয়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। এরি মধ্যে ভুবনের বাড়ীর এক চাকরের একদিন ওলাউঠা রোগের লক্ষণ দেখা দিল। সকালে রোগের লক্ষণ যখন দেখা দেয় তখন ভুবন কিছুই জানতে পারে-নি। বাড়ীতে ঐ রোগ হওয়ায় তার দুই একজন চাকর পালাতেই ব্যাপারটা সে প্রথমে টের পেলে। কলেরার নাম শুনে ভুবনও চম্‌কে উঠ্‌ল, সে যে কি করবে তার কিছুই ঠিক কোরে উঠ্‌তে পার্‌লে না। কাকে ডাক্‌বে, কোথায় খবর দিলে ডাক্তার পাওয়া যাবে, কার কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এ-সব কিছুই সে জান্‌ত না। এদিকে এক একজন চাকর এক একটা কাজে যায়, আর ফেরে না। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তার এমন অবস্থা হোলো যে, সে আর রুগী ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ রইলো না। ভুবন তাকে ছেড়ে নড়তেও পারে না। এমন অসহায় অবস্থা তার জীবনে কখনো হয়-নি। তার মনে হোতে লাগ্‌ল যে, একটা চাকরের রোগ হওয়াতেই সে যখন এতটা অসহায় হোয়ে পড়েছে, না জানি নিজের অসুখ হোলে তাকে কি অবস্থায় পড়তে হবে! কিন্তু আর তো বিনা চিকিৎসায় লোকটাকে ফেলে রাখা চলে না, রোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে দেখে রুগীকে বাড়ীতে একলা ফেলেই সে বিরাজের বাড়ীতে ছুট্‌ল।

বিরাজমোহিনীর বাড়ীতে ভুবন গিয়ে যখন উপস্থিত হোলো, তখন সন্ধ্যে হোয়ে গিয়েছে। সে ধুঁকতে ধুঁকতে বিরাজের কাছে যেতেই তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হোয়ে ভুবনকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি, তোমার বাড়ীতে না একজনের কলেরা হয়েছে?

বিরাজের মুখের চেহারা আর কথার সুর শুনে ভুবনের মুখ দিয়ে প্রথমটা কোন কথাই বেরুলো না। একটু থতোমতো খেয়ে সে বল্লে—কিন্তু আমার সমস্ত চাকর পালিয়ে গিয়েছে, আমায় সাহায্য করতে পারে

এমন একটি লোক আমায় দিন—টাকার যা প্রয়োজন হবে আমি এখুনি তা দিচ্ছি।

ভুবনের চাকরের যে কলেরা হয়েছে এ কথা বিরাজ সকালেই শুনেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে তাঁর বাড়ীর চাকরেরাও বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা ভেবেছিল যে, এ পল্লীতে যখন অন্য কোন বাড়ী নাই এবার তখন তাদেরই পালা পড়্‌বে। দুই একটা লোক পালাবারও জোগাড় করেছিল, কিন্তু বিরাজ তাদের ধমক দেওয়ায় এ পর্য্যন্ত কেউ সরে পড়্‌তে সাহস করে-নি। বাড়ীতে যার এই রকম সংক্রামক ব্যাধি সে যে অন্য কোথাও যায় বিরাজ তা মোটেই পছন্দ করতেন না।

সেদিন সমস্তদিন একেই ভুবনের স্নান কিংবা আহার কিছুই হয়-নি, তার ওপরে ভয়ে ও নিজের অসহায় অবস্থার ভাবনায় তার চেহারার মোলায়েম ভাবটা একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছিল। তার রুক্ষ চুল আর সেই রকম শুক্‌নো চেহারা দেখে বিরাজের চাকরগুলো মনে করলে যে, সাক্ষাৎ ওলাদেবী বুঝি তাদের বাড়ীতে এসে ঢুকলেন। চাকররা যে ভয় পেয়েছে, তাদের ধরণ-ধারণ দেখে বিরাজ সেটা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই ভুবনের এ-রকম ভাবে আসাটা তাঁর মোটেই মনঃপুত হয়-নি। তিনি নিজের বিরক্তিটাকে যতদূর সম্ভব চেপে একটা ব্যবস্থা করবার আশা দিয়ে ভুবনকে বাড়ী ফিরে যেতে বল্লেন।

বিরাজের চাকরগুলো কি মনে করেছে সে কথা ভাবিবার ভুবনের তখন আর অবসর ছিল না, সে যেম্‌নি ছুটে এসেছিল সাহায্য পাবার আশা পেয়ে তেম্‌নি ছুটে বাড়ী চলে গেল।

ভুবনকে বিদায় কোরে দিয়ে বিরাজ ভাব্‌তে লাগলেন—কি করা যায়! কাছাকাছি ডাক্তার নেই যে তাকে খবর পাঠান যাবে। বিপদের সময় চট্‌ কোরে বিরাজের "বিপত্তে মধুসূদন"—অমৃতের কথা মনে পড়ে

গেল। বিরাজ তাঁর চাকর মুনিয়াকে ডেকে বল্লেন—ওরে যা দিকিন্ একবার সরকার মশায়ের বাড়ী—সেখান থেকে অমৃত বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। অমৃত যদি বাড়ীতে না থাকে তবে একবার থানায় যাবি, সেখানে দারোগা বাবুর বৈঠকখানায় সে আছে, তাকে বলবি যে আমি ডাক্‌ছি—এখুনি যেন আমার সঙ্গে এসে দেখা করে।

মুনিয়া হুকুম পেয়ে অমৃত বাবুর উদ্দেশ্যে ছুট্‌ল।

অমৃত যখন ডাক্তার নিয়ে ভুবনের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোলো তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। ডাক্তার বাবু রুগীর নাড়ী টিপে ওষুধ দিয়ে রুগী ও রোগ সম্বন্ধে অমৃতকে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। ডাক্তার চলে যাবার পর অমৃত রুগীর পাশে একটুখানি জায়গা কোরে নিয়ে বসে ভুবনের দিকে তাকিয়ে বল্লে—এ কি! আপনাকে এমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? আজ স্নান করেন-নি বুঝি!

ভুবন ধীরে ধীরে বল্লে—সমস্ত দিন যা টাল-মাটাল গিয়েছে—নাওয়া খাওয়ার কথা কি মনে ছিল। তোমাদের দেশের চাকরগুলো বাবা বড় দুষ্টু কিন্তু!

অমৃত আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লে—সে কি! সমস্ত দিন খাওয়া হয়-নি? যান-যান উঠে পড়ুন।

অমৃত কোন রকমে সেখান থেকে ভুবনকে তুলে নিজে রুগীর পরিচর্য্যায় লেগে গেল। ভুবন মাঝে মাঝে উঠে সেই ঘরের মধ্যে এসে দেখে যেতে লাগ্‌লো। অমৃত ভুবনকে বার বার রুগীর ঘরে আস্‌তে দেখে বল্লে—আপনার বার-বার এখানে আস্‌বার দরকার নাই; সমস্ত দিন আপনার পরিশ্রম হয়েছে, রাত্রিবেলা একটু ঘুমোন, আবার দিনের বেলায় রুগীর কাছে থাকতে হবে তো? মিছামিছি নিজের দেহকে এম্‌নি হয়রাণ কোরে লাভ কি?

ভুবন অমৃতের উপদেশ শুনে আস্তে আস্তে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। ভুবন ঘুমুতে চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু নানারকম ভাবনায় ঘুম তার কিছুতেই আস্‌ছিল না। আজকের এই অভিজ্ঞতা তার জীবনে নতুন, এ রকম বিপদে এর আগে সে কখনো পড়ে-নি। হয়তো চাকরটার মৃত্যু হোতে পারে! মৃত্যুর কথা মনে হওয়াতেই তার সুবোধের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিনও এমনি অন্ধকার রাত্রি—ওঃ সেদিন তাকে কি ভীষণ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল! তার চোখের সামনে সুবোধের মরণাহত মুখখানা ভাস্‌তে লাগ্‌ল। সেই ধীরে ধীরে হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলা, তার পরে হঠাৎ একবার চোখ দুটো উল্টে যাওয়া—তারপরে সব স্থির! সুবোধের সেই স্থির নিস্পন্দ দেহখানা দেখে ভবিষ্যতের ভাবনায় তার মন কি রকম আকুল হোয়ে উঠেছিল! কোথায় যাবে, কি কর্‌বে, কেমন কোরে সেই ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনটা সে একলা কাটাবে? এই সব ভাবনা সেদিন তাকে পাগল কোরে তুলেছিল। সে কতদিন হোয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে—এই তো সেদিন। সেই ছোট্ট লীলা আজ বড় হয়েছে, আজ সে সংসারের অনেক কথাই বুঝতে পারে, ভাব্‌তে পারে। তার মনে হোতে লাগ্‌ল, আজ লীলা এখানে নেই ভালই হয়েছে। বিরাজের পরামর্শ অবহেলা কোরে সে যদি লীলাকে কলকাতায় না পাঠিয়ে এইখানেই রাখ্‌ত তবে—ভুবন ভাবনাটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য পাশ ফিরে শুলে। লীলা এখানে নেই এই কথাটা মনে কোরে সে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লে। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, ভগবান যা করেন ভালর জন্যই।

ঘরের মধ্যে সুবোধের একখানা বড় ব্রোমাইড ছবি টাঙান ছিল, ভুবন শুয়ে শুয়ে সেই ছবিখানা দেখ্‌তে লাগ্‌ল, ছবিটার দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার বুকে আবার সাহস ফিরে এল। সুবোধ যেন মৃত্যুর

ওপার থেকে তাকে আশ্বাস দিচ্ছে—ভয় নাই, কোন ভয় নাই, নিজে সৎপথে থেকো, লীলাকে মানুষ কোরো।

কিছুক্ষণ সেইভাবে পড়ে থেকে ঘুম আনবার চেষ্টা কোরেও ঘুম যখন কিছুতেই এল না ভুবন তখন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়্‌ল। সে ভাব্‌লে একবার রুগীর ঘরে গিয়ে কি হচ্ছে দেখে আসি! কিন্তু অমৃতর উপদেশ মনে পড়্‌তেই সে আবার বিছানায় এসে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—আশ্চর্য্য এই ছেলেটির ব্যবহার! চেনা নাই, শোনা নাই অথচ কি সপ্রতিভ! পরের বাড়ীর চাকরের রোগের সেবা করে এমন লোকের কথা সে এর আগে শুনেছে বটে, কিন্তু দেখে-নি! অমৃতর ওপর সম্ভ্রমে তার হৃদয়টা ভরে উঠ্‌ল। ভুবন মনে মনে তাকে আশীর্ব্বাদ কোরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে, আজ যে বিপদ থেকে সে তাকে উদ্ধার করেছে জীবনে এমন উপকার তার কেউ কখনো করে নি—হে ভগবান তুমি ওর মঙ্গল কোরো।

চুপ্ কোরে বিছানায় আর বসে থাকতে না পেরে ভুবন শেষে পা টিপে টিপে রুগীর ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। অমৃত তখন চাকরটাকে এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিয়ে আপনার মনে কি একখানা বই পড়ছিল, ভুবনের পায়ের কোন শব্দ সে পায়-নি; হঠাৎ দেওয়ালে কিসের ছায়া পড়তে সে মুখ তুলে দেখ্‌লে যে, ঘরের মধ্যে ভুবন এসে দাঁড়িয়েছে। অমৃত বইখানা মুড়ে রেখে তাকে বল্লে—আপনি আবার এসেছেন! বার-বার এ-রকম কোরে এলে আমি এখুনি চলে যাব—তখন মুস্কিলে পড়বেন।

অমৃতর ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যে রাগ, বিরক্তি, ঘৃণা, ক্লেশকে সে এমন স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করত যে, তার আর দু-রকম অর্থ হবার উপায় থাকত না। তার এই চলে যাবার কথায় ভুবন একটু থতোমতো খেয়ে বল্লে—আপনার কিছুর দরকার আছে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি!

অমৃত বল্লে—না, কিছু দরকার নেই, দরকার পড়্লে আপনাকে জাগিয়ে দেব, যান শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

এর ওপর আর কিছু বলবার খুঁজে না পেয়ে ভুবন সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিছানায় গিয়ে গা ঢেলে দিলে।

সমস্ত রাতটা বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়ে সকাল বেলার দিকে ভুবন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ অমৃতর গলার আওয়াজ কানে যেতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে শুনতে পেলে, অমৃত বল্‌ছে—এই দেখুন, এত বেলা অবধি ঘুমোচ্ছেন! রাত্রিবেলা কতবার আপনাকে বলেছি—রাত্রি জাগবেন না, আঁপনি তো শুনলেন না।

নিজের বাড়ীতে রুগী, অন্য লোক এসে রাত জেগে তার সেবা করছে, অথচ যার বাড়ী সে এত বেলা অবধি ঘুমোচ্ছে—কথাটা মনে হওয়াতে ভুবনের ভারি লজ্জা হোতে লাগ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়ে একটু সঙ্কুচিত হোয়ে বল্লে—একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

—ঘুমিয়ে যে পড়েছিলেন সেটা আমি আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি।

—ভুবন জিজ্ঞাসা করলে—দুঃখু কেমন আছে?

সে এখন একটু ঘুমোচ্ছে, আমার মনে হয় যে, ভয় কেটে গেছে। কিন্তু এ-রোগ আবার হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে, একটু সাবধানে থাকতে হবে।

রুগীকে কখন ওষুধ খাওয়াতে হবে, কি পথ্য দিতে হবে এই সব উপদেশ দিয়ে অমৃত ভুবনকে বল্লে—যদি বাড়াবাড়ি বুঝতে পারেন তা হোলে আমার আপিসে খবর দেবেন। আর তা না হোলে আমি সন্ধ্যের সময় আস্‌ব।

ভুবন অমৃতকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সে চলে যাচ্ছে দেখে নিজের অসহায়তার কথা মনে পড়ে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আস্‌তে

লাগ্ল! চোখের জল কোন রকমে গিলে ফেলে সে ব...—এ তাড়াতাড়ি আসবেন।

অমৃত রাস্তার দিকে চেয়ে বল্লে—সে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আস্তে চেষ্টা কর্‌ব, তার জন্য আপনি ভাববেন না।

ভুবন বল্লে—আপনার অনুগ্রহ—

ভুবনের কথা শেষ হবার আগেই অমৃত বল্লে—ঐ অনুগ্রহ টনুগ্রহ বল্লে কিন্তু আমার আর আসা হবে না।

ভুবনের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুলো না। অমৃত তাকে—আচ্ছা, এখন যাই, বলে হন্ হন্ কোরে দরজার দিকে ছুটে চল্‌ল।

মুখ ধুয়ে দুঃখুর ঘরের দিকে যাচ্ছে এমন সময় ভুবন দেখ্‌লে যে, অমৃত ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফিরে আস্‌ছে। অমৃত এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—দেখুন একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বাড়ীতে রুগীর বন্ধু কিংবা তার বাড়ীর কাউকে ঢুকতে দেবেন না। রোগ হোলেই ভুতে পেয়েছে মনে কোরে তারা নানারকম ঝাড়-ফুঁক করে, আর কি সব মাথামুণ্ডু গিলিয়ে দেয়—তা হোলে ও কিন্তু আর বাঁচবে না, বলে দিচ্ছি।

এই বলে সে যেমন ছুটে এসেছিল তেম্‌নি ছুটে বেরিয়ে গেল।

কদিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি হবার পর দুঃখু সেরে উঠ্‌ল। অমৃত ও ভুবনের অক্লান্ত সেবায় সে বেচারা প্রাণে বেঁচে গেল। দুঃখু সেরে উঠ্‌তেই অমৃত ভুবনের বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ কোরে দিলে। আবার দারোগা বাবুর আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা পড়্‌তে লাগ্‌ল। একদিন পুরাণো-গোলার দিকে অমৃত কি একটা কাজে এসেছিল, এমন সময় পথে তার সঙ্গে ভুবনের দেখা হোয়ে গেল। ভুবন এই ছেলেটীর ব্যবহারে ক্রমেই আশ্চর্য্য হোয়ে যাচ্ছিল। এই কয়দিন এত মাখামাখি, এত আত্মীয়তার পর হঠাৎ একটা লোক এমনভাবে ডুব দিতে পারে কি কোরে তা সে ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছিল না। অমৃতকে দেখ্‌তে পেয়ে ভুবন বল্লে—বেশ ছেলে তো তুমি? আর একবার দেখাও করতে নেই বুঝি!

অমৃত তার কথা শুনে একটু লজ্জিত হোয়ে আম্‌তা আম্‌তা কর্‌তে লাগ্‌ল। ভুবন তাকে নিজের বাড়ীতে টেনে নিয়ে গিয়ে বল্লে—তোমাদের দেশে আমি একলা এসে বাস করছি, তোমার উচিত আমায় একটু দেখাশুনা করা। আমি একলা মানুষ কখন কি বিপদে পড়ি তার ঠিক নেই, অসুখ হোলে এমন একটা লোক নেই যে ডাক্তার ডেকে দেবে। চাকরগুলো সেই যে পালিয়েছে তারা আর এ-মুখো হয়-নি। তুমি রোজ না পার, অন্ততঃ একদিন অন্তর আমায় দেখে যাবে, কেমন? পারবে তো?

অমৃত ভুবনের কথা শুনে আশ্চর্য্য হোয়ে যাচ্ছিল, আর ভাবছিল—একি কিছু জানে না নাকি! সোনালীতে কেউ তো বিপদে না পড়্‌লে আমায় ডাকে না। বিশেষতঃ ভুবন, যে বিরাজমোহিনীর খাস তাঁবে

রয়েছে, সে রোজ আসবার নিমন্ত্রণ করছে! অমৃত ভুবনের কথাগুলো শুনে একটু চুপ্ কোরে থেকে বল্লে—আমার আসা উচিত বটে কিন্তু—

—আর কিন্তু টিন্তু নয়, তোমাকে আস্তেই হবে।

অমৃত বল্লে—আচ্ছা আমি আস্‌ব, কিন্তু একদিন আপনিই আবার আমায় আস্তে বারণ কোরে দেবেন।

অমৃতর কথা শুনে ভুবন বিস্মিত হোয়ে বল্লে—ওমা! আসতে বারণ করব কেন? আমার নিজের উপকারের জন্যই তো তোমায় আস্তে বল্‌ছি; অবিশ্যি তোমার নিজের সুবিধা বুঝে।

অমৃত ভুবনের কাছে আজ একটা নতুন কথা শুন্‌লে। তার আবার সুবিধা অসুবিধা আছে এটা তো কোন দিনই তার মাথায় ঢোকে-নি! সুবিধা কিংবা অসুবিধার কথা বাড়ীতে কিংবা বাইরে কেউ কোন দিন তাকে ভাববার অবসরই দেয়-নি। কাজ পড়েছে, যে ডেকেছে তখনই সে ছুটে গিয়েছে, কাজ ফুরিয়ে গেলে কোথাও স্পষ্ট, কোথাও বা ভাবে-ভঙ্গিতে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তার সেখানে দরকার নাই—তখনি সে সরে পড়েছে। এতদিন তো এম্‌নি কোরেই কেটে গিয়েছে! ভুবনের কথায় তার ভেতরে একটা নতুন লোক সাড়া দিতে লাগ্‌ল! তার অন্তর থেকে কে যেন বল্‌তে লাগ্‌ল—আছি—আমি আছি।

অনেকক্ষণ চুপ্ কোরে বসে থেকে অমৃত উঠে পড়ে বল্লে—আচ্ছা যতদিন না বারণ করছেন ততদিন আস্‌ব।

পরদিন থকে অমৃত রীতিমত দিনে একবার কোরে ভুবনের বাড়ীতে যাওয়া আরম্ভ করলে। লীলা বোর্ডিংয়ে যাওয়ার পর বিরাজমোহিনীই ভুবনের একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন, কিন্তু তাঁকে সঙ্গিনী না বলে মাষ্টার মশায়ও বলা যেতে পারে। কিছুদিনের মধ্যেই অমৃত ভুবনের বন্ধু ও সহায় হোয়ে উঠ্‌ল। অমৃতর বয়সও বেশী নয়, সে ভুবনের পুত্রের স্থানও পূর্ণ

করল। অমৃতর বুদ্ধি, তার দয়া ও পরার্থপরতা অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভুবনকে মুগ্ধ কোরে ফেল্লে। সে মাঝে মাঝে ভাব্‌ত—অমৃতর মতন তার যদি একটি ছেলে থাকৃত।

ভুবন যে অমৃতকে রোজ তার বাড়ীতে আস্‌তে বলেছে, আর অমৃত যে রোজ ভুবনের বাড়ী যাওয়া-আসা কর্‌ছে, এ দুটোর একটা সংবাদও বিরাজের কানে পৌঁছয়-নি। বিরাজ শুনেছিলেন যে, ভুবনের চাকর সেরে উঠেছে, এই অবধি জেনেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তার পরে যে অমৃত রোজ সেখানে যাতায়াত করবে সে সন্দেহটা তাঁর মনের কোনেও স্থান পায়-নি। ভুবনও বাড়ীর এই সব গোলমালে পড়ে প্রায় সাত আট রবিবার মন্দিরে যেতে পারে-নি, কাজেই বিরাজের সঙ্গে তার সেই থেকে দেখা সাক্ষাৎ হয়-নি। দুঃখুর অসুখের কথা বল্‌তে গিয়ে ভুবন বিরাজের যে রকম মুখ দেখেছিল, তারপরে ভয়ে ও সঙ্কোচে সে-ও আর তাঁর বাড়ী মাড়ায়-নি। মন্দিরে অনেকদিন ভুবনকে আস্‌তে না দেখে বিরাজের কাছে কেউ তার সংবাদ চাইলে তিনি বলতেন—ওদের বাড়ীতে যে রোগ ঢুকেছে, চাকর বাকর নিয়ে থাকৃতে হয় তাই একটু সাবধান হোয়ে চলি, এম্‌নিতেই তো তারা সব পালাবার জোগাড় করেছিল, তার ওপর আমাকে যদি আবার ওদের বাড়ী যেতে দেখে তা হোলে কি আর তারা থাকৃবে!

বিরাজের এই অতিরিক্ত সাবধানতা যে ভয়ের নামান্তর মাত্র সেটা সকলে বুঝতে পারলেও যাদের মধ্যে তিনি এই সব কথা বলতেন তারা সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে সাহসী হোতো না। ভুবনের বাড়ীতে কলেরা হয়েছিল প্রায় তিন মাস আগে, এখনও সেখানে গেলে যে রোগ ধরতে পারে এ ভয়টা তিনি বিলক্ষণই করতেন। কিন্তু আর না গেলে যখন ভদ্রতা রক্ষা হয় না, তখন তিনি মনে করলেন, একবার খোঁজটা নেওয়া উচিত।

সেদিন রবিবার। অমৃত সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুর থেকেই ভুবনের বাড়ীতে এসে জমেছিল। তার গল্প আর হাসির আওয়াজে ভুবনের বাড়ীটা একেবারে জম্‌জম্ করছে। রবিবারে সে দুপুরে এসে বস্‌ত আর বেলা পড়লেই চলে যেত। অমৃতের বাড়ী যাবার সময়ও হোয়ে এসেছে, বাড়ী যাবার আগে সে চা খেত বলে ভুবন তার জন্য চা তৈরী করছে, এমন সময় ঘরের দরজার কাছে বিরাজের মূর্ত্তি দেখা দিল,—কি গো তোমরা সব কেমন আছ ?

বিরাজকে দেখেই অমৃতর হাসি-টাসি সব থেমে গেল। সে হঠাৎ এমন গম্ভীর হোয়ে পড়্‌ল যে, দু-মিনিট আগেকার অমৃত আর এখনকার অমৃত যে একই লোক তা বোঝবার উপায় নাই। ভুবন বিরাজকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বল্লে—আসুন, আর দেখা পাই না কেন ? অসুখ বিসুখ করেছিল নাকি ?

বিরাজ বল্লেন—না, অসুখ করে-নি, তবে তোমাদের বাড়ীর ব্যামোর কথা শুনে অবধি আমার বাড়ীর লোকগুলো পালাই-পালাই রব তুলেছিল, তার ওপর আবার যদি আমায় এখানে আস্‌তে দেখে তবে কি আর রক্ষে আছে !

ভুবন বল্লে—সেই কথা ভেবে আমিও আর আপনাদের ওখানে যেতে পারি-নি। একেতো নিজে চাকরের অভাবে ভুগ্‌ছি, আবার আপনাদের কেন মজাই।

বিরাজ ভুবনের কথার কোন উত্তর না দিয়ে একবার অমৃতের দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টি দেখে তাঁর মনের মধ্যে যে কি ভাবের স্রোত বইছে তা অতি বড় মনস্তত্ত্ববিদ এলেও বলে দিতে পারবে না। সে চাহনি দেখলে স্নেহ, দয়া, ক্রোধ বা ঘৃণা যে কোন একটা মনে করা যেতে পারে। বিরাজ অমৃতকে দেখে মুখখানা ফিরিয়ে নিতেই অমৃত হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বল্লে—আমি তবে চল্লুম।

ভুবন তখন চায়ের বাটিতে চিনি দিচ্ছিল। সে অমৃতকে বল্লে—বা রে ছেলে! তোমার জন্য আমি চা তৈরি করলুম আর তুমি না খেয়েই চলে যাবে? চা না খেয়ে যেও না।

অমৃত যেমনি অকস্মাৎ উঠেছিল, তার চেয়ে অকস্মাৎ ধপাস্ কোরে আবার চেয়ারে বসে পড়্ল। বিরাজ তার দিকে চেয়ে বল্লেন—অমৃত একটু ভদ্রতা শেখ, এখন বয়স হয়েছে।

চা না খেয়ে চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করা, না, হঠাৎ উঠে বসে পড়া এর মধ্যে কোন অভদ্রতার জন্য অমৃতর ওপর এই ভর্ৎসনাটুকু হোলো ভুবন সেটা ঠিক বুঝতে পারলে না। অমৃতও আর কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে লাগ্ল!

বিরাজ বল্লেন—ভুবন আজ মন্দিরে যাবে চল, সেইজন্যে বিকেল বেলা তোমার এখানে এলুম।

ভুবনও অনেক দিন মন্দিরে যায়-নি। যাবার ইচ্ছা থাকলেও সঙ্গী ও সুবিধার অভাবে তা হোয়ে ওঠে-নি। সে বল্লে—বেশতো চলুন, আমি কাপড়টা ছেড়ে নিই।

সেদিন বিরাজের স্বভাব-গম্ভীর মূর্ত্তি আরও বেশী গম্ভীর হোয়ে পড়েছিল। অন্য অন্য দিন যাওয়া ও আসার পথে বিরাজের কাছ থেকে উপদেশ ও নানা লোকের চরিত্রের ওপর মন্তব্য শুনতে শুনতে ভুবনের প্রাণ বের হোয়ে যাবার উপক্রম হোতো, আজ তাঁর এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ভুবনের মনের মধ্যে কাঁটার মতন খচ্ খচ্ কোরে খোঁচা দিতে লাগ্ল। মন্দিরে গিয়ে সেখানকার কাজ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে ভুবন যখন সে পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে গল্প করছিল, তখন বিরাজ যে আর এক জায়গায় একটা দল নিয়ে বসে বক্তৃতার ফোয়ারা ছোটাচ্ছিলেন সেটা ভুবনের চোখে এড়ায়-নি; সে যখন আবার বিরাজের দলে গিয়ে বস্ল তখন বিরাজের

মুখে হঠাৎ সেই অতি-গাম্ভীর্য্য ফুটে উঠতেই ভুবন সেখান থেকে উঠে পড়্‌ল। মন্দির থেকে বাড়ী ফেরবার পথটাও এই রকমে কাট্‌ল। ভুবন প্রথমে মনে করেছিল যে, সেদিন রাতে বিরাজ তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন বলে বোধ হয় একটু লজ্জিত হোয়ে পড়্‌ছেন; তাই সে তাঁর সঙ্কোচটাকে কাটিয়ে দেবার জন্য অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশী কথা বলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। কিন্তু সে লক্ষ্য করলে যে, বিরাজ তার সব কথারই ছোট ছোট উত্তর দিয়ে আবার গম্ভীর হোয়ে পড়্‌ছেন।

ভুবনের স্বভাব খুব শান্ত হোলেও সে কোন কালেই বোকা নয়। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বল্‌বার পরই সে বুঝতে পার্‌লে, বিরাজের আজকের এই নতুন ব্যবহারের মধ্যে লজ্জা কিংবা সঙ্কোচ কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না, এ যেন রাগত ভাব। বাড়ীতে এসে সে মনে মনে চিন্তা করতে লাগ্‌ল, এমন কি করেছে যাতে বিরাজের রাগ হোতে পারে! সমস্ত পথটা সে ঐ কথাই ভেবেছে, ঐ ভাবনা ভাবতে ভাবতে সে বিছানায় শুয়েছে, কিন্তু বিরাজের মনে আঘাত লাগ্‌তে পারে এমন একটা ঘটনার কথাও তার মনে পড়ছিল না। দূর হোক্‌গে ছাই, আর ভাবতে পারি না বলে সে ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। কিন্তু ভাবনাগুলোকে দূরে রেখে সে ঘুমকে যতই কাছে আনতে চেষ্টা করছিল, ভাবনাগুলো ততই যেন ঘাড়ে চেপে বস্‌তে লাগ্‌ল। ভাব্‌তে ভাব্‌তে ছাঁৎ কোরে একটা কথা তার মনে পড়ে গেল,—যদি তাই হয়!! বিরাজ যদি লীলার জন্মবৃত্তান্ত জানতে পেরে থাকে! নিশ্চয়ই তাই, তা না হোলে কোন কিছু অন্যায় দেখ্‌লে কথা বন্ধ কোরে দিয়ে গম্ভীর হোয়ে থাকাতো বিরাজের স্বভাব নয়! কথাটা মনে হোতেই ভুবনের সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌ল, তার বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হোলো। তার মনে হোতে লাগ্‌ল, এখুনি বুঝি মৃত্যু হবে। মৃত্যুর কথা মনে

হোতেই সে ভাব্‌লে, একবার বিরাজকে ডাক্‌লে হয় না ? তাকে ডেকে সমস্ত কথা স্বীকার কোরে তার পায়ে ধরলে কি সে ক্ষমা করবে না ? নিশ্চয়ই করবে, মানুষ কখনো এতটা হৃদয়হীন হোতে পারে না।

ভুবনের ক্রমে হাত-পা ঠাণ্ডা হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। এই তো মৃত্যু ! মরবার সময় কি একবার লীলাকে দেখতে পাই না,—না না, তা অসম্ভব। কোথায় সোনালী আর কোথায় কলকাতা। দয়াময়, তুমি তাকে দেখো প্রভু—ভুবন চোখ বুঁজিয়ে ঈশ্বরের নাম কর্‌তে লাগ্‌ল।

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে পড়ে থাকবার পর তার বুকের ভেতরকার সেই অস্বাভাবিক দপ্‌দপানিটা থেমে গিয়ে সহজভাবে নিশ্বাস পড়্‌তে আরম্ভ হোলো ; অনেকক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করার পর তার দেহ ও মন দুই ক্লান্ত হোয়ে পড়ায় সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

ভুবনের বাড়ীতে অমৃতকে দেখে বিরাজ তেলে-বেগুনে জ্বলে গিয়েছিলেন। ভুবন যেদিন তাঁকে তার চাকরের অসুখের কথা জানাতে আসে, সেদিন তার কাছে ঐ রকম দুর্ব্বলতা প্রকাশ কোরে ফেলার জন্য বিরাজ যে একটু লজ্জিতা হন-নি তা নয় ; তিনি মনে করেছিলেন যে, এ বিষয়ে তাকে একটু বুঝিয়ে বল্লেই হবে। কিন্তু ভুবনের বাড়ীতে ঢুকেই অমৃতর হাসি শুনতে পেয়ে তাঁর সে সব চিন্তা উবে গিয়েছিল। সোনালীর অন্য সবাই অমৃতকে ভাল না বাসলেও তারা তার ওপরে বিরাজের মতন সোজাসুজি কোন কঠোর ব্যবহার করত না। কেন যে অমৃতর প্রতি তিনি এত বেশী চটা ছিলেন অন্য কেউ তো দূরের কথা অমৃত নিজেই তার কারণ জান্‌ত না। বিরাজ প্রথমে মনে করেছিলেন, ভুবনকে সোজাসুজি বলে দেবেন, সে যেন অমৃতকে তার বাড়ীতে আস্‌তে না দেয়, কিন্তু আবার কি মনে কোরে তিনি সে মতলব বদ্‌লে ফেলে তাঁর মনের ইচ্ছাটা ভুবনের কাছে ভাবে-ভঙ্গীতে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

যে লোক এত উপকার করেছে তাকে বাড়ীতে আস্‌তে বারণ কোরে দেবার কথাটা ভুবনকে বল্‌তে সঙ্কোচ হয়েছিল বলেই বিরাজ সেদিন সেই রকম অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ধারণ কোরে তার মনের কথা ভুবনের কাছে প্রকাশ করবার চেষ্টা করলেন। সেদিন ভুবন বাড়ী চলে যাবার পর বিরাজ ভাবলেন—এতে যদি ফল না হয় তবে একদিন মুখ ফুটেই বলে দিতে হবে, সৎকাজে সঙ্কোচ কর্‌লে চল্‌বে না।

৬

বিরাজ নিজেই অমৃতকে ভুবনের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার বাড়ীতে অমৃতর আসা-যাওয়াটা যে বিরাজের অপ্রীতিকর হোতে পারে সে ধারণাই তার ছিল না। সেদিন বিরাজের ব্যবহারের মধ্যে সে বিরক্তি ও রাগের পরিচয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু তার কারণটা সে কিছুতেই অনুমান করতে পারছিল না। সেদিন রাত্রের সেই অসুখের পর ভুবনকে তিন চার দিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। অমৃতর সেবা আর তার আনন্দের আবহাওয়ায় সেবারকার আক্রমণটা সে শীগ্‌গীরই ঝেড়ে ফেল্লে। ভুবনের অসুখের সময় অমৃতকে কয়েকদিন ঘন ঘন তার বাড়ীতে যাওয়া-আসা করতে হচ্ছিল। এর মধ্যে একদিন বাড়ীর সামনে দিয়ে অমৃতকে যেতে দেখে বিরাজ জিজ্ঞাসা কোরে জানতে পারলেন যে, সে ভুবনের ওখান থেকে আসছে। বিরাজ তখনি স্থির করলেন যে, আর বাড়াবাড়ি হোতে দেওয়া ঠিক নয়। তিনি অমৃতকে বল্লেন—তুই রোজ রোজ ওখানে কি করতে যাস্‌রে?

অমৃত এই রকম প্রশ্ন শোনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না! বিরাজের প্রশ্ন শুনে সে একটু কাঁচুমাচু হোয়ে পড়্‌ল।

বিরাজ আবার বল্লেন—ফের্‌ যদি তোমায় ভুবনের ওখানে দেখতে পাই তো ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

অমৃত এবার আর বিরাজের কথা নীরবে হজম না কোরে উত্তর দিলে—যাদের বাড়ী যাই তারা যখন বারণ করবে তখন সে দেখা যাবে, আপনি আবার আমার কি মন্দ করবেন? আপনার বাড়ীতে তো আর যাই-নি—

অমৃতের মুখে আরও কতকগুলো কথা এসে পড়্‌ল কিন্তু পাছে নিজেকে সংযত রাখতে না পারে এই ভেবে সে তার কথা শেষ না কোরেই হন্ হন্ কোরে বাড়ীমুখো চলে গেল।

বিরাজমোহিনী স্বপ্নেও মনে করেন-নি যে, অমৃত তাঁর মুখের ওপর এমন জবাব দেবে। তিনি ভাবতে লাগলেন —এই অমৃত, যে তাঁর চোখ রাঙানি দেখ্‌লে ভয়ে দৌড় লাগাত, সে কিনা—নিশ্চয় ভুবনের আস্কারা পেয়ে তার এতটা বাড় হয়েছে। তার মনে হোলো যে, ভুবন তার বিরুদ্ধে মস্ত একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে। কিন্তু আর সেটা বাড়তে দেওয়া হবে না। বিরাজ সেই অবস্থাতেই রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে ভুবনের বাড়ীর দিকে ছুট্‌ল।

কদিন অসুখে ভুগে ভুবনের শরীরটা বড় নির্জ্জীব হোয়ে পড়েছিল। সে একটা শাল দিয়ে গলা অবধি ঢেকে সাম্‌নের বারান্দায় একখানা ইজি-চেয়ারে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল, এমন সময় রুদ্রমূর্ত্তি বিরাজ হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে হাজির হলেন।

বিরাজের সেই রকম মূর্ত্তি দেখে ভুবনের আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল। সে মনে করলে সেদিনকার গাম্ভীর্য্যটা এইবার বুঝি ফাট্‌বে। বিরাজ সোজা ভুবনের কাছে এসে একটু ঝাঁজাল স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—ভুবন এ-সব কি কাণ্ড হচ্ছে শুনি ?

ভুবন আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লে—কি হয়েছে ?

—তোমার বাড়ীতে অমৃত ছোঁড়া এত যাতায়াত করে কেন ? দিন নেই, দুপুর নেই এখানে আসবার তার এত কিসের দরকার পড়ে।

হঠাৎ উত্তেজনায় ভুবনের বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি হোতে লাগ্‌ল, চোখের সামনের সমস্ত জিনিষকে সে ধোঁয়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে জ্ঞানহারা হোয়ে পড়্‌ল।

ভুবন যে এই কদিন ধরে অসুখে ভুগ্‌ছে বিরাজ তা জানতেন না। হঠাৎ ভুবনের ঐ রকম অবস্থা হওয়াতে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তার মুখে-চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কর্‌তে লাগলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরও তার জ্ঞান হোলো না দেখে বাড়ীর একজন চাকরকে ডাক্তারের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এবার কি মনে কোরে তিনি আর অমৃতের বাড়ীতে লোক না পাঠিয়ে নিজের বাড়ীর চাকর দিয়ে ভুবনের তদ্বির করতে লাগ্‌লেন। ডাক্তার এসে বল্লেন—মনের মধ্যে কোন রকম উত্তেজনা হোলে অবস্থা আরো খারাপ হোয়ে দাঁড়াতে পারে, একটু সাবধানে থাকবেন।

আবার কয়েকদিন বিছানায় শুয়ে থাকবার ব্যবস্থা কোরে দিয়ে ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যেবেলায় অমৃত ভুবনের বাড়ীতে এসে দেখ্‌লে যে, সে বিছানায় শুয়ে রয়েছে আর বিরাজ কাছে বসে তার সেবা করছেন। সকাল থেকে একলা রুগীর পাশে বসে থেকে থেকে বিরাজের বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। অমৃতকে দেখ্‌তে না পারলেও রোগীশয্যার পাশ থেকে মুক্তি পাবেন এই ভেবে অমৃতকে দেখে সেই অবস্থায় বিরাজের মনে একটু আনন্দ হোলো; তা ছাড়া রুগীর সেবার কাজে অমৃত যে তাঁর চেয়েও পাকা লোক সেটা তিনি বেশ ভাল কোরেই জানতেন। এ সময় আর ঝগড়া-ঝাঁটির কথা না তুলে অমৃতের ওপর ভুবনের সেবার ভার দিয়ে বুদ্ধিমতীর মত তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন।

বিরাজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে অমৃত ভুবনকে জিজ্ঞেস করলে—আবার কি কোরে অসুখ বাড়ালেন্? বাগানে নেমেছিলেন বুঝি?

ভুবন ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলে—না।

—তবে? উনি এসে বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিয়েছিলেন বুঝি? একটুও

আক্কেল নেই। ওঁর বক্তৃতার চোটে জোয়ান পুরুষদেরই বুক ধড়্‌ফড়্‌ করতে থাকে তো অন্য কেউ।

ভুবন কোনও কথার জবাব না দিয়ে চোখ বুঁজিয়ে পড়ে রইলো। এবারকার আক্রমণটা এত বেশী হয়েছিল যে, তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। চুপ্‌ কোরে পড়ে থেকে সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল এ যাত্রা বোধ হয় আর নিস্তার নেই। খানিকক্ষণ পরে সে আস্তে আস্তে অমৃতকে বল্লে—অমৃত, বাবা, লীলাকে খবর দিয়ে আনা, বোধহয় আর দেখা হোলো না।

ভুবনের কথায় অমৃত ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে দেখ্‌লে যে, হাতখানা অস্বাভাবিক রকমের ঠাণ্ডা। কিন্তু নাড়ী বেশ সহজ ভাবে চল্‌ছে দেখে সে হাতখানাকে আবার ঢাকা দিয়ে দিলে। ভুবন আবার বলতে লাগ্‌ল—আমি মরে গেলে লীলার কি হবে বাবা? তাকে তোদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখিস্‌।

অমৃত বল্লে—কেন আপনি ও-সব ছাই-ভস্ম ভেবে নিজের মাথা খারাপ করছেন!

—না তুই বল লীলাকে তোদের ওখানে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বি? সুকুমারদের বাড়ীতে থাক্‌লে বাছা আমার দু-দিনেই মরে যাবে।

ভুবনের কথার মধ্যে এমন একটা করুণ সুর বাজছিল যে, তা শুনে অমৃতর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবার উপক্রম হোতে লাগ্‌ল। সে বল্লে—আচ্ছা আমি বল্‌ছি লীলার থাকবার কোন ভাবনা নেই, আমি বেঁচে থাকলে সে ভাল জায়গাতেই থাকবে।

অমৃতর কথায় ভুবনের বুকের ওপর থেকে যেন একটা ভারী পাষাণের বোঝা নেমে গেল। এত বড় পৃথিবীর মধ্যে এই ছেলেটী ছাড়া সে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। এই অমৃত সহানুভূতি, সেবা, সাহায্য ও সংসর্গ দিয়ে তার মনকে এমন বাঁধনে বেঁধেছে যে, সংসারে

তাকেই ভুবনের সব চেয়ে বেশী আপনার বলে মনে হোতো। ভুবন ভাব্‌তে লাগ্‌ল, অমৃত তার বাড়ীতে আসে-যায় বলে বিরাজের এত বিরক্তি! কথাটা মনে হোতেই তার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

বিরাজ সেদিন ভুবনকে একটু শাসন করবার মনস্থ কোরে এসে শেষটায় মহা ফাঁপরেই পড়ে গিয়েছিলেন। ভুবন যে অসুখে ভুগ্‌ছে তিনি তা মোটেই জানতেন না, জানলে হয়তো সেদিন তাকে ধমক না দিয়ে অন্য দিনের জন্য সে কথাগুলো তুলে রেখে দিতেন। তাঁর ধমক খেয়ে ভুবনের ঐ রকম অবস্থা হওয়ায় তিনি মনে মনে সেদিন একটু অনুতপ্তও হয়েছিলেন। অমৃত এসে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার পর তিনি বাড়ীতে এসে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া চিন্তা করতে লাগলেন। সেই দারুণ সঙ্কটের সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে অমৃতকে কাছে পেয়ে তাঁর আহ্লাদ হয়েছিল বটে, কিন্তু বাড়ীতে এসে একটু ভাববার অবকাশ পেতেই আবার অমৃতর ওপর তাঁর রাগ চড়্‌তে আরম্ভ হোলো। সকাল-বেলা অমৃত তাঁকে যে বচনের খোঁচা লাগিয়ে গিয়েছিল, যতই সেটা মনে হচ্ছিল ততই তার জ্বালা তাঁর মনকে জর্জ্জরিত কোরে তুল্‌তে লাগ্‌ল। বিরাজ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—যেমন কোরে পারি অমৃতকে ভুবনের বাড়ী থেকে তাড়াবই তাড়াব!

পরদিন সকাল বেলা বিরাজ ভুবনকে দেখ্‌তে এসেছিলেন। বিরাজকে দেখেই ভুবন ভয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু সেদিন বিরাজের কথাবার্ত্তা ও হাবভাবের মধ্যে দিয়ে এমন একটা সহানুভূতি ও অমায়িকতা ফুটে উঠ্‌ছিল যে, ভুবনের মন থেকে তখুনি সে ভয়টা কেটে গিয়ে বিরাজের প্রতি একটা নতুন সম্ভ্রমে তার অন্তরটা ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সেদিন সকালে লীলার একখানা চিঠি পেয়ে তার মনটা এমনিতেই একটু প্রফুল্ল হয়েছিল, শরীর বিশেষ খারাপ থাকলেও লীলার চিঠিখানা ওষুধের চেয়েও ভাল কাজ করেছিল। বিরাজের কথাবার্ত্তা শুনতে শুনতে ভুবনের মনে হোলো যে, গতরাত্রে

সে তাঁর ওপর অবিচার কোরে ফেলেছে। বিরাজের সাম্‌নেই যে কাল সে তার মনের ভাব প্রকাশ কোরে ফেলে-নি সেজন্য সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ল।

অমৃত ও বিরাজের সেবার গুণে ভুবন কয়েকদিনের মধ্যে বেশ সুস্থ হোয়ে উঠ্‌ল। শারীরিক ব্যাধির চেয়ে মানসিক ব্যাধিই তাকে এই কয়দিনে বিশেষ রকম কাবু কোরে ফেলেছিল। এই কয়দিন ধরে যে ভাবনাটা তাঁর মনের মধ্যে দিনরাত খোঁচা দিচ্ছিল, বিরাজের শান্ত মূর্ত্তি দেখে সে-ভাবনার হাত থেকে সে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেল। ভুবনের অসুখ সেরে যাবার প্রায় পনেরো দিন পরে বিরাজ একদিন তাকে বেশ শান্তভাবে বল্লেন—দেখ ভুবন, তুমি অমৃতকে যখন-তখন তোমার বাড়ীতে আসতে বারণ কোরে দিও। ওর স্বভাব-চরিত্র তেমন ভাল নয়।

বিরাজ যদি ভুবনকে লীলার জন্মের ইতিহাসটা আগাগোড়া বলে যেতেন্ তাতেও সে বোধ হয় এতটা আশ্চর্য্য হোতো না। অমৃতের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়! এ কথার সে কী জবাব দেবে! ভুবন নির্ব্বাক হোয়ে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

বিরাজ আবার বল্লেন—ও যে মদ খায় এ-কথা সোনালীর সমস্ত লোক জানে।

বিরাজের কথা শুনে ভুবনের ধাঁ কোরে একটা কথা মনে পড়্‌ল। অমৃত তাকে একদিন বলেছিল—আপনিই একদিন আস্‌তে বারণ কোরে দেবেন। অমৃত কেন যে সেদিন ঐ কথা বলেছিল তার কারণটা আজ তার কাছে স্পষ্ট হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ চুপ্ কোরে থেকে সে বল্লে—কিন্তু আমিই যে তাকে আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে অনুরোধ করেছি; এখন আবার কি বলে——

বিরাজ একটু তিরস্কারের সুরে বল্লেন—এখন আস্‌তে বারণ করাটা

ভাল দেখায় না বটে, কিন্তু ভাল দেখাবে না বলে কি একটা বদমাইস মাতালকে বাড়ীতে আস্‌তে দিতে হবে!

ভুবন এ-কথার কোন জবাব খুঁজে পেলে না। সে ভেবে দেখ্‌লে, বিরাজের কথা যদি সত্যি হয় তবে অমৃতকে আস্‌তে বারণ করাই শ্রেয়। সেখানে তার অভিভাবক বল্‌তে আর কেউ নেই; বিরাজ নিশ্চয় তার ভালোর জন্যই এই কথা বল্‌ছেন। তা না হোলে এতে আর তাঁর কি স্বার্থ থাকতে পারে? কিন্তু অমৃত মাতাল, তার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয় এই কথাগুলো বিশ্বাস করতে কিছুতেই তার মন চাইছিল না। তার জন্য সে যা করেছে, সেই উপকারগুলো মনে হচ্ছিল আর ভাব্‌ছিল, কি কোরে তাকে সে তার বাড়ীতে আস্‌তে বারণ কর্‌বে? না না তা সে কিছুতেই পারবে না, সে মাতালই হোক, আর যাই হোক্, তাতে তার কি! এত অকৃতজ্ঞ সে হোতে পারবে না।

বিরাজ চলে যাবার পর সমস্ত বিকেলটা সে অমৃতর প্রতীক্ষায় বসে রইলো। অমৃত সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় না আসা পর্য্যন্ত তার প্রাণটা ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌ল। সন্ধ্যেবেলা অমৃত আস্‌তে না আস্‌তেই ভুবন তাকে প্রশ্ন কর্‌লে—হ্যাঁরে অমৃত তুই নাকি মদ খাস্?

—হ্যাঁ প্রত্যহ একটি পাঁট।

অমৃতর মুখে এই উত্তর শুনে ভুবন একেবারে দমে গেল। সে মনে করেছিল, অমৃত নিশ্চয় তার কথা শুনে অপ্রস্তুত হোয়ে পড়্‌বে, কিন্তু তার জবাব দেওয়ার রকম দেখেই ভুবনের মনে পড়ে গেল যে, সে তো অপ্রস্তুত কিংবা কাঁচুমাচু হোয়ে পড়বার পাত্র নয়!

ভুবনের সঙ্গে অমৃতর যখন আত্মীয়তা আরম্ভ হয়, তখন তাকে সে প্রশংসার চোখে দেখ্‌ত, কিন্তু তার সঙ্গে ভুবনের অন্তরের বন্ধন তখন পাকা হয় নি। প্রতিদিন মেলামেশার মধ্যে দিয়ে ক্রমে অমৃত ভুবনের হৃদয়ের

অনেকখানি জায়গা অধিকার কোরে বসেছিল। এখন সে যে তার কথার এই রকম রূঢ় উত্তর দেবে তা ভুবন আশা করে-নি। তার উত্তর শুনে সে মনে আঘাত পেলে। ভুবন তার কথার কোন জবাব দিতে না পেরে চুপ্ কোরে ভাবতে লাগ্ল, বিরাজ তাকে অমৃতর কথা না জানালেই পার্ত। তার বিরাজের ওপর ভয়ানক রাগ হোতে লাগ্ল। অনেকক্ষণ চুপ্ কোরে থেকে অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে অমৃতর হাত ধরে ভুবন বল্লে—ও সব আর খাস্নে বাবা, কি হয় ঐ ছাই-ভস্মগুলো খেয়ে? মিছিমিছি শরীর নষ্ট আর লোকনিন্দা—

অমৃত ভুবনের হাতটা সজোরে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে—আপনাকে এই খবরটা কে দিলে শুনি?

ভুবন আবার তার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধস্বরে বল্লে—থাক্‌গে মাথামুণ্ডু ও-সব কথা—

সে দুঃখুকে চার জোগাড় করতে বলে দিলে। অমৃত কিন্তু সেই রকম রাগত ভাবে আবার বল্লে—কিন্তু আমি জানতে চাই কে আপনাকে এই সংবাদটা দিয়েছে।

ভুবন ব্যাপারটাকে হাল্কা কোরে আনবার জন্য বল্লে—যাক্‌গে যার যা ইচ্ছে বলে বলুক, সেজন্যে মন খারাপ কোরে আর কি হবে!

ভুবনের কথা শুনে অমৃত আসন ছেড়ে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তার পর দুই তিন লাফে সিঁড়িটা পার হোয়ে দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্ল।

একটু পরেই দুঃখু চায়ের সব সরঞ্জাম ঠিক কোরে নিয়ে এল, ভুবন তাকে বলে দিলে—আজ আর চা খাব না রে দুঃখু, সব নিয়ে যা—

৭.

অমৃত চলে যাওয়ার পর ভুবনের নিজের ওপর রাগ হোতে লাগ্‌ল। কেন সে বিরাজের কথা শুনে অমৃতকে মদ খাওয়ার কথা বল্‌তে গেল! তার মনে হোলো আবার যেন সে নিঃস্ব হোয়ে পড়েছে—অমৃতর ওপর তার একটু অভিমানও হোলো।

ভুবনের আবার একলা দিন কাটতে লাগ্‌ল। বিরাজমোহিনী মাঝে মাঝে আস্‌তেন বটে, কিন্তু তিনি যতক্ষণ থাকতেন ততক্ষণ উপদেশ দিতেন। উপদেশ দিতে দিতে হাঁপিয়ে গেলে তিনি উঠে বাড়ী চলে যেতেন। রবিবারে বিরাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে যেতেন। কয়েকমাস এই ভাবে চলার পর হঠাৎ বিরাজও তার বাড়ীতে আসা বন্ধ কোরে দিলেন। ভুবন প্রথমে মনে করেছিল, হয়তো তাঁর কোন অসুখ করেছে কিন্তু কয়েকদিন পরেই সে লক্ষ্য কোরে দেখ্‌লে যে, বিরাজ প্রায় তার বাড়ীর সামনে দিয়ে বিকেলে বেড়াতে যান অথচ তার বাড়ীতে ঢোকেন না। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এ আবার কি!

এই ব্যাপারের দিনকতক পরে একদিন ভুবন মন্দিরে গেল। ও-পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে একটু গল্প করবার জন্য সে উপাসনা আরম্ভ হবার একটু আগেই গিয়েছিল। মন্দিরের পেছনে একটুখানি বাগান ছিল, এইখানে মেয়েরা বসে গল্প করতেন, ভুবন গিয়ে দেখলে যে, সেখানে এক জায়গায় মস্ত সভা বসেছে। সভার মাঝখানে বিরাজ বেশ জাঁকিয়ে বসে কি বলছেন, আর তাঁর চারপাশে বারো-তেরো জন মহিলা গোল হোয়ে বসে শুনছেন। ভুবন সেখানে গিয়ে দাঁড়ান-মাত্র বিরাজের বক্তৃতার স্রোত থেমে গেল। ভুবনকে সেখানে উপস্থিত হোতে দেখে

সকলের মুখেই এমন একটা ভাব ফুটে উঠ্‌ল যা দেখে ভুবন একটু অপ্রস্তুত হোয়ে পড়্‌ল বটে, কিন্তু সেখান থেকে নড়্‌তে পার্‌লে না। সবাইকে দেখে সে-ও সেই চক্রের এক জায়গায় বসে পড়্‌ল। কিছুক্ষণ চুপ্‌ কোরে থেকে বিরাজ আবার বল্‌তে লাগলেন—কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ তো এদের এমন ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। যারা খোলাখুলি ভাবে এসে সবার সামনে নিজের পাপ স্বীকার কর্‌বে—বোঝা যাবে তাদেরই অনুতাপ হয়েছে; যাদের অনুতাপ হয়-নি, তার ওপরে নিজেদের পাপের কথা একেবারে লুকিয়ে—

ঠিক এই সময় চক্রের এক জায়গা থেকে একটি মেয়ে উঠে গিয়ে বিরাজের কানে কানে কি একটা কথা বল্লেন। বিরাজ তার দিকে ফিরে সকলেই শুনতে পায় এমান স্বরে বল্লেন—তুমি চুপ্‌ কর সুশীলা, আমরা তো লুকিয়ে কোন কথা বল্‌ছি না, আমাদের লুকোবার কিছু নেইও। লুকিয়ে কোন কাজ করা আমাদের অভ্যাসও নেই। যার কথা হচ্ছে সে যদি এখানে থাকে তো সে শুনে যাক্‌ যে, ও-রকম চরিত্রের লোকের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা করা অসম্ভব।

এই কথাগুলো বলে বিরাজ সেখান থেকে উঠে গর্‌ গর্‌ করতে করতে অন্যত্র চলে গেলেন! বিরাজের পর অন্য মেয়েরাও একে একে উঠে এদিক-ওদিক পায়চারী করতে লাগলেন। সেখানে বসে রইলো কেবল ভুবন—একা!

কার কথা হচ্ছিল, কার ওপর এই মন্তব্যগুলি হোলো তা বুঝতে ভুবনের আর বেশী কষ্ট পেতে হোলো না। তার মাথা থেকে পা অবধি সর্ব্বাঙ্গ অবশ হোয়ে আস্‌ছিল। এইটি যে একদিন হবেই তা সে জান্‌ত, কিন্তু এত লোকের সাম্‌নে এমন বিশ্রীভাবে যে সে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তা ভুবনের ধারণার অতীত ছিল। সেইখানে বসে বসে তার মাথা

ঘুরতে লাগ্‌ল। তার মনে হচ্ছিল এই মন্দির, আকাশ, দূরের গাছপালা সকলেই যেন এক সুরে তার নিন্দার কথা, সেই লজ্জার কথা জগতে প্রচার করছে। ক্রমে তার চোখের সাম্‌নেকার সমস্ত জিনিষ মিলিয়ে গিয়ে অন্তরে বাহিরে রইলো শুধু লজ্জা। ভুবন আত্মবিস্মৃত হোয়ে সেখানে বসে রইলো।

বেলা পড়ে গেল, মন্দির বসবার ঘণ্টা পড়ে গেল, বাইরে যে-সব মেয়ে পায়চারী কোরে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁরা সবাই মন্দিরের মধ্যে চলে গেলেন ; কিন্তু সেদিকে ভুবনের কোন খেয়ালই নাই। সময়ের কোন জ্ঞানই তার ছিল না। হঠাৎ মন্দিরের মধ্যে থেকে গানের একটা কলি ভেসে এসে তার কানে লাগ্‌তেই তার চমক্ ভেঙে গেল—"নিঠুর হে এই করেছ ভাল।" গান হোয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে সে মন্দিরের ভেতর গেল। অনেক কষ্টে একটু জায়গা কোরে নিয়ে যখন সে বস্‌লে, তখন আচার্য্য বেদীতে বসে বলছিলেন—"হে পরম পিতা, হে পূর্ণ, হে ঈশ্বর, —আমরা যেন পাপকে ঘৃণা করি ; পাপীকে বুকে স্থান দিতে পারি, আমাদের হৃদয়ে এমন বল দাও—"

লীলা স্কুলের সব থেকে উঁচু ক্লাসে পড়লেও স্কুলের সব থেকে নীচু ক্লাসের মেয়েরাও দুষ্টুমিতে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। লেখা-পড়াতে সে বেশ ভাল মেয়ে ছিল। এবারে তার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার কথা। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা ধরে রেখেছিলেন যে, লীলা বেশ ভাল কোরে পাশ করবে, কিন্তু বেশ ভাল কোরে পাশ করার চেয়েও একটু বেশী কিছু করবার জন্য সে উঠে-পড়ে লেগেছিল। বাড়ীতে গেলে পরীক্ষা পাশের পড়ার অসুবিধা হবে বলে এবার সে ও জনকয়েক ছাত্রী পূজোর ছুটির সময় বোর্ডিংয়েই থাকবার বন্দোবস্ত করেছিল।

সেদিন দুপুর বেলা লীলা বোর্ডিংয়ের এক ঘরে রাস্তার ধারের জানলার সামনে বসে ইতিহাস নিয়ে ঔরংজেবের জীবন-কাহিনী মুখস্ত করছিল। নিষ্ঠুর ঔরংজেব কোন প্রাণে তার এমন স্নেহশীল, পুত্রবৎসল পিতাকে কারারুদ্ধ করলে, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য একে-একে কেমন কোরে সে তার সিংহাসন পাবার কণ্টকস্বরূপ ভাইদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে। কোন প্রাণে সে তার কন্যাকে আমরণ কারারুদ্ধ কোরে রেখেছিল, এই ভাবনার ঢেউ এসে তার তন্ময়তায় আঘাত দিচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল তার বাবা নাই, ভাই নাই, বোন নাই—ভগবান যদি তার একটি ছোট বোন কিংবা ভাই দিতেন, তবে কেমন কোরে তাদের ভালবাসতে হয় তা একবার দেখিয়ে দিতুম। ইতিহাসের পাতা ছেড়ে, তার মনটা আগ্রা, দিল্লী, সোনালী নানা জায়গায় ঘুরে মরছিল—পরীক্ষার কথা মনে হোতেই আবার সে তার বিক্ষিপ্ত মনকে জড় কোরে নিয়ে পরীক্ষা পাশের অধ্যবসায়ে সঁপে দিচ্ছিল, এমন সময় মিস্ রায় গম্ভীরমুখে তার ঘরে এসে ঢুকলেন।

বোর্ডিংয়ে প্রথম এসে মিস্ রায়কে দেখে লীলা যেমন ভয় পেয়েছিল আজ ছ-সাত বছর একসঙ্গে থাকার ফলে তত ভয় আর ছিল না। বিশেষ, সে এখন স্কুলের সর্ব্বপ্রধানা ছাত্রী, আর ওপরের ক্লাসের মেয়েদের তিনি কিছু বলতেনও না। মিস্ রায়কে ঘরে ঢুক্‌তে দেখে লীলা বইখানা বন্ধ কোরে ফেল্লে। মিস্ রায় একবার—কি পড়া হোচ্ছে—জিজ্ঞাসা কোরে রাস্তার ধারের খোলা জানলাটার ধারে এসে দাঁড়িয়ে একবার রাস্তাটা দেখে নিলেন, তার পর আস্তে আস্তে জানলার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে বল্লেন—লীলা বাড়ীর কোন খবর পেয়েছ ?

মিস্ রায়ের প্রশ্নে আশ্চর্য্য হোয়ে লীলা বল্লে—না !

মিস্ রায় বল্লেন—তোমার মার বড় অসুখ, তিনি তোমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিতে লিখেছেন।

মার অসুখের কথা শুনে লীলা বড় আকুল হোয়ে উঠ্‌ল। সে ভুবনের বুকের অসুখের কথা জান্‌ত, সে অসুখে কখন কি হয় তা আগে বুঝতে পারা যায় না, তাও তার জানা ছিল। সে ব্যস্ত হোয়ে মিস্ রায়কে বল্লে—আমি আজকেই যাব।

বোর্ডিংয়ে যারা থাকে তাদের নিয়ে যাবার জন্য প্রত্যেকের বাড়ী থেকেই লোক আসে। লীলাকে অমৃতই নিয়ে যেত, কিংবা তার অসুবিধা হোলে সোনালীর অন্য মেয়েদের জন্য যে লোক আস্‌ত লীলা তাদের সঙ্গে বাড়ী চলে যেত।

লীলার বাড়ী যাবার কথা শুনে মিস্ রায় তাকে বলে দিলেন—তা হোলে এক কাজ কর, বাড়ীতে লিখে দাও কেউ এসে তোমাকে নিয়ে যাক্, এখানে তো এমন কোন লোক দেখ্‌ছি না যে তোমায় রেখে আস্‌তে পারে।

লীলা মহা সমস্যায় পড়ে গেল। বাড়ীতে সে কাকেই বা তাকে নিয়ে

যাবার জন্য লিখ্‌বে! অনেক ভেবে চিন্তে সে অমৃতর কাছেই একটা তার কোরে দিলে।

পরের দিন সকালে অমৃত আসা-মাত্র লীলা তাকে জিজ্ঞাসা করলে—অমৃত-দা, মা কেমন আছেন?

লীলার মুখে এই প্রশ্ন শুনে অমৃত বিপদে পড়ে গেল। ভুবনের সঙ্গে ঝগড়া কোরে সেই যে চলে এসেছিল তারপর সে আর ও-পথ মাড়ায়-নি। তার ধারণা ছিল যে, লীলা আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারই জানে। হঠাৎ কলকাতা থেকে লীলার টেলিগ্রাম পেয়ে সে কোন বিপদে পড়েছে মনে কোরে অমৃত কোন রকম চিন্তা না কোরেই ছুটে চলে এসেছিল; কিন্তু লীলার মুখে প্রথমেই ভুবনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন শুনে সে একটু আম্‌তা-আম্‌তা কোরে বল্লে—কেন মাসীমা তো ভাল আছেন! অমৃতর জবাবের মধ্যে সেই রকম আম্‌তা-আম্‌তা ভাব মেশানো রয়েছে দেখে লীলার মনে সন্দেহ হোলো। সে ভাবলে যে তার মার আসল অবস্থা তারা সবাই মিলে তার কাছে গোপন করছে। লীলা বল্লে—আজই সন্ধ্যের গাড়ীতে আমি তোমার সঙ্গে সোনালী চলে যাব। তুমি তার বন্দোবস্ত কর অমৃত-দা।

অমৃত দু-খানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর বেঞ্চি রিজার্ভ কোরে সন্ধ্যেবেলা লীলাকে বোর্ডিং থেকে নিয়ে গেল।

গাড়ীতে উঠে অমৃত কিংবা লীলা কেউ কারুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারছিল না, দু-জনে দু-দিকের জানালায় মুখ বাড়িয়ে বসে রইলো। তাদের কামরায় অন্য কোন যাত্রীও ছিল না যে, তাদের সঙ্গে কথা বলে কিছু সময় কাটান যাবে। মাঝ-রাতে গাড়ীখানা একটা বড় ষ্টেশনে ঢুকতেই তাদের নিস্তব্ধ ঘুম-খাওয়া মনটা ষ্টেশনের আলোতে একবার চন্‌মনিয়ে উঠ্‌ল। ট্রেণ থামতেই লীলা নিজের জায়গা ছেড়ে

উঠে গিয়ে গাড়ীর দরজার কাটা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ষ্টেশন দেখ্‌তে লাগ্‌ল। একটু পরেই সে বল্লে—অমৃত-দা চা খাব।

অমৃত গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে দু-পেয়ালা চা নিয়ে এল। চা খাওয়ার পর গাড়ীখানা ষ্টেশন ছাড়্‌তেই লীলা বল্লে—অমৃত-দা সত্যি কোরে বল না ভাই মা কেমন আছেন?

লীলার সেই বেদনা-মাখা মুখ দেখে আর মিনতি-ভরা সুর শুনে অমৃতর বুকের মধ্যে দিয়ে অপ্রত্যাশিত-ভাবে একটা বিদ্যুতের হল্‌কা ছুটে গেল। অমৃতর এ-রকম অনুভূতি এর আগে আর কখনো হয়-নি। এ জন্য সে নিজেই মনে মনে আশ্চর্য্য হোয়ে যেতে লাগ্‌ল। নিজেকে সাম্‌লে সে লীলার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে মুখখানাতে তখনও সেই বেদনা মাখান রয়েছে। মিথ্যে কথা সে বল্‌ত না, মিথ্যে কথা বলবার মতন কাজ কর্‌তে হোতো না বলে যে সে মিথ্যে বল্‌ত, না, তা নয়। মিথ্যে না বলবার কারণ, সে দুনিয়ায় কাউকে ভয় কর্‌ত না। লীলা প্রথমেই যখন তাকে ভুবনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন তার উৎকণ্ঠা দেখে সে কিছু না ভেবেই তাকে বলে ফেলেছিল যে, মাসীমা ভাল আছেন। কিন্তু এবার আর সে কিছুতেই মিথ্যে বল্‌তে পার্‌লে না। লীলার প্রশ্ন শুনে সে বলে ফেল্লে—আজ প্রায় ছ-মাস আমি তোমাদের বাড়ী যাই-নি, মাসীমার খবর ঠিক বল্‌তে পারি না।

অমৃতের কথা শুনে লীলা ভয়ানক আশ্চর্য্য হোয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন কি হয়েছে?

কি যে হয়েছে তার, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অমৃত লীলাকে খুলে বলে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে লীলা আর কোন কথা বল্লে না, সে আবার জানলার দিকে মুখ বাড়িয়ে বস্‌ল।

বাইরে গাঢ় অন্ধকার। আকাশে ফালির মতন একটু চাঁদ, তাও আবার

কখনো কখনো মেঘে ঢাকা পড়ছে। রেল-লাইনের ধারে টেলিগ্রাফের তারে কোথাও বা দুটি পাখী গা ঘেঁষাঘেঁষি কোরে বসে রয়েছে। তারের ওপারে ঘন বন, কিছু দেখা যায় না, মাঝে মাঝে এক একটা উঁচু পাহাড়—লীলার চোখের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলের হিসাবে এই দৃশ্যগুলো ভেসে যেতে লাগল। অন্ধকারের দিকে অনেকক্ষণ এইভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল, সে গাড়ীর মধ্যে মুখ নিয়ে এসে জানলার কাচ তুলে দিয়ে বসে-বসেই ঢুলতে আরম্ভ কোরে দিলে।

অমৃত চা খেয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে গদীর ওপর লম্বা হোয়ে পড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ট্রেণের নানারকম শব্দে তার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মাথাটা ফিরিয়ে সে একবার লীলার দিকে চেয়ে দেখলে যে, সে বসে বসেই ঘুমুচ্ছে। তার ফুটন্ত গোলাপের মতন মুখখানা ঘুমের ঘোরে একেবারে কোলের কাছে নুয়ে পড়েছে। অমৃত পলকবিহীন-নেত্রে লীলার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। লীলার ঘুমন্ত মুখখানা দেখতে দেখতে তার মনে হোলো—লীলা সুন্দরী। সঙ্গে সঙ্গে অমনি এটাও মনে হোলো—লীলা ধনী, আর সে—দীন দরিদ্র। ভাবনাটা আরম্ভ হবার মুখেই অমৃত তার গলা টিপে মেরে ফেলবার চেষ্টা করলে বটে, কিন্তু কিছুতেই সে এই চিন্তাকে রোধ করতে পারলে না। ট্রেণ চলার তাল যেন তার চিন্তাগুলোকে ধাক্কা মেরে মেরে এগিয়ে নিয়ে চলল। অমৃত ভাবতে লাগল—যদি তাই হোতো! কিন্তু তা হবার উপায় নাই, সে যে দীন দরিদ্র। দারিদ্র্যের কলঙ্ক বিদ্যা দিয়ে মুছে ফেলতে পারা যায়, কিন্তু সে তো তাও করে-নি। সোনালীর অনেক ছেলেই তার সঙ্গে পড়ত, যারা তারই মতন দরিদ্র পিতামাতার ছেলে, আজ তাদের মধ্যে অনেকেই কৃতী। নানা দিকে নানা বিষয়ে তারা তাদের জীবনকে জগতের চোখে

সার্থক কোরে তুলেছে। আর সে!—শুধু পৃথিবীতে দুর্নামই কিনেছে। লীলার দিকে সে আবার ফিরে দেখ্‌লে। লীলা জানলার কাচে মাথাটা দিয়ে ঘুমুচ্ছে।—ঐ সুন্দর মুখখানা—না না! এ যাত্রায় তা আর হবার যো নাই। তার অর্থ নাই, বিদ্যা নাই—তার কিছুই নাই।

ভাবনাগুলোকে যতই সে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল সেগুলো যেন ততই তাকে পেয়ে বস্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের ঘুমন্ত বাসনাগুলো আজকে কিসের সুযোগ পেয়ে এমন ধারা বল্‌গা ছাড়া হোয়ে ছুট্‌তে আরম্ভ করেছে তার কিনারা সে করতে পার্‌ছিল না। লীলাকে একবার বাহুতে জড়িয়ে ধরবার জন্য তার সমস্ত পৌরুষ বুকের মধ্যে লাফালাফি করতে সুরু কোরে দিলে। প্রাণপণ শক্তিতে সে নিজকে সংযত রেখে দু-হাতে জানালাটা চেপে ধরে পড়ে রইলো। হঠাৎ লালা যেন কিসের স্বপ্ন দেখে চম্‌কে উঠে একবার অমৃতর দিকে চাইলে! চোখ দুটোকে রগ্‌ড়ে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—অমৃত-দা অসুখ কর্‌ছে নাকি?

অমৃত বল্লে—নাঃ, কিছুতেই ঘুম আস্‌ছে না; মাথাটা গরম হোয়ে উঠেছে, তুমি ঘুমোও।

লীলা আর কোন কথা না বলে গদীর ওপর লম্বা হোয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

সমস্ত রাত্রি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে অমৃতর পরিশ্রান্ত মনটা যখন এলিয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় কুলিদের চীৎকার তার কানে গেল—সোনালী—সোনালী—

ষ্টেশন থেকে অমৃত ও লীলা যখন তাদের বাড়ীতে পৌছল, তখন ভোর হোয়ে গিয়েছে। ভুবন বাগানে পায়চারি কর্‌ছিল, লীলা গাড়ী থেকে তার মাকে দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেল্লে। সে বল্লে—মা তোমার এমন অসুখ করেছিল আমায় জানাও-নি কেন—

ভুবন হঠাৎ লীলা ও অমৃতকে দেখে একেবারে বিস্মিত হোয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়টাকে কোন রকমে চেপে সে উত্তর দিলে—অসুখ তেমন কিছু হয়-নি মা, শুধু তোকে দেখতে ইচ্ছা করেছিল বলে মিস্ রায়কে লিখেছিলুম। তা তুই অমৃতকে ডাকিয়ে চলে এসে বেশ করেছিস, আমি ভাবছিলুম কাকে পাঠাই!

অমৃত ততক্ষণে গাড়োয়ানকে বিদায় কোরে এসে ভুবনকে প্রণাম কোরে বল্লে—মাসীমা, তোমার সঙ্গে এবার আমার এমন ঝগড়া হবে যে, কিছুতেই আর মিট্‌মাট্‌ হবে না।

অমৃতর কাণ্ড দেখে ভুবন একটু হেসে বল্লে—কেন রে?

—কেন আবার? তোমার এত বড় অসুখ গেল আমায় একটুও জানাও-নি কেন?

ভুবন একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে—কৈ তেমন অসুখ তো কিছু করে-নি, আর তুই আমার ওপর যে রকম রাগ করেছিলি—

অমৃত রাগত-ভাবে বল্লে—রাগ করেছিলি—আর তুমি কিছু কর-নি না? যত সব ছোট লোকের বাস হয়েছে—

অমৃত বিরাজকে গাল দিতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভুবন বল্লে—যাক্‌গে বাবা, ও-সব কথা আর তুলিস্‌ নি।

ভুবন চাকরকে ডেকে লীলার বাক্সটা ভেতরে নিয়ে যেতে বলে এক হাতে লীলাকে আর এক হাতে অমৃতকে ধরে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেল।

৯

লীলার সে বছর পরীক্ষা দেওয়া হোলো না। মাসখানেক সোনালীতে থাকার পর তাদের স্কুল থেকে খবর এল যে, এ-বছর সেখান থেকে তার পরীক্ষা দেওয়া হবে না। স্কুলে চিঠি লিখে সে জানলে যে, পরীক্ষার আগেই একসঙ্গে অত দিন কামাই করেছে বলে তাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হোলো না। ভুবন কিন্তু লীলার পরীক্ষা দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বিকার হোয়ে রইলো। পরীক্ষা দিতে পারবে না জেনে, লীলা যখন কেঁদে-কেটে, না খেয়ে অনর্থ বাধিয়ে তুল্লে, তখন ভুবন একদিন তাকে ধীরভাবে বল্লে—পরীক্ষা যদি নাই দিতে দেয় তবে তার কি করা যেতে পারে, আর না দিলেই বা কি আস্বে যাবে? তোমার তো আর খেটে খেতে হবে না।

পড়াশুনার উৎসাহে হঠাৎ চারিদিক থেকে এই রকম অপ্রত্যাশিত বাধা পেয়ে লীলার মনটা একেবারে মুষড়ে গেল। কোথা দিয়ে যে কি হোয়ে গেল তা সে বুঝতেই পারলে না। মিস্ রায় যখন তাকে বোর্ডিং থেকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন, তখন তিনি ঘুণাক্ষরেও তাকে জানান্ নি যে, পরীক্ষার সময় কামাই করলে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না। সমস্ত ব্যাপারটা তার ধাঁধার মতন ঠেক্‌তে লাগ্‌ল। মাস দুই তিন কোন রকমে সোনালীতে চুপচাপ বসে থেকে বড়দিনের পর স্কুল খোলা-মাত্র আবার সেখানে যাবার জন্য লীলা মিস্ রায়কে চিঠি লিখে দিলে। এই চিঠির উত্তরে তিনি তাকে জানিয়ে দিলেন যে, স্থানাভাবের জন্য তাঁরা তাকে বোর্ডিংয়ে রাখ্‌তে পারবেন না।

লীলা তাদের স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে ক্রমেই আশ্চর্য্য হচ্ছিল, মিস্

রায়ের এই শেষ চিঠি পেয়ে তার ধৈর্য্য সীমা ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু পরীক্ষা দেবার জন্য তার জেদ চড়ে গিয়েছিল, সে কলকাতায় এক মেমদের স্কুলে দরখাস্ত কোরে দিলে। সেখানে তারা তাকে নিতে রাজি হওয়ায় ভুবনের এক রকম অনিচ্ছা সত্ত্বেও লীলা অমৃতর সঙ্গে কলকাতায় চলে গিয়ে সেই স্কুলে ভর্ত্তি হোয়ে পড়্‌ল।

ইংরেজ মেয়েদের স্কুলে নতুন আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে লীলা প্রথমটা একটু অসুবিধায় পড়্‌ল বটে, কিন্তু মাস-কয়েকের মধ্যেই সে তাদের ভাষা ও তাদের আচারগুলোর সঙ্গে নিজের বেশ পরিচয় কোরে নিলে।

নতুন স্কুলে এসে লীলার অনেক বিষয় সুবিধা হোলো। প্রথম, সেখানে পড়াশুনা আগের স্কুলের চেয়ে ভালো হয়, আর পড়াশুনা ছাড়া পৃথিবীর আরও অনেক দরকারী জিনিষ আছে যা সেখানে শেখানো হয় না অথচ এখানে শেখানো হয়। ছেলেবেলা থেকে এই স্কুলে পড়বার সুযোগ হয়-নি বলে লীলার মধ্যে মধ্যে আপশোষ হোতো।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা বছর কেটে গেল। লীলা পরীক্ষা দিয়ে দিন কয়েক হোলো সোনালীতে ফিরে এসেছে। লীলা আসার পর ভুবন একবার অসুখে পড়েছিল, দিনকয়েক ভুগে সবে সে একটু সুস্থ হয়েছে, এম্‌নি সময় একদিন লীলা তাদের বসবার ঘরখানা পরিষ্কার করছিল। এক খানা বড় মেহগনি কাঠের টেবিলের এক কোনে একতাড়া চিঠি জড়ো করা পড়েছিল, লীলা সেগুলো থেকে বেছে দরকারী চিঠি রেখে বাকীগুলো নষ্ট কোরে ফেল্‌ছিল। ব্যাঙ্কের চিঠি, তাদের এর্টর্ণীর চিঠি, লীলার নিজের হাতের লেখা চিঠি, এই সব নানা রকম চিঠি গুছিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে হঠাৎ মিস্‌ রায়ের হাতের লেখা একখানা খাম তার চোখে পড়্‌ল। খামখানার ওপরে তার মার নাম লেখা ছিল। বোর্ডিংয়ে না নেওয়ার জন্য মিস্‌ রায়ের ওপর তার বিষম রাগ ছিল। হাতের লেখা দেখেই সে খামের

ভেতর থেকে চিঠিগুলো টেনে বার কর্‌লে। খামের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন তারিখের তিন চার খানা চিঠি এক সঙ্গে মুড়ে রাখা হয়েছিল। লীলার কৌতুহল হওয়ায় সে চিঠিগুলো পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। প্রথম চিঠিতে মিস্‌ রায় তার মাকে লিখেছেন যে, তাঁরা বিশ্বস্তসূত্রে লীলার জন্মবৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছেন—এরূপ ক্ষেত্রে এ-রকম মেয়েদের বোর্ডিংয়ে রাখা তাঁদের স্কুলের নিয়মবিরুদ্ধ। দ্বিতীয় চিঠিতে তাকে কৌশলে সোনালীতে পাঠাবার বন্দোবস্তের কথা লেখা হয়েছে। তৃতীয় চিঠিটায় ই সমস্ত ব্যাপারই লেখা হয়েছে, তবে দুটো চিঠি পড়্‌লে তার জন্মের সমস্ত ইতিহাসটাই প্রায় জান্‌তে পারা যায়। চিঠিগুলো পড়্‌তে পড়্‌তে লীলার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। শেষ চিঠিখানা সম্পূর্ণ পড়া হবার আগেই তার হাত থেকে সেখানা খসে টবিলের ওপর পড়ে গেল। হঠাৎ তার চিন্তা করবার সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে গেল। অনেকক্ষণ বিহ্বলের মতন সেই স্তূপাকার চিঠি ও কাগজের সাম্‌নে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে তার জ্ঞান ফিরে এল। ক্রমে এই গত এক বৎসরের সমস্ত ঘটনা তার চোখের সাম্‌নে একে একে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কেন মিস্‌ রায় তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কেন তার মা তাকে আবার স্কুলে যেতে বারণ করেছিলেন, কেন সোনালীর কেউ তাদের বাড়ীতে আসে না, সেদিন মন্দিরের কয়েকজনের ব্যবহারে সে মনে মনে আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিল; আজ তাদের ব্যবহারের কারণটা তার চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হোয়ে ফুটে উঠ্‌ল। সে ভাবতে লাগ্‌ল, সোনালীর সবাই, তাদের দলের সবাই, জগৎশুদ্ধ সবাই তার এই ঘৃণিত জন্মবৃত্তান্ত জানে, একমাত্র সেই শুধু এতদিন জান্‌ত না! যন্ত্রণায় সে দু-হাতে বুক চেপে ধরে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করার পরও তার অন্তরের এই জ্বালা কম্‌ল না। চোখের জল মুছে আবার সে মিস্‌ রায়ের চিঠিগুলো পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

ঠিক সেই সময়ে ভুবন ঘরে ঢুকে লীলার হাতে চিঠি দেখেই থম্‌কে দাঁড়াল! লীলা চিঠিখানা মুখের সাম্‌নে থেকে সরিয়ে তীব্র আর্ত্তনাদের সুরে ডাক দিলে—মা!

ভুবন সে ডাক সহ্য কর্‌তে না পেরে চোরের মতন তার চোখের সাম্‌নে থেকে পালিয়ে চলে গেল।

সমস্ত দিন লীলা আর তার মার কাছে গেল না। সারাদিন অসাড় হোয়ে মেঝেয় ছড়ান নানা রকম জিনিষপত্রের মধ্যে সে চুপ্‌ কোরে শুয়ে পড়ে রইলো, তার উত্থানশক্তি ছিল না। দুই একবার দাসী খাবার জন্য ডাকৃতে এসেছিল, কিন্তু তার মুখের চেহারা দেখে সে আর কিছু না বলেই চলে গিয়েছিল। চুপ্‌ কোরে পড়ে পড়ে লীলা ভাবছিল, এই আমার মা, এই আমার বাবা! তার চেয়ে আমি যদি আমাদের ঐ দুঃখু চাকরের মেয়ে হতুম? দরিদ্রের মেয়ে ছেঁড়া কাপড় পরে পরের বাড়ীতে দাসীর কাজ কোরে দিনাতিপাত কর্‌তে হোতো, সেও এই জীবনের চেয়ে ঢের ভালো ছিল! এ কী লজ্জা, কী অপমান আমার জন্য তুলে রেখেছিলে পরমেশ্বর! এক একবার তার মনে হোতে লাগ্‌ল, পৃথিবীতে তার কেউ নাই, সে যেন কারো কেউ নয়। এক মুহূর্ত্তে তার সমস্ত আশা, সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল,—জীবনের সমস্ত বন্ধন এক মুহূর্ত্তে আল্‌গা হোয়ে গেল।

সমস্ত রাত্রিও সে সেই রকম কোরে পড়ে থেকে সকালে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে পড়্‌ল।

ভুবন লীলার হাতে সেই চিঠি দেখে ও তার ডাক শুনে সেই বিছানায় গিয়ে শুয়েছিল আর ওঠে-নি। তারও উত্থানশক্তি রহিত হোয়ে গিয়েছিল। লীলা একবার বাইরের থেকে উঁকি দিয়ে দেখলে যে, তার মা স্থির হোয়ে বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে। একবার সে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তে গিয়ে আবার পিছিয়ে এল। সেদিনও লীলা ভুবনের সাম্‌নে যেতে পারলে না।

দুদিন ধরে মা ও মেয়ে একজন আর একজনের সামনে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। তাদের বাড়ীতে লোকজন কেউ আস্‌ত না, এমনিতেই বাড়ী তাদের নিস্তব্ধ ছিল, তার ওপরে ধূমকেতুর মতন হঠাৎ কোথা থেকে এই চিঠিখানার আবির্ভাব হওয়াতে সেখানকার নিস্তব্ধটা যেন আরও জমাট বেঁধে উঠ্‌ল!

সূর্য্য তখনও অস্ত যায়-নি। দূরে হাতীবসা পাহাড়ের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে সে একবার পৃথিবীর দিকে শেষ চাওয়া চেয়ে নিচ্ছিল। ভুবন তাদের বাগানে একটা আরাম চেয়ারে বসে দৃষ্টিহীন-নেত্রে হাতীবসার দিকে মুখ কোরে বসেছিল। ক্রমে সূর্য্য পাহাড়ের পেছনে সরে গেল। পাহাড়টা যেন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে একখানা কালো যবনিকার মতন আকাশের গায়ে ঝুল্‌তে থাক্‌ল। ভুবন পাহাড়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল বটে, কিন্তু তার মন বহুদিন-বিস্মৃত অতীত-জীবনের আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। বিক্ষুব্ধ সাগরের মত তার মন এই তিন চার দিন ধরে খালি তোলপাড় হয়েছে, আজ তার ক্লান্তি এসেছে, একটু অবসাদও এসেছে। হাতীবসা পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে সে তার সমস্ত জীবনটাকে মনে মনে আলোচনা কর্‌ছিল। নিজের জীবনের এ-রকম আলোচনা ইতিপূর্ব্বে সে কখনো করে-নি, করবার অবসরও কখনো হয়-নি। ছেলেবেলার কথা—সেই খেলাধূলা, চেঁচামেচি, ভাবনাবিহীন দিনগুলো! সকাল বেলা উঠেই খেয়ে দেয়ে পুতুল-খেলা কিংবা বাগানে দৌড়নো, তার পরে পুকুরে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে স্নান। মার কাছে বকুনি আর বাবার কাছে আব্দার। সমস্ত দিন ছুটোপাটি, দিন শেষে বিছানায় এসে পড়া আর ঘুম! আজকে কোথায় তার সেই সন্তান-বৎসল পিতা, আর কোথায় সেই মা! তাঁরা কি বেঁচে আছেন? যদি বেঁচে থাকেন, তবে তাঁরা এখন কোথায় আছেন কি অবস্থায় তাঁদের দিন কাট্‌ছে—সে কিছুই জানে না। বাবা মার কথা

মনে হোতেই তার চোখ জলে ভরে উঠ্‌ল, হাতীবসা পাহাড়, সূর্য্য, আকাশ সব চোখের জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভুবন চোখ বুঁজিয়ে ফেল্‌তেই কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝর্‌ ঝর্‌ কোরে তার বুকের ওপর ঝরে পড়্‌ল। তার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল সেই দিনের কথা—সেদিন তাদের বাড়ীতে সকাল থেকেই কি আনন্দ, কি উৎসবের ঘটা পড়ে গিয়েছিল! সেদিনকার সানাইয়ে যে সাহানা বেজেছিল, অতি ক্ষীণ সুরে তারই এক একটা তান যেন বাতাসে ভেসে ভেসে তার কানে এসে লাগ্‌তে লাগ্‌ল। সে ভাবতে লাগ্‌ল—গোধূলি-লগ্নে লাল চেলি-পরা সেদিনকার আমাতে আর আজকের আমাতে কত প্রভেদ! তার পর যেদিন প্রেমের দেবতা আকাশে নতুন রং ফলিয়ে, বাতাসে আবেশ ও শিহরণের মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। স্বপ্ন-সাগরের ঢেউ লেগে প্রথম যেদিন তার বুকের মধ্যে নাচন সুরু হয়েছিল—!!!—কত শীগ্‌গীর সেই দিনগুলা কেটে গেল। তার পর বজ্রপাতের মতন সেই নিদারুণ সংবাদ!—তার স্বামীর পলায়নের সংবাদ তারা যখন জান্‌তে পার্‌লে! সেদিন তার পৃথিবীর ওপরে ঘৃণা হোয়ে গিয়েছিল। পুরুষ জাতটাকে অতি অপদার্থ বলে মনে হয়েছিল। সেই সংবাদ জান্‌তে পারা-মাত্র তার মা নিজের কপালে করাঘাত কোরে কেমন কোরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন, তার চোখের সাম্‌নে সেই ছবিখানা জলজ্বল কোরে ফুটে উঠ্‌ল। স্বামীর কথা জান্‌তে পেরে সে যত না আকুল হয়েছিল তার মা তার চেয়েও কত বেশী আকুল হয়েছিলেন! মা না হোলে মেয়ের ব্যথা কি কেউ বুঝতে পারে? সেই মাকে সে আজ কতদিন দেখে-নি। একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে ভুবনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—মাঁ—মা।

তার পর যেদিন সে এই মায়ের স্নেহ, পিতার আদর সব তুচ্ছ কোরে সুবোধের সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিল—সেদিনকার কথাও তার মনে

পড়্‌ল। সেদিনকার কথা তার মনে পড়্‌ছিল বটে, কিন্তু কিসের টানে সে যে অত বড় বড় বন্ধনগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছিল সেটা সে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল না। সুবোধের সঙ্গে চলে গেলে এই বন্ধনগুলো জন্মেরমতন কেটে ফেলতে হবে তা সেদিন সে বুঝতে পারে-নি। তার সঙ্গে চলে আসাটা ভাল হয়েছিল কি মন্দ হয়েছিল তার উত্তরও সে নিজের মন থেকে কিছুই পাচ্ছিল না।

ভুবনের আবার মনে হোতে লাগ্‌ল, সংসারের এত বড় বন্ধনগুলো ছিন্ন কোরে যার সঙ্গে সে চলে এসেছিল সে আজ কোথায়? মৃত্যু সাগরের ওপারে কি সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে? তার সঙ্গে কি আর দেখা হবে? আর কতদিন তাকে নিঃসঙ্গ জীবন বহন কোরে চল্‌তে হবে? সে একবার চোখ খুল্‌তেই দেখ্‌তে পেলে যে, লীলা একটু দূরেই একটা জুঁই-ঝাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে হাতীবসার মাথায় জমাট-বাঁধা অন্ধকারের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। লীলাকে দেখেই তার বর্ত্তমানের কথা মনে পড়ে গেল। ভুবনের মনে হোতে লাগ্‌ল, এর পূর্ব্বে তার মৃত্যুই ভাল ছিল। নিজের সন্তানের কাছে এই লজ্জা! এতদিন সে বাইরের লজ্জা থেকেই প্রাণপণে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নিজের ঘরেই যে সব থেকে বড় লজ্জা লুকিয়ে বসেছিল তার দিকে সে লক্ষ্যই করে-নি। মৃত্যু প্রাণের স্বজনকে দূরে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু স্বজনের কাছ থেকে দূরে না নিয়ে গিয়েও যে সে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে পারে ভুবন সেটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে লাগ্‌ল।

ভুবনের মাতৃহৃদয় তখনি আবার লীলার দুঃখে সহানুভূতিতে কানায় কানায় ভরে উঠ্‌ল। সে বেশ বুঝতে পারছিল যে, লীলার জন্মবৃত্তান্ত এমন ভাবে প্রকাশ হওয়ার পর তার আর এখানে বিয়ে হওয়া অসম্ভব।

তবে কি তার মৃত্যুর পর এই জনশূন্য বাড়ীতে লীলাকে তার চেয়েও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাতে হবে? আমার নিজের দিন তো প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে, কিন্তু হায় হায়, সে বেচারীকে যে এখনও অনেক কাল বাঁচতে হবে! লীলার সেই অবস্থাটা কল্পনা কোরে ভুবন অস্থির হোয়ে পড়্‌ল। সে আর একবার লীলার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে যে, সে তখনও সেই পাহাড়ের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে। ভুবনের বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। সে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কর্‌লে।

হঠাৎ কার দু-খানা হাত পেছন থেকে ভুবনের কাঁধের ওপর এসে পড়্‌ল। স্পর্শমাত্রেই ভুবন বুঝতে পারলে যে, সেই হাত-দুটোতে নিবিড় সহানুভূতি মাখান রয়েছে। মুখ থেকে কাপড়খানা সরিয়ে সে দেখ্‌লে যে, লীলা এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। লীলার স্পর্শ পাওয়া মাত্র তার কান্নার বেগ বেড়ে গিয়েছিল, সে লীলাকে টেনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লে—মা মা আমি বড় হতভাগী—

ভুবন আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু লীলা তার কথা থামিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠ্‌ল—কিছু শুনতে চাই না মা—আমায় কিছু বলতে হবে না—তুমি আমার মা, আশীর্ব্বাদ কর যেন চিরকাল তাই মনে রাখতে পারি—

লীলা ভুবনের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে। অনেকক্ষণ এই ভাবে পড়ে থেকে সে মুখ তুলে ভুবনকে চুমু খেয়ে বল্লে—আমাকে ক্ষমা কর মা—

অনুপমচন্দ্র ঘোষ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়্‌ত, তখন তার সমকক্ষ ছাত্র কলেজে একজনও ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতিবারেই সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করত, খেলাতে তার সঙ্গে কেউ পেরে উঠ্‌ত না, চেহারায় তার জোড়া বোধ হয় সমস্ত সহর ঢুঁড়লেও পাওয়া যেত না। এই অনুপম তার অগাধ সম্পত্তিশালী পিতার একমাত্র সন্তান ছিল। ইন্দ্রের মতন বিলাসী, কন্দর্পের মতন সুন্দর, আকাশের মতন উদার ও পশুর মত স্বাস্থ্যবান এই অনুপম অজাত-শত্রু ছিল। প্রথম বার্ষিক শ্রেণী থেকেই যোগেশচন্দ্র সেন নামে একটি যুবকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বেশ পাকা রকমের গেঁথে উঠেছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমুদ্র অবাধে পার হোয়ে এসেই অনুপম এক জমিদারের রূপসী মেয়েকে বিয়ে কোরে সংসারী হোলো।

"রূপেয়া মে রূপেয়া খিঁচ্‌তা" প্রবাদটা অনুপমের জীবনে বড় সুন্দর ভাবে খেটে গিয়েছিল, কারণ তার বিয়ের কিছুদিন পরেই তার শ্বশুরের একমাত্র ছেলেটী মারা যাওয়াতে শ্বশুরের বিষয়টাও তার হাতে এসে পড়্‌ল। এমন অনুপমের বন্ধুত্ব লাভ করা বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সংসার সমুদ্রের তুফানের মধ্যে পড়ে যোগেশ যখন কূল-কিনারা হারিয়ে ডুবুডুবু হয়েছিলেন, ব্রাহ্ম হওয়ায় পিতার বিষয় থেকে বঞ্চিত হোয়ে যখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডময় সর্ষের ক্ষেত দেখছিলেন, তখন একমাত্র অনুপমই তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। পিতৃগৃহ থেকে তাড়িত হোয়ে যোগেশ ও তাঁর স্ত্রী বিরাজমোহিনী অনুপমের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। অনুপম তখন নিজের বিষয়ের মালিক। যদিও সে নিজে

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করে-নি, তবুও কোন ধর্ম্ম বা সমাজের প্রতি তার ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ ছিল না।

অনুপম নিজের স্ত্রী সরলাকেও তার মনের মতন কোরে গড়ে নিয়েছিল। অনেকদিন এক সঙ্গে থাকার ফলে যোগেশ ও অনুপমের পরিবারের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর সময় যোগেশ অনুপমকে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের অভিভাবক কোরে দিয়ে গিয়েছিলেন, আর সেও যতদিন জীবিত ছিল ততদিন যোগেশের পরিবারকে নিজের পরিবারের মতনই দেখেছে।

যোগেশের মৃত্যুর চার পাঁচ বছর পরেই অনুপমের স্ত্রী সরলা একটী মৃত-বৎস প্রসব কোরে সূতিকা ঘরেই মারা যায়। স্ত্রীর মৃত্যুতে বিদ্বান, বুদ্ধিমান অনুপম শোকে একেবারে পাগলের মতন হোয়ে গেল। শোক সাম্‌লে ওঠবার আগেই সাংঘাতিক রোগে সে শয্যাশায়ী হোয়ে পড়ল। জীবনের আশা তার ছিলই না, অনেক কষ্টে প্রায় ছ-মাস বিছানায় পড়ে থেকে তার রোগ সারল বটে, কিন্তু তার অটুট স্বাস্থ্য, অনুপম সৌন্দর্য্য সেই রোগশয্যায় রেখে আস্‌তে হোলো।

রোগ থেকে সেরে ওঠবার কিছুদিন পরেই অনুপম তার এক এটর্ণী বন্ধুর কাছে বিষয়-সম্পত্তি বন্দোবস্তের ভার দিয়ে তার একমাত্র সন্তান শিশু অরুণকে নিয়ে দেশ ভ্রমণ কর্‌তে বেরিয়ে পড়্‌ল। অরুণ বেচারী বুঝতেই পারলে না যে, তার জীবনের অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংসারে কত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল।

বছরখানেক ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে অনুপমের ইউরোপ দেখবার সখ হোলো। সে একদিন অরুণকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে উঠে পড়্‌ল। বিরাজমোহিনী তাঁর কাছে অরুণকে রেখে যাবার জন্য অনেক বলেছিলেন, কিন্তু অনুপম তার ছেলেকে ছাড়্‌তে পারে-নি। তার

ইচ্ছা ছিল যে, সে দেশে ফেরবার সময় অরুণকে সেখানকার কোন বোর্ডিংয়ে রেখে আস্‌বে।

ইউরোপ ঘুরে অনুপম ইংলণ্ডে এসে পৌঁছল। দেশ থেকে আস্‌বার সময় সে জনকয়েক ইংরেজের কাছ থেকে কতকগুলো পরিচয়-পত্র এনেছিল। ইংলণ্ডে পৌঁছিয়েই সে তাদের সঙ্গে দেখা কোরে অরুণকে এক বোর্ডিংয়ে রেখে দিয়ে দেশে ফেরবার মতলোব কর্‌ছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হোয়ে সে অজানা দেশে চলে গেল। সাত বৎসর বয়সের অরুণ পিতৃমাতৃহীন হোয়ে আত্মীয়স্বজন-বিরহিত সুদূর ইংলণ্ডে মানুষ হোতে লাগ্‌ল। ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে রইলো শুধু তার বাবার সেই এটর্ণী বন্ধু—যেখান থেকে মাসে মাসে তার নামে টাকা যেত।

১১

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর দেখা গেল যে, লীলা মেয়েদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু লীলা আর পড়্‌তে গেল না। ভুবন তাকে কলেজে পড়বার কথা অনেকবার বলেছিল বটে, কিন্তু সে আর কলকাতায় যেতে রাজী হয়-নি। লীলার কলকাতায় পড়্‌তে না যাবার অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রথম কথা—ভুবনের শরীরের অবস্থা দিনে দিনে যে-রকম খারাপ হোয়ে পড়্‌ছে, তাতে তার যত্ন নেবার জন্ম সর্ব্বদা বাড়ীতে একজন লোক থাকা চাই। অমৃত ভুবনকে যত্ন কিংবা সেবা করার কোন ত্রুটি করত না বটে, কিন্তু তার তো আর দিনরাত সেখানে থাকবার উপায় নাই! হয়তো কোনদিন মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে ভুবনকে টেনে নিয়ে যাবে, মরবার সময় একবার দেখতেও পাবে না এই ভয়ে লীলা তার মাকে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী হয়-নি। দ্বিতীয় কথা—লীলার আর কোন কাজে তেমন উৎসাহ ছিল না। সেদিনকার সেই চিঠিগুলো তার ধমনীতে এমন একটা অবসাদ ঢেলে দিয়ে গিয়েছে যে, আর কোন কিছুতেই সে উৎসাহ পাচ্ছিল না। জীবন-প্রভাতেই তার চোখের সাম্‌নে সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। প্রতিদিন প্রতি কাজের মধ্যেই তার নিজের জন্মকথাটা মনে পড়্‌ত, আর তারই লজ্জায় সে ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে থাক্‌ত, নিজের অস্তিত্বটা সে নিজের কাছেই লুকিয়ে ফেল্‌তে চেষ্টা করত। যে লজ্জা, যে অপমানের জ্বালায় সে নিজেই অস্থির হোয়ে বেড়াচ্ছে, সেই লজ্জার ডালি মাথায় নিয়ে কেমন কোরে সে আবার বন্ধু সমাজে দাঁড়াবে!—কোন মুখ নিয়ে? এতদিন কোন মুখে সে বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করেছে লীলা তাই ভেবে অবাক হোতো। সঙ্গিনীদের সামান্য

হাসি, বিদ্রূপগুলোরও আজ সে এক-একটা গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করতে লাগ্‌ল! কখনো কখনো সে তার বর্ত্তমান নিঃসঙ্গ অবস্থাটাকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলে মনে কর্‌ত।

লীলা বিকেল বেলা কোন দিন একলা, কোন দিন বা অমৃতর সঙ্গে বেড়াতে বেরুত। তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে, শালবনের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে যে লাল রাস্তাটা গ্রামের মধ্যে চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরে সে চলে যেত একেবারে গ্রাম অবধি; কোন দিন সে দেখ্‌তে পেত সুকুমার তাদের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—সুকুমারকে দেখেই সে লজ্জায় মরে যেত। তার মনে হোতো—সুকুমার জানে—সব জানে।

সুকুমারের সঙ্গে লীলার ছেলেবেলা থেকেই যে বন্ধন পাকা হোয়ে উঠ্‌ছিল বিরাজমোহিনী তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করার পর থেকে সে বন্ধন একেবারে ছিন্ন হোয়ে গেল। সুকুমারের ওপর তার মার কড়া হুকুম ছিল, যেন সে লীলার সঙ্গে কথা না বলে। শুধু যে বিরাজমোহিনী তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক রহিত করেছিলেন তা নয়, সেই ব্যাপার প্রকাশ হোয়ে পড়ার থেকে সোনালীর অধিকাংশ লোকেই বিরাজের অনুকরণ করেছিলেন। বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠান হোলে কেউ আর তাদের নিমন্ত্রণ কর্‌ত না, যে দুই একজন কর্‌ত লীলা লজ্জায় তাদের বাড়ী যেতে পার্‌ত না। লীলাদের বাড়ীর সামনেই একটা বৃক্ষ-লতাহীন উঁচু ঢিবি ছিল। সেখানকার লোকেরা সেটাকে পাহাড় বল্‌ত। লীলা মাঝে মাঝে এই পাহাড়টার চূড়োর ওপরে গিয়ে বসে থাক্‌ত। এইখানে বসে বসে সে নিজের জীবনের অতীত ও ভবিষ্যতের ভাবনায় বিভোর হোয়ে থাক্‌ত ও সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে আরও খানিকটা অন্ধকার বোঝাই কোরে ফিরে আস্‌ত।

লীলা কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছিল যে, সুকুমারদের বাড়ীতে আজকাল

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি লোক আসা-যাওয়া কর্‌ছে ; বিকেল বেলা বেড়াতে বেরুলেই কারো না কারো সাম্‌নে পড়ে যেতে হয়। লোকের সাম্‌নে পড়্‌লেই আজ্‌কাল সে কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত হোয়ে পড়্‌ত বলে বেড়ান ছেড়ে দিয়ে বিকেলে সে রোজ এই পাহাড়টাতে এসে বসতে আরম্ভ কোরে দিলে। পাহাড়টা দেখে লীলার কেন জানি মনে হোতো তার গায়ে গাছ লতা সবই ছিল, একদিন কোথা থেকে বিষাক্ত বাতাসের ঝড়, তার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়াতে সে সর্ব্বস্ব হারিয়ে এই রকম নিঃস্ব হোয়ে পড়েছে। সে পাহাড়টার অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থা মিলিয়ে দেখ্‌ত।

মিস্ রায়ের সেই চিঠিগুলো প্রকাশ হোয়ে পড়ার পর থেকে ভুবনের মনের মধ্যে যে আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল কিছুতেই সেটা শান্ত হোতে চাচ্ছিল না। মধ্যে মধ্যে ঝড়ের বেগ কমে আস্‌ত বটে, কিন্তু আসলে সেটা থেকেই গিয়েছিল। সেই সময় তার বুকের অসুখ বেড়েছিল এখনো তা কম পড়ে-নি। সেজন্য এখন অধিকাংশ সময়েই তাকে শুয়ে থাকৃতে হোতো। কোন কোন দিন একটু ভালো বোধ কর্‌লে সে আরাম কেদারা নিয়ে গিয়ে বাগানে বসে বসে বিকেল বেলাটা আনমনে হাতীবসা পাহাড়ের দিকে চেয়ে-চেয়ে কাটিয়ে দিত। কোন কোন দিন বসে থাকৃতে থাকৃতে সন্ধ্যে উৎরে যেত, লীলা এসে এতক্ষণ বাইরে বসে থাকার জন্য অনুযোগ কর্‌লে ধীরে ধীরে সেখান থেকে উঠে ঘরে এসে শুয়ে পড়্‌ত। সেই থেকে মায়ে মেয়েতে কথাবার্ত্তা খুবই কমে গিয়েছিল।

ভুবন এতদিন মনে মনে ভবিষ্যৎ জীবনের যে বিভীষিকাগুলো কল্পনা করেছে, একে একে, প্রায় সব-কটাই মূর্ত্তি ধরে এসে তাকে আঘাত করেছে। যে অবস্থার কল্পনাতেই তার অন্তর অস্থির হোয়ে মাথা খুঁড়্‌তে থাকৃত সেই অবস্থাকে কেমন শান্তভাবে গ্রহণ করেছে দেখে সে নিজেই বিস্ময় মান্‌ত, আর ভাবৃত, বুঝি দুঃখের ধারাই এই রকম। মনশ্চক্ষে দূরের দুঃখকে

যতটা ভীষণ, যতটা ভয়ানক বলে মনে হয়, কাছে এসে পড়্‌লে তার ভীষণতা অনেক পরিমাণে কমে যায়। বার বার তার জীবনের ওপর দিয়ে এর পরীক্ষা হোয়ে গেছে।

ভুবন আগে ভাব্‌ত যে, লীলার জন্ম-বৃত্তান্তটা বিরাজমোহিনীর কাছে প্রকাশ হোয়ে পড়্‌লে তাকে লজ্জা, অপমান ইত্যাদি আর যাই সহ্য কর্‌তে হোক্ না কেন, এজন্য তার মনের মধ্যে নিশিদিন ভয় ও উৎকণ্ঠার যে আগুন জ্বল্‌ছে তার জ্বালা থেকে সে পরিত্রাণ পাবে ; কিন্তু সে এইখানে ভুল করেছিল। এই ব্যাপার প্রকাশ হোয়ে পড়ায় বিরাজের ভয় থেকে তার মন মুক্ত হোলো বটে, কিন্তু সে জায়গায় আর একটা চিন্তা এমনভাবে তার মনকে পীড়ন কর্‌তে আরম্ভ করলে, যার জ্বালা আগেকার চিন্তার জ্বালা থেকে কিছুমাত্র কম নয়। ভুবন স্থির জেনেছিল যে, লীলাকে এর পরে আর সে পাত্রস্থ কর্‌তে পার্‌বে না। এইখানে এই বাড়ীতে তার চেয়েও নিঃসঙ্গ অবস্থায় লীলাকে কাটাতে হবে। কত দিক থেকে যে কত রকম বিপদ এসে তার জীবনকে দুর্ব্বিসহ কোরে তুল্‌তে পারে তার ঠিকানা নাই। ভুবন লীলার ভবিষ্যৎ জীবনের এক একটা ছবি কল্পনা কর্‌ত আর ভাব্‌ত—আমি মরবার আগেই যদি তার মৃত্যু হয় তো সে বেঁচে যায়। এই চিন্তার হাত থেকে তার আর উদ্ধার ছিল না। মৃত্যুকেও সে ভয় কর্‌ত, কারণ তার মৃত্যু হোলে লীলাকে দেখবে কে? মধ্যে মধ্যে সে নিজের মনকে চোখ ঠেরে সবই ভগবানের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা কর্‌ত, কিন্তু দুঃখ পেয়ে পেয়ে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাসও তার শিথিল হোয়ে এসেছিল। বিকেল বেলা আরাম কেদারায় লম্বা হোয়ে শুয়ে-শুয়ে সে ভাব্‌তে থাকৃত, শৈশবে যে দেবতা তাকে বাপ মায়ের কোলে সুখের দোলায় শুইয়ে দোল দিয়েছিল, যৌবনে যে দেবতা তাকে স্বামী সুখ দিয়েছিল, জীবন প্রেমে পূর্ণ কোরে দিয়েছিল, আবার

বিনা দোষে তাকে স্বামীর প্রেম থেকে বঞ্চিত করেছিল। কখনও সুখের চরম শিখরে, কখনও দুঃখের গভীর গহ্বরে, এমনি কোরে জীবনপথে অগ্রসর হোতে হোতে আজ সে মৃত্যুর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—কে তাকে হাত ধরে এই কান্না-হাসির পথ দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে! একি একই দেবতার খেলা? না সুখের দেবতা আর দুঃখের দেবতা এক নয়, মানুষের জীবনটাকে দুই দেবতায় মিলে লোফালুফি করছে? কে জানে!

১২

অরুণ সাবালক হওয়ায় তাকে নিজের বিষয় বুঝে নিতে ভারতবর্ষে ফিরে আস্‌তে হোলো। বিলেতে স্কুল ও কলেজের পড়া শেষ কোরে সে ডাক্তারী পড়্‌ছিল। সে সাবালক হোতেই তার বাবার বন্ধু সেই এটর্ণী তাকে দেশে এসে তার বিষয় বুঝে নিতে বলেছিলেন ; কিন্তু পড়্‌তে পড়্‌তে চলে এলে অনেক দিন বৃথা নষ্ট হবে মনে কোরে সে আস্‌তে চায়-নি, কিন্তু তার বাবার বন্ধু তাকে জানালেন যে, তাঁর শরীরের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, এই বেলা এসে বিষয় বুঝে না নিলে ভবিষ্যতে সে জন্য তাকে পস্তাতে হোতে পারে। এই চিঠি পাওয়ার পর আর চুপ্‌ কোরে থাকা চলে না, কাজেই পুরো ডাক্তার হোয়ে বেরুবার দু-বছর, আগেই তাকে বছর-খানেকের জন্য পড়াশুনা বন্ধ কোরে দেশে ফির্‌তে হোলো।

শীতের এক কুয়াশা-ঢাকা সকালে তাদের জাহাজখানা কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে এসে লাগ্‌ল। অরুণ যখন নিজের মাতৃভুমিতে বিদেশীর মত এসে দাঁড়াল, তখন গোটাকতক ইংরেজী হোটেলের দেশী দালাল ছাড়া তাকে অভ্যর্থনা করবার আর কেউ ছিল না। জাহাজ থেকে নেমে প্রথমেই তার এই কথাটা মনে হোলো। হোটেলের দালালেরা যখন তার কানের পাশে মাদ্রাজী-ইংরেজীতে নানারকম অব্যক্ত কলরব করছিল; তখন তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠছিল, বহুদিনের পুরোনো একখানা ছবি। ষোলো সতেরো বছর আগে এম্‌নি একটা দিনে তার বাবার হাত ধরে সে জাহাজে উঠেছিল। তখন সে কতটুকু! সেদিনকার স্মৃতি অধিকাংশই তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। তার মনে হোতে লাগ্‌ল আজকে কোথায় তার বাবা, কোথায় তার মা। মাতৃভুমিতে আজ সে

নিতান্ত অপরিচিতের মতন এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌ল। রুমালে চোখের জল মুছে ফেলে অরুণ দেখ্‌লে তার আশে-পাশে যে-সব জিনিষ ছড়ান ছিল তার একটাও নাই, শুধু তার বড় ট্রাঙ্কটা দুটো মুটেতে মিলে টানাটানি করছে। মুটেকে প্রশ্ন করা মাত্র একজন মদ্রদেশীয় লোক অগ্রসর হোয়ে এসে অতি ভদ্রভাবে সেলাম জানিয়ে তাকে যা বল্লে তার তাৎপর্য্য এই—তার জিনিষপত্র একটা গাড়ীতে তোলা হয়েছে, এখন সাহেব দয়া কোরে গাড়ীতে চড়্‌লেই হয়।

কলকাতায় এসে বিষয় বুঝে নেবার জন্য তাকে কয়েকদিন ধরে এটর্ণীর বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি কোরে বেড়াতে হোলো। সেখানকার কাজ সারা হোয়ে গেলেঃ সে সোনালীতে বিরাজমোহিনী ও তার ছেলেবেলাকার বন্ধু সুকুমারের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বিলেতে এখন ফিরে গেলেও কোন কাজের হবে না, কারণ পরীক্ষার জন্য এখনো তাঁকে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। তাই সে ঠিক করলে, মাসকয়েক সুকুমারের বাড়ীতে কাটিয়ে যাবে। অরুণ দেশে আসছে শুনে বিরাজ তাকে জানিয়েছিলেন যেন সে একেবারে সোনালীতে চলে আসে, কিন্তু বিষয়ের একটা পাকা বন্দোবস্ত কোরে নেবার জন্য বাধ্য হোয়ে তাকে প্রায় চার মাস কলকাতায় কাটিয়ে যেতে হোলো।

অরুণ সোনালীতে এসে পৌছন মাত্র সোনালীময় একটা সাড়া পড়ে গেল। বাঙালীর ছেলে বাংলা কথা বলতে পারে না, যা দুই একটা বলে তা আবার কেমন মজার শুন্‌তে হয়। ইংরেজদের মত রং, তাদের মত কটা-কটা চুল—অরুণকে দেখ্‌তে রোজই বিরাজমোহিনীর বাড়ীতে সোনালীর যত লোকের ভিড় এসে জমতে লাগ্‌ল। অরুণ একে সুন্দর তায় ধনবান। অনেক বিবাহযোগ্যা বিদুষীর জননীরাও অরুণকে দেখ্‌তে আস্‌তেন।

ছেলেবেলা থেকে বিদেশে থেকে সেখানকার চালচলনে অভ্যস্ত হোয়ে অরুণ দেশী হালচাল, এমন কি দেশী বুলি পর্য্যন্ত এক রকম ভুলে গিয়েছিল। বাঙালীর ছেলে বাংলা পড়্‌তে জানে না, বাংলা বল্‌তে পারে না, এটা এক শ্রেণীর বাঙালীর কাছে খুব প্রশংসার বিষয় হোলেও অরুণের কাছে সেটা বড্ড বিশ্রী ঠেক্‌তে লাগ্‌ল। কলকাতায় ইংরেজদের হোটেলে প্রথমটা তার কোন অসুবিধা হয়-নি, কিন্তু সে তার এই দীনতা বুঝতে পারলে সোনালীতে বিরাজমোহিনীর কাছে এসে। অরুণ মনে করেছিল, সুকুমারের সঙ্গে কিছুদিন ঘুরলেই অন্ততঃ বাংলা কথা বলাটা তার বেশ সড়গড় হোয়ে যাবে, কিন্তু সেখানে উল্টো বিপত্তি হোলো। অরুণ চায় সুকুমারের কাছ থেকে বাংলা ভাষা শিখ্‌তে, আর সুকুমার চায় তার কাছ থেকে ইংরেজী বলবার কায়দাটা ভালো কোরে শিখে নিতে।

বিলেতে যারা ইংরেজী কথা বলা ভালো কোরে শিখ্‌তে চায়, তারা প্রথমে ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে। সোনালীতে বিরাজমোহিনী তার সঙ্গে কয়েকজন শিক্ষিতা ব্রাহ্ম-মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে দেখ্‌লে, যে, তাদের মধ্যে শিক্ষা, সহবৎ, ভব্যতা সব গুণই আছে বটে, কিন্তু আলাপ কর্‌তে কেউ জানে না। অরুণ বড় মুস্কিলেই পড়্‌ল।

অরুণ সাঁওতাল-পল্লীতে ঘুরে ঘুরে তাদের জীবনযাত্রা দেখে বেড়াতে আরম্ভ কর্‌লে। ইংলণ্ডে সে চিরদিনই বড় বড় প্রাসাদ আর বিলাসের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছে। এই সকল সরল সাঁওতালদের অনাড়ম্বর জীবনের সঙ্গে সে বিলেতের বিলাসীদের তুলনা কর্‌ত। এম্‌নিতেই সে একটু ভাবপ্রবণ ছিল। সোনালীর উন্মুক্ত মাঠ, চারিদিকের ছোট-বড় পাহাড়, পাহাড়ে-নদী তার কল্পনার খোরাক জুগিয়ে তাকে আরও ভাবপ্রবণ কোরে তুল্লে।

মধ্যে মধ্যে সে লীলাদের বাড়ীর ধার দিয়ে বেড়াতে যেত। রাস্তা

দিয়ে যেতে যেতে সে প্রায়ই দেখ্‌তে পেত যে, লীলা তাদের বাগানে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে আনমনে চেয়ে আছে—যেন বিষাদের একখানা জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। লীলাকে দেখে তার মনে আপনা থেকেই কেমন জানি একটু সহানুভূতি জেগে উঠ্‌ত। তার মনে হোতো, ঐ মেয়েটিরও বোধ হয় পৃথিবীতে কেউ নাই, সে-ও বোধ হয় তারই মতন। লীলার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য তার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করত। পাছে সুকুমারী কিছু মনে করে সেজন্য এই মেয়েটীর সম্বন্ধে তাকে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারত না। অরুণ দেখ্‌ত যে, বিরাজ এত লোক সম্বন্ধে আলোচনা করেন, কিন্তু এই বাড়ী সম্বন্ধে তিনি কখনো কোন কথা উচ্চারণ করেন না। সে মনে মনে আশ্চর্য্য হোয়ে যেত।

অরুণ ক্রমেই লীলার দিকে একটু বেশী রকমের আকৃষ্ট হোয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে বুঝতে পারছিল যে, কি একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে লীলার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। এখানে এসে সে ঠিক করেছিল যে, বিরাজমোহিনীর কাছে মাসখানেক থেকে বাকী কটা মাস ভারতবর্ষের চারদিকে একটু ঘুরে দেখ্‌বে। কিন্তু সোনালী ছেড়ে যেতে তার মন কিছুতেই চাইছিল না। বিরাজমোহিনীও তাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলতেন না। তিনি তখন সুকুমারকে অরুণের সঙ্গে বিলেতে পাঠাবার বন্দোবস্তে ব্যস্ত ছিলেন।

অরুণ ভাব্‌ত, কে এই অপরিচিতা, যে দিনে দিনে তাকে এম্‌নি-কোরে তার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে! কিসের দুঃখ ওর? কি বেদনা তার বুকে বাজে, একবার যদি সে অরুণকে জানায় তবে প্রাণপণে সে তার প্রতিকার করবার চেষ্টা করে। এক একদিন লীলাদের বাড়ীর ধার দিয়ে যেতে-যেতে অরুণের ইচ্ছা হোতো বাগানের দরজা দিয়ে ঢুকে তার সঙ্গে আলাপ করে, কিন্তু সভ্যতা ও সামাজিকতার নিষ্ঠুর বন্ধন

তার সেই ইচ্ছাকে দমন কোরে রাখ্‌ত। সে ধীরে ধীরে সাঁওতাল পল্লীর দিকে চলে যেত।

রাত্রিতে ঘুমুতে ঘুমুতে কোন কোন দিন তার ঘুম ভেঙে যেত। কোন দূরের সাঁওতাল-পল্লীতে তখনো তাদের আনন্দোৎসব শেষ হয়-নি। তাদের মজলিসের বাঁশীর আওয়াজ বাতাসে মিশে তখনো চারদিকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে—সেই বেদনার সুর শুন্‌তে শুন্‌তে অরুণ ভাব্‌ত, এ বুঝি বাঁশীর সুর নয়, এ বুঝি সেই মেয়েটীর বুক-ভরা বেদনার দীর্ঘশ্বাস—নৈশ নিস্তব্ধতার বুক চিরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আকাশের দিকে ছুটে চলেছে! বাঁশীর সুর শুন্‌তে শুন্‌তে তারও অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়্‌ত।

কদিন থেকে ভুবনের শরীরটা খারাপ হওয়ায় লীলা বিকেলে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ কোরে দিয়েছিল। বিকেলে সে নিজেদের বাগানেই ঘুরে বেড়াত। বাগান থেকে লীলা রোজই দেখ্‌তে পেত, অরুণ তাদের বাড়ীর ধার দিয়ে সেই বৃক্ষলতাশূন্য পাহাড়টার দিকে চলেছে। লীলা তাদের চাকর-বাকরদের কাছে অরুণের সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব অনেক কথাই শুনেছিল। অরুণকে প্রথম দিন দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল—এই সেই, যার আগমনে সোনালীতে এতখানি চঞ্চলতার সাড়া পড়ে গিয়েছে। সোনালীতে কে এল, না এল তার খবর সে রাখ্‌ত না বা রাখবার কোন আগ্রহও ছিল না। বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সে নিঃস্ব হোয়ে বসেছিল,-এই নিঃস্বতাই সে খুঁজ্‌ত। সোনালীতে এক অমৃতর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সে-ও তারই মতন, সে-ও কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখ্‌ত না। কিন্তু সম্পর্ক না থাকলেও এই নবাগত ছেলেটী তার উপস্থিতি সোনালীর চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, ইচ্ছা না থাক্‌লেও তাকে তার আসার কথা জান্‌তে হয়েছিল।

অরুণের উপস্থিতি শুধু যে লীলাকে জানতে হয়েছিল তা নয়, ইদানীং অরুণ আবার সেই বৃক্ষলতাহীন পাহাড়টাতে বেড়াতে আরম্ভ করায় লীলা মনে মনে তার ওপর একটু বিরক্তও হচ্ছিল। এই পাহাড়টার ওপরে প্রায়ই কেউ আস্ত না। পাহাড়টার ওপর খানিকটা সমতল জায়গা ছিল, লীলা বসবার জন্য তার খানিকটা পরিষ্কার কোরে নিয়েছিল। তাদের বাগান থেকে সে দেখ্তে পেত যে, অরুণ সেই জায়গাটাতে গিয়ে দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছে! কোন কোন দিন বাড়ী থেকে বেরুবার ইচ্ছা থাক্লেও সে অরুণের জন্য বেরুতে পার্ত না, বেরুতে গিয়েই সে দেখ্ত যে, অরুণ আগে থাক্তেই তার জায়গাটা দখল কোরে বসে আছে। লীলা মনে মনে ক্রমেই তার ওপর বিরক্ত হোয়ে উঠ্ছিল। সে ভাব্ছিল পরিচিত অপরিচিত সবাই মিলে তার জীবনটাকে এত বেশী অসহনীয় কোরে তুলেছে যে—

সেদিন লীলা বাগানের বেড়ার ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কোরে যখন দেখ্লে অরুণের যাবার সময় উৎরে গেল, তখন সে তার পরিচিত পাহাড়টায় যাবার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্ল। প্রিয়তম বন্ধুর সঙ্গে বহুদিন দেখা না হোলে লোকে যেমন কোরে তাকে দেখ্তে ছোটে, চল্তে চল্তে তার মনের মধ্যেও ঠিক সেই রকম একটা ভাবের উদয় হচ্ছিল। পাহাড়ে গিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে তার চির-পরিচিত স্থানটাতে গিয়ে একেবারে শুয়ে পড়ে দু-হাতে চারপাশের পাথরগুলোকে আঁকড়ে ধর্লে। অনেকক্ষণ এইভাবে পড়ে থেকে লীলা ধড়্মড়্ কোরে উঠে বস্ল, তার এই ছেলেমানুষী ব্যবহারে নিজের কাছেই সে লজ্জিত হোয়ে পড়্তে লাগ্ল।

তখনো সন্ধ্যে হোতে অনেকটা দেরী ছিল। দূরে শালবনের ঝিঁঝি পোকাগুলো তখনো সমস্বরে তান ধরে-নি। থেকে থেকে এখান-ওখান

থেকে দু-একটা গলা সেধে নিচ্ছিল মাত্র। পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছিল, দূরে মাঠের ধারের রাস্তা দিয়ে পালে পালে মহিষ ঘরে ফিরে চলেছে! মাঝে মাঝে এক-একটা মহিষের পিঠে এক-একটা ছোট ছেলে বসে রয়েছে —একেবারে মহিষের গায়ের রংয়ের সঙ্গে মিশিয়ে। তাদের হাতে একটা কোরে ছোট্ট লাঠি। অতটুকু লাঠির সাহায্যে ঐটুকু ছেলে অতবড় জানোয়ারের পালকে অবহেলায় তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে!

লীলা পাহাড়ে বসে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌ছিল। কি সব ছাই-ভস্ম ভাবনা, ভাবনার আদিও নেই অন্তও নেই! অনেকক্ষণ সেই রকম ভাবে বসে থেকে সে গান ধর্‌লে। এইখানে এলেই সে গান গাইতো। বোর্ডিংয়ে সে আলাদা ওস্তাদ রেখে গান শিখেছিল। সুকণ্ঠী বলে তার সেখানে ও সোনালীতে বেশ নাম-ডাকও ছিল। কিছুদিন থেকে সে বাড়ীতে আর গান গাইতো না। হারমোনিয়াম কিংবা পিয়ানো গাইতে ইদানীং তার আর ভালোই লাগ্‌ত না। লীলা গান বাজিয়ে ধর্‌লে—

আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে
দিবস গেলে করবো নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।
কখন বেলা শেষের ছায়ায় পাখীরা যায়
আপন কুলায় মাঝে
সন্ধ্যা-পূজার ঘণ্টা কখন বাজে
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন
ব্যথার পূজা হবে সমাপন॥
অনেক দিনের অনেক কথা ব্যাকুলতা বাঁধা বেদন ডোরে
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভরে;

যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্বলে একে একে তারা
আকাশ পানে ছুট্‌বে বাঁধনহারা,
অস্ত রবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন
ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥ *

গানের কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে লীলার গলা দিয়ে ঝলকে ঝলকে বেদনার ধারা উপ্‌চে পড়্‌ছিল। তার ব্যথার গান শুন্‌তে শুন্‌তে আকাশের চোখ যেন ভেরে আস্‌তে লাগ্‌ল ; ধীরে ধীরে পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকা পড়্‌ল।

একবার, দু-বার, তিনবার লীলা এই গানটা গাইলে, যেন গেয়ে গেয়ে তার কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছিল না। গান যখন থাম্‌ল, তখন অন্ধকার হোয়ে এসেছে। গানের রেশ্‌ তখনো তার চারিদিকে জম্‌ জম্‌ করছে, লীলা নিজের গানে নিজেই মুগ্ধ হোয়ে সেইখানে নির্জ্জীবের মত চুপ্‌ কোরে বসে রইলো। হঠাৎ তার চমক্‌ ভাঙিয়ে দিয়ে কে যেন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল— চমৎকার, চমৎকার—

সুকুমারদের বাড়ীতে সেদিন বিকেল বেলায় ও-পাড়া থেকে কয়েকটি মেয়ে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁদের আগ্রহে অরুণকে তাঁদের সঙ্গে টেনিস খেল্‌তে হয়েছিল বলে সেদিন বিকেলে আর তার বেড়াতে যাওয়া হোয়ে ওঠে-নি। খেলা যখন খুব জমে উঠেছে, ঠিক সেই সময় একটি মেয়ের পা মচ্‌কে যাওয়ায় খেলা বন্ধ হোয়ে গেল। মেয়েটীর পা ব্যাণ্ডেজ কোরে দিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবার পরও অনেকখানি বেলা আছে দেখে অরুণ তার নিত্য-নৈমিত্তিক পাহাড়-ভ্রমণটা সেরে নেবার জন্য বেরিয়ে পড়্‌ল।

অরুণ রোজ পাহাড়ে যেত, রোজ লীলাকে দেখ্‌তে পাবে বলে। এ বিষয়ে প্রায়ই তাকে নিরাশ হোতে হোতো না। হয় যাবার সময়, না হয় বাড়ী ফেরবার সময় সে দেখ্‌তে পেত, লীলা তার নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে

* রবীন্দ্রনাথ

দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন খেলার জন্য দেরী হোয়ে যাওয়াতে সে ঠিক সময়ে বেরুতে পারে-নি। পাহাড়ের কাছে এসেই সে দেখ্‌তে পেলে কে একজন মেয়ে ওপরে বসে রয়েছে। সুকুমারদের বাড়ীর কাছে এই বাড়ী ছাড়া আর কোন বাড়ী ছিল না, ও-পাড়ার কোন মেয়ে যে সন্ধ্যার সময় একলা পাহাড়ে বেড়াতে আস্‌বে না অরুণ তা বেশ ভালো কোরেই জান্‌ত। পাহাড়ের ওপর মেয়েটীকে দেখেই তার আর বুঝতে বাকী রইলো না—কে সে। সে লীলাকে একবার ভালো কোরে দেখ্‌বার জন্য তার সাম্‌নের দিক দিয়ে না উঠে একটু ঘুরে একেবারে পেছনের দিক দিয়ে সন্তর্পণে ওপরে গিয়ে উঠ্‌ল। পাহাড়ের ওপরে গিয়ে অরুণ শুন্‌তে পেলে, কার সুমধুর কণ্ঠস্বরে সেখানকার বাতাসটা একেবারে ভরপুর হোয়ে উঠেছে। লীলা তখন বিহ্বল হোয়ে গাইছিল

—কখন বেলা শেষের ছায়ায় পাখীরা যায়
আপন কুলায় মাঝে
সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা কখন বাজে—

হঠাৎ সাম্‌নে গিয়ে পড়্‌লে গান থেমে যাবে মনে কোরে সে একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে লীলার গান শুন্‌তে লাগ্‌ল। সোনালীতে এসে অবধি অরুণ অনেক মেয়ের গান শুনেছিল, কিন্তু লীলার গানের আওয়াজ শুনেই সে বুঝতে পার্‌লে যে. এর আগে কোন বাঙালী মেয়ের এমন কণ্ঠস্বর সে শোনে-নি। গানের কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে হোলে যেটুকু ভাষা-জ্ঞান থাকা দরকার, অরুণের তা ছিল না। তবুও তার. সুর শুনে সে বুঝতে পারছিল যে, এ ব্যথার সঙ্গীত। বেদনার সুরে এমন একটা মোহিনীশক্তি আছে যে, কথা না বুঝতে পারলেও এম্‌নিই হৃদয় ভারাক্রান্ত হোয়ে ওঠে। লীলার গান শুন্‌তে শুন্‌তে অরুণের মনও একটা অজানিত ব্যথায় ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। লীলার গলা কখনো পর্দায় পর্দায়

চড়্‌ছে, কখনো বা অতি মৃদু হোয়ে আস্‌ছে—এম্‌নি কর্‌তে-কর্‌তে হঠাৎ একবার তার কণ্ঠ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। গান যে থেমে গিয়েছে, মুগ্ধ অরুণ তা বুঝতেই পারে-নি, সে গানের সুরে এত মস্‌গুল হোয়ে গিয়েছিল। যখন সে বুঝতে পার্‌লে যে, গান শেষ হোয়ে গিয়েছে, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে আপনিই প্রশংসাধ্বনি বেরিয়ে পড়্‌ল—চমৎকার চমৎকার—

অরুণের মুখ দিয়ে যে প্রশংসাধ্বনি বেরিয়ে পড়েছিল তা খাঁটি ইংরেজী। এই নির্জ্জন স্থানে হঠাৎ ইংরেজী প্রশংসাধ্বনি শুনে লীলা ভয় পেয়ে ধড়্‌মড়্‌ কোরে তার জায়গাটা ছেড়ে উঠে পড়্‌ল। পেছনে চাইতেই অরুণ পাথরের পাশ থেকে আত্মপ্রকাশ কোরে লীলাকে নমস্কার কোরে বল্লে—আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জন কর্‌বেন, আমি ঐ পাথরখানার পেছনে দাঁড়িয়ে আপনার গান শুন্‌ছিলুম! আপনার সঙ্গীতে আমি মুগ্ধ হয়েছি—অপরিচিতের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বলা বাহুল্য কথাগুলো অরুণ ইংরেজীতেই বল্লে। হঠাৎ অরুণের এই রকম আবির্ভাব ও সম্ভাষণে লীলা বিব্রত হোয়ে পড়্‌ল। তার মনে হচ্ছিল—লোকটা আমায় আচ্ছা অশান্তিতে ফেল্লে তো!

ভদ্রতার খাতিরে লীলাকে অরুণের কথার জবাব দিতে হোলো। সে মাথা নীচু কোরে ইংরেজীতেই উত্তর দিলে—আমি গাইতে জানি না, শুধু চীৎকার কর্‌ছিলুম মাত্র। এই চীৎকার যদি কারো ভালো লাগে তা হোলে নিজেকে বিশেষ অনুগৃহীত মনে করি।

অরুণ বল্লে—বিলক্ষণ! যদি কিছু না মনে করেন তবে অনুগ্রহ কোরে আরও একটু চীৎকার করুন। দেখুন, আমি বাংলা গান অনেক শুনেছি বটে, কিন্তু এত সুন্দর গান কখনো শুনি-নি।

লীলা এর কি জবাব দেবে! সে চুপ্‌ কোরে বসে-বসে খালি ঘাম্‌তে লাগ্‌ল।

লীলাকে চুপ্ কোরে থাক্‌তে দেখে অরুণ আবার বল্লে—আপনি বাস্তবিকই বড় সুন্দর গাইতে পারেন!

এবার লীলা বল্লে—আপনি আমায় বড় বেশী প্রশংসা কর্‌ছেন; সোনালীতে আমার চেয়ে ঢের ভাল গাইতে পারে এমন মেয়ের অভাব নেই।

—অভাব হয়তো নেই, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের গান কখনো শুনি-নি। কিন্তু যাঁদের শুনেছি তাঁদের একজনও আপনার মত গাইতে পারেন না, তা আমি লিখে দিতে পারি!

অরুণের কথা শুনে লীলার একবার ইচ্ছা হোলো, সোনালীতে কার কার গান সে শুনেছে তা একবার জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সেটা ঠিক যুক্তি সঙ্গত হবে কি না তাই ভেবে চুপ্ কোরে রইলো।

লীলা অমৃতর কাছে শুনেছিল যে, অরুণ ভালো বাংলা বল্‌তে পারে না। অরুণের কথা শুনে সে ভাব্‌ছিল, ভালো বাংলা জানে না তাতে কি আসে যায়! বাঙালীর ছেলে বাঙালীর মেয়ের সঙ্গে খাম্‌কা ইংরেজীতে কথা বল্‌তে থাক্‌বে, সেটা সে সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিল না।

লীলাকে আবার চুপ্ কর্‌তে দেখে কথা বাড়বার জন্য অরুণ বল্লে—আপনি কি রোজই এখানে বেড়াতে আসেন?

লীলা এবার ইচ্ছা কোরে বাংলায় জবাব দিলে—আগে রোজই আস্‌তুম, কিন্তু মার অসুখের জন্য আজকাল আর রোজ আসা হোয়ে ওঠে-না।

লীলার মুখে হঠাৎ বাংলা কথা শুনে অরুণ একটু অপ্রস্তুত হোয়ে বল্লে—আমায় ক্ষমা কর্‌বেন, আমি নিজে বাঙালী হোলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ মাতৃভাষায় জ্ঞান আমার অত্যন্ত অল্প। এর জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং যৎপরোনাস্তি লজ্জিত। এখানে এসে প্রতিপদেই আমি সেই লজ্জা অনুভব কর্‌চি। কিন্তু কি কর্‌ব বলুন, এই দুর্ভাগ্যের জন্য আমার অদৃষ্ট যতটা দায়ী, আমি ততটা দায়ী নই।

অরুণের এই কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা করুণ সুর বেজে উঠল, যেটা লীলাকে একটু আঘাত দিলে। সে ভাবলে ত মিনিটের জন্য যার সঙ্গে আলাপ, তার অন্তরে ঘা দিয়ে আর কি হবে? সে একটু সহানুভূতির সুরে বল্লে—আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি অন্য রকম ভেবেছিলুম।

অরুণ বল্লে—কিন্তু আপনি তো ইংরেজী বেশ বলতে পারেন। বাঙালী মেয়েদের মুখে ইংরেজী শুনে আমার মনে হয় যে, তারা ইংরেজী কথা বলে বটে, কিন্তু বাংলা সুরে। আপনার উচ্চারণ ঠিক ইংরেজ মেয়েদের মতন।

লীলা বল্লে—আপনি ইংরেজদের মুখে কখনো বাংলা শুনেছেন কি?

অরুণ আশ্চর্য্য হোয়ে জিজ্ঞাসা করলে—না—কেন?

—তারা কি সুরে বাংলা বলে সেটা জানবার একটু সখ হচ্ছিল।

লীলার কথা শুনে অরুণ হো হো কোরে খানিকটা হেসে বল্লে—না সত্যি বলছি, আপনি পরিষ্কার ইংরেজী উচ্চারণ করেন।

লীলা বল্লে—হ্যাঁ, আমি কিছুদিন ইংরেজদের স্কুলে পড়েছিলুম, সেইখানে ইংরেজী উচ্চারণ ভালো কোরে শেখবার সুবিধে হয়েছিল। ও কিছু নয়, শুধু অভ্যাস মাত্র।

লীলার কথা শুনে অরুণ হঠাৎ উৎসাহিত হোয়ে বল্লে—ইংরেজদের স্কুলে পড়তেন! তবে নিশ্চয় ইংরেজী গান জানেন। দেখুন, আপনি বাংলা গান যা গাইলেন, তা খুব সুন্দর লাগল বটে, কিন্তু তার একটি বর্ণও আমি বুঝতে পারলুম না। বিলেত থেকে এসে অবধি আর ইংরেজী গান শুনি-নি, অনুগ্রহ কোরে একটা গান করুন না।

অরুণের কথা শুনে লীলা মনে মনে ভাবতে লাগল—বেশ আব্দার তো! চেনা নেই শোনা নেই, একে তো এই গায়ে পড়ে আলাপ করা, তার ওপরে আবার এই গান গাইতে অনুরোধ—এ সব কোন দেশী

কায়দা তাই ভেবে সে মনে মনে আশ্চর্য্যও কম হচ্ছিল না। অরুণের কথার কি জবাব দেবে তাও সে খুঁজে পাচ্ছিল না। মেমদের স্কুলে সে যা দু-একটা গান শিখেছিল তা আবার প্রেমের গান। এক ঘণ্টার আলাপ, এর কাছে একলা বসে প্রেমের গানই বা কি কোরে গাওয়া যায়! কিছু না বলতে পেরে লীলা বিব্রত হোয়ে উঠ্‌তে লাগল।

অরুণ আবার বল্লে—দয়া কোরে একটা গান।

লীলা বল্লে—কিন্তু সে গান আপনার কাছে গাইবার মতন নয়, আপনি সেখানে কত ভালো গান শুনেছেন—

—তা হোক তবু আপনি গান।

বসে বসে এই রকম কথা কাটাকাটি করার চেয়ে গান গাওয়াটাই সুবিধা মনে কোরে লীলা গান ধর্‌লে। গান গাইতে তাকে কোনও আপত্তি কর্‌তে দেখা যেত না। সে ভাব্‌লে একটা গান গেয়ে যদি এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তবে গেয়েই ফেলা যাক্। সে গাইলে—

You taught me how to love you
Now teach me to forget—

গান গেয়েই লীলা উঠে পড়্‌ল। সে বল্লে, আমি যাই, মার অসুখ তিনি আবার ভাব্‌বেন—

—চলুন আমিও যাই, আপনার বাড়ী এখান থেকে কতদূর?

লীলার বাড়ী যে সেখান থেকে কতদূরে তা অরুণের বেশ ভালো কোরেই জানা ছিল। তবুও কথা বাড়াবার জন্য সে এই প্রশ্ন কর্‌লে।

পাহাড়ের ওপর থেকে লীলাদের বাড়ী আর বাগানটা একখানা নক্সার মতন দেখাত। সে সেখান থেকে অরুণকে তাদের বাড়ীটা দেখিয়ে বল্লে—ঐ যে আমাদের বাড়ী, এখান থেকে বেশী দূর নয়।

পাহাড় থেকে নেমে অরুণ বল্লে—আপনি তা হোলে আমার প্রতিবেশী, আমি এই সুকুমারদের বাড়ীতে থাকি। আমার নাম অরুণ চন্দ্র ঘোষ। সুকুমারদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে নিশ্চয় ?

অরুণের ইচ্ছা করছিল, লীলাকে জিজ্ঞাসা করে আপনার নাম কি ? কিন্তু বার-কয়েক বলি-বলি কোরেও সে তার নাম জিজ্ঞাসা করতে পারলে না।

লীলা সন্ধ্যার আধা-আলো আধা-অন্ধকারের মধ্যে মাথা নেড়ে জানালে যে, সুকুমারদের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ পাশাপাশি চলার পর লীলা বল্লে—আপনার সঙ্গে আলাপ হোয়ে বড় সন্তুষ্ট হলুম। আমার নাম লীলা রায়—এই যে আমাদের দরজা, আচ্ছা—

অরুণ বল্লে—আপনার মার অসুখ বল্লেন না ? কাল বিকেলে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আপনাকে বোধ হয় খুব জ্বালাতন করছি—

লীলা বল্লে—কিছু না—আচ্ছা, নমস্কার !

পরদিন বিকেলে হোতে না হোতেই অরুণ লীলাদের বাড়ীতে এসে হাজির হোলো। লীলা ও ভুবন তখন তাদের বসবার ঘরে বসে গল্প করছিল। লীলা আগের দিন পাহাড় থেকে ফিরেই তার মার কাছে অরুণের গল্প করেছিল। অরুণের মতন যুবকের সঙ্গে লীলার আলাপ পরিচয় হয় তাতে ভুবনের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু লীলার কাছে তার কথা শুনেই ভুবনের একটা দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়েছিল। সে জান্‌ত যে, অরুণ বিরাজমোহিনীর কতটা অন্তরঙ্গ। অরুণের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় মেশামেশি করলে আবার হয়তো তাকে নতুন কোরে একটা আঘাত সহ্য করতে হবে। ইদানীং ভুবন বুঝতে পেরেছিল যে, তার মতন লোকের সঙ্গে যত কম পরিবার ও লোকের পরিচয় থাকে আর কারো পক্ষে হোক্‌ আর নাই হোক্‌, অন্ততঃ তার পক্ষে সেটা মঙ্গল। তারা একঘরে হওয়ার

পর সে বুঝতে পারলে যে, একঘরে হওয়ার অসুবিধা ও অসুখ যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু শান্তিও যথেষ্ট আছে। তাই লীলা পাহাড় থেকে ফিরে এসে অরুণের কথা বলা-মাত্রই ভুবনের মনে হয়েছিল যে, দু-দিন পরেই এই ঘটনার সম্পর্কে বিরাজের কাছ থেকে তাদের ওপর হয়তো এমন একটা আঘাত আসবে, যা সহ্য করা লীলার পক্ষে ততটা সহজ হবে না। অবশ্য লীলাও যে লোকজনের সঙ্গে মিশ্‌তে চাইত না তার মূলেও সেই কথা নিহিত ছিল। নিজের অস্তিত্বের লজ্জায় সে নিজেই মরেছিল; কিন্তু অরুণ তার সঙ্গে যেভাবে আলাপ ও তার মা'র অসুখের কথা শুনে যে রকম আগ্রহ কোরে তাঁকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তাতে তার ওপর অন্য কোন রকম ব্যবহার করলে অত্যন্ত রূঢ় হোতো। লোকজনের সঙ্গে মেশামেশি বন্ধ কোরে দিলেও সে রকম ব্যবহার করতে এখনো সে অভ্যস্ত হোয়ে ওঠে-নি।

অরুণ এসে ভুবনকে প্রণাম কোরে নিজেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়্‌ল। বাঙালীদের চাল-চলনে বিশেষ রকমে ওস্তাদ না হোলেও এই প্রণাম ও নমস্কার করা বিদ্যেতে ইতিমধ্যেই সে বেশ পরিপক্ক হোয়ে উঠেছিল। সোণালীতে আসা-মাত্র বিরাজ তাকে বলে দিয়েছিলেন যে, বাড়ীতে বয়স্থা মহিলা এলেই তাঁকে প্রণাম করবে। এই উপদেশ মতে চল্‌তে গিয়ে তাকে যে দু একবার ঠক্‌তে হয়-নি, তা নয়। একদিন ও পাড়ার এক বাড়ী থেকে একজন দাসী বিরাজদের বাড়ীতে কি এক কাজে এসেছিল, অরুণ সকলের সাম্‌নেই এই দাসীকে প্রণাম কোরে যৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত হয়েছিল। সেই থেকে এই প্রণাম করার ব্যাপারে সে বিশেষ সাবধান হোয়ে চল্‌ত। লীলাদের বাড়ীতে এসে সে মিনিট দশেকের মধ্যেই ভুবনের সঙ্গে এমন ভাব কোরে ফেল্লে যে, তা দেখে লীলাও অবাক হোয়ে গেল। ভালো কোরে বাংলা বল্‌তে না জান্‌লেও

সে তার ভাঙা-বুলি দিয়ে ভুবনের সঙ্গে এমন সরলভাবে কথাবার্ত্তা বল্‌তে সুরু কোরে দিলে যে, ভুবনের স্নেহপ্রবণ অন্তঃকরণ তাতে গলে গেল। অরুণ ভুবনকে বল্লে যে, ছেলেবেলায় কবে সে মাতৃহীন হয়েছে, মার মুখ তার মনে পড়ে না। তার কাছে মার যে ছবিখানা আছে তার সঙ্গে ভুবনের মুখের অনেক সাদৃশ্য আছে—ভুবনকে দেখে তার মনে হচ্ছে, যেন সে তার মার কাছে বসে আছে। সে ভুবনের নাড়ী দেখে তার রোগ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগ্‌ল। শুধু তাই নয়, সে একটা ওষুধের নাম লিখে দিয়ে বলে দিলে যে, নিশ্বাস নেবার কষ্ট হোলেই যেন সে এই ওষুধটা আনিয়ে খায়।

বেলা একটু পড়ে আস্‌তেই অরুণ লীলাকে বল্লে—চলুন, পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি।

লীলা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—আপনি বাংলা না বল্‌তে পার্‌লে আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব না।

অরুণ তার কথা শুনে বল্লে—বাংলা বল্‌তে পারি না, পড়্‌তে জানি না বলে সকলেই আমাকে ঠাট্টা করে, কিন্তু আমাকে শেখাতে কেউ চায় না; আপনি আমাকে পড়াবেন?

—আমার কাছে পড়্‌বেন? তবেই হয়েছে! যা একটু কিড়ির মিড়ির কোরে বল্‌তে পারেন তাও দু-দিনে ভুলে যাবেন।

অরুণ লীলার কথা শুনে কাতর-দৃষ্টিতে ভুবনের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—তবে আপনি আমায় শেখান, আপনার তো আর কোন কাজ নেই। অরুণের কথায় ভুবন হেসে বল্লে—ওমা! আমি শেখাব কি? আমি পড়াশুনা যা জানতুম, চর্চ্চা না থাকায় তাও ভুলে গিয়েছি। কেন সুকুমার তোমায় শেখাতে পারে না।

—সুকুমার আমায় দিনকতক শিখিয়েছিল, কিন্তু আজকাল সে

বিলেতে যাবার বন্দোবস্তে ব্যস্ত থাকায় আর সময় কোরে উঠতে পারে না।

ইতিমধ্যে বেয়ারা চা নিয়ে হাজির হোলো। চা খাওয়ার পর অরুণ লীলাকে বল্লে—চলুন, আবার অন্ধকার হোয়ে গেলে বেড়ান হবে না।

ভুবন লীলাকে বল্লে— যাও না মা, একটু বেড়িয়ে এস গে—

পরদিন দুপুর বেলা অরুণ একখানা আখ্যানমঞ্জরী দ্বিতীয় ভাগ, আর খাতা পেনসিল নিয়ে যখন লীলার কাছে এসে হাজির হোলো, তখন সে হাসি সাম্‌লাতে পাল্লে না। লীলার হাসি দেখে অরুণ বল্লে—দেখুন আমার মতন মনোযোগী ছাত্র আর পাবেন না। ছাত্রের বয়সের সঙ্গে যদিও তার পাঠ্য বইগুলোর খাপ্ খাচ্ছে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই ক-মাসের মধ্যেই এই ব্যবধানটা আমি পূরণ কোরে নিতে পারব।

কথাগুলো বলেই সে টেবিলের ধারে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে বসে পড়্ল। তার পর বইখানা খুলে বল্লে—আর দেরী নয়, "ভাল ছেলে সর্ব্বদা নিজের পড়ায় মন দেয়।"

ভুবন জিজ্ঞাসা করছিল—আচ্ছা অমৃত, তুই একটু ব্যবসা-ট্যাব্‌সা কর না কেন ?

অমৃত বল্লে—মাসীমা, স্কুল ছেড়ে দিয়ে মতলোব করেছিলুম, ব্যবসা করব। তখন টাকার সুবিধে হয়-নি। ইচ্ছা ছিল ব্যবসা কোরে বড় লোক হব, দেশের কাজে নাম্‌ব, অনেক কিছুই করবার কল্পনা ছিল, কিন্তু মজার কথা, টাকারও জোগাড় হোলো না, কিছু করাও আর হোয়ে উঠ্‌ল না।

—আচ্ছা আমি তোকে টাকা দিচ্ছি, তুই ব্যবসা কর, যে রকম ব্যবসা তোর খুসী—

চায়ের বাটীতে শেষ চুমুক লাগিয়ে ঢোঁক গিল্‌তে গিল্‌তে অমৃত বল্লে—হ্যাঁ, এতদিন বাদে টাকার সুবিধে হোলো স্বীকার করছি, কিন্তু আমারও তো সুবিধে-অসুবিধে আছে ? একদিন ছিল, যখন দিনরাত হা টাকা, যো টাকা কোরে ঘুরে বেড়িয়েছি। সে সময় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল। আমি কলকাতায় গিয়ে অনেক ধনীকে এই কয়লার কাজে নামাতে চেষ্টা করেছি। নেতাদের কথা শুনে দিনরাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে এখানে সেখানে টাকার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু তখন কেউ গোঁফ বেরোয়-নি বলে, কেউ গরীবের ছেলে বলে, কারুর বা বিশ্বাস হয়-নি বলে টাকা বার করে-নি। আমার উৎসাহ দেখে সে সময় বাবা তাঁর এই কুঁড়েখানা বেচে টাকা দেবার ঠিক করেছিলেন। এই বাড়ীটা ছিল তাঁর প্রাণ, তাই তাঁকে সে সময় বাড়ী বিক্রী করতে দিই-নি। টাকার জন্য মাসীমা অনেক গর্দ্দভের কাছ থেকে অপমান সহ্য করেছি।

অমৃত ক্রমেই উত্তেজিত হোয়ে উঠ্‌ছে দেখে ভুবন তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লে—তখন যা হবার তা হোয়ে গিয়েছে। এখন তো আমি তোকে সেধে টাকা দিতে চাইছি, তুই ব্যবসা কর্‌। টাকা যদি আমায় ফেরৎ দিতে পারিস্‌ তো দিস্‌, না হয় আমি এক পয়সাও চাই না।

ভুবনের কথা শুনে অমৃত একটু নরম সুরে বল্লে—মাসীমা, আমি জানি তুমি আমায় ছেলের মতন ভালবাস। তোমার দান অগ্রাহ্য করি এত বড় অকৃতজ্ঞ আমি নই। কিন্তু কি হবে টাকা নিয়ে? ব্যবসা কোরে বড়লোক হবার জন্যে? বড়লোক হোতে আমি চাই না। যেদিন চেয়েছিলুম, সেদিন সে আমায় কুকুরের মত দুর্‌ দুর্‌ কোরে তার দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ সে জোড় হাত কোরে আমার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ যদি আমি তাকে অভিনন্দন কোরে ঘরে তুলে নিই, তা হোলে সত্যি বল্‌ছি মাসীমা—তা হোলে নিজের কাছে জবাব দেবার আমার আর কিছু থাকবে না। আজকে তোমার এই দান প্রত্যাখ্যান কোরে আমি একটা গর্ব্ব অনুভব কর্‌ছি। আজ আমার মনে হচ্ছে, টাকার ওপর প্রতিহিংসা নেবার আমার একটা সুযোগ এসেছে। এই প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিয়ে তুমি যে আমার কি উপকার কর্‌লে তা তুমি বুঝতে পারবে না।

ভুবন সত্যি-সত্যিই অমৃতের কথাগুলো ভালো কোরে বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না। টাকার ওপর প্রতিশোধ নেওয়াটা যে কি রকম জিনিষ, সেটা তার মগজে ভালো কোরে প্রবেশ কর্‌ছিল না। অমৃতকে সে নিজের ছেলের মতন ভালবাসতো। সে অর্থশালী হয়, পৃথিবীতে উন্নতি করে, বিয়ে কোরে সংসারী হয়, ভুবন মনে-প্রাণে ভগবানের কাছে তার জন্য প্রার্থনা কর্‌ত। সেই অমৃত তার দান এমন-ভাবে প্রত্যাখ্যান কর্‌লে দেখে

ভুবন অন্তরে একটু ব্যথা পেলে। নানারকম ভাবনার মধ্যে থেকে হঠাৎ তার মনে হোলো, অমৃত যে রকম ছেলে, সে হয়তো দান বলেই এই টাকা নিতে রাজি হচ্ছে না। সে আবার টাকার কথা পেড়ে বল্লে—আচ্ছা তুই এম্‌নি না নিস্‌, আমার কাছে থেকে ধার নে। ধার নিতে তো আর কোন দোষ নেই?

ভুবনের মুখের ভাব ও কথার সুরে অমৃত বুঝতে পারলে যে, তার কথায় সে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। টাকার কথাবার্ত্তায় সে বাস্তবিকই উত্তেজিত হোয়ে উঠেছিল। সে দেখ্‌লে, টাকার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ভুবনের অন্তরে আঘাত দিয়ে ফেলেছে। অমৃত বল্লে—কি হবে মাসীমা টাকা নিয়ে? আসল কথা বড় লোক হোতে আমি চাই না। এখন আবার নতুন উদ্যমে ব্যবসায় লাগ্‌বার মতন শক্তি আমার নেই। বয়সে যে আমি খুব বুড়ো হোয়ে পড়েছি তা বল্‌ছি না, কিন্তু মনটা যে আমার চেয়ে ঢের বেশী বুড়ো হোয়ে পড়েছে তা আমি নিজেই বুঝতে পারি। মিছিমিছি কতকগুলো টাকা কেন নষ্ট করবে? তার চেয়ে তুমি কিছু টাকা খরচ কোরে এইখানকার গরীবদের জন্য একটা হাঁসপাতাল কোরে দাও। তোমার গরীব অমৃত চিরকাল গরীবই থাকৃতে চায়।

ভুবনের অনেকদিন থেকেই কোন হাঁসপাতালে কিছু টাকা দেবার ইচ্ছা ছিল। তার বিস্তর নগদ টাকা ছিল, তা ছাড়া সুবোধ অন্য অন্য বিষয়ও রেখে গিয়েছিল—যা থেকে অনেক টাকা আমদানী হোতো। কোথায় টাকা দিলে ভালো-ভাবে ব্যয় হবে ভুবন অমৃতকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলে। অমৃত বল্লে—সোনালীতে একটা হাঁসপাতাল কোরে দাও না? এখানকার গরীবেরা দেখ্‌তে পাই, অনেক সময়ে একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। অনেকের বাড়ীতে অসুখের সময় সেবা করতে গিয়ে দেখেছি, কু-চিকিৎসাতেও অনেক লোক মারা যায়। আমি নিজে ডাক্তারী জানি না,

ডাক্তার যাঁরা আছেন তাঁদের ডাক্‌লে হয়তো দয়া কোরে একবার কেউ আসেন, কিন্তু বিনা পয়সায় বার-বার সেখানে যাবার সুবিধা সকলের হোয়ে ওঠে-না। তুমি এইখানে তাদের জন্য একটা হাঁসপাতাল কোরে দাও।

সোনালীতে হাঁসপাতাল কোরে দেওয়ার কথাটা ভুবনের মনে বেশ লাগল। সে অমৃতকে বল্লে—অমৃত, তবে এই হাঁসপাতালের বন্দোবস্ত কর্, আমি টাকা দেব।

অমৃত যেদিন কলকাতা থেকে লীলাকে নিয়ে সোনালীতে চলে আসে, সেইদিন থেকে সে অন্যরকমের মানুষ হোয়ে গিয়েছিল। লীলার সঙ্গে তার মিলন অসম্ভব জেনেও সে তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল। এ জন্য সে নিজের মনের সঙ্গে কম যুদ্ধ করে-নি, কিন্তু শেষকালে তাকে হার মান্‌তে হয়েছিল। অমৃতর প্রকৃতি ছিল উদ্দাম, একরোখা। সে যে কাজে হাত দিত, প্রাণ দিয়ে তা শেষ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ত, সংসারের অন্য কোন ভাবনা তখন তার কাছে ঘেঁষ্‌তে পার্‌ত না। সেইদিন থেকে লীলার চিন্তা তার অন্তরের সমস্ত বৃত্তিগুলোকে অধিকার কোরে বস্‌ল। সময়ে সময়ে তার মনে হোতো যে, তার মনের মধ্যে এক সঙ্গে তিন্‌টে লোক বাস কর্‌ছে। একজন লীলাকে ভালবাসছে, একজন তাকে বাধা দিচ্ছে আর বল্‌ছে, এ ভালবাসায় কোন লাভ নেই, আর একজন এই দুইজনের কথাবার্ত্তা শুন্‌ছে আর হাস্‌ছে।

প্রথম প্রথম অমৃতর মনে হোতো যে, সে লীলাকে সোজাসুজি জানিয়ে দেবে যে, সে তাকে ভালবাসে। দু-একদিন তাকে জানাবার সঙ্কল্প কোরে সে বাড়ী থেকেও বেরিয়েছিল ; কিন্তু তাদের বাড়ীতে গিয়ে যখন সে দেখ্‌ত যে, লীলা ম্লানমুখে উদাস দৃষ্টিতে সূর্য্যাস্তের দিকে চেয়ে ভাবনায় বিভোর হোয়ে আছে, লীলার মলিন মুখ দেখে সহানুভূতিতে তার হৃদয় গলে যেত, সে ভাব্‌ত প্রেম নিবেদন করবার সময় এ নয়। কিসের ভাবনায় যে

লীলা এতটা আনমনা হোয়ে পড়েছে, কি দুঃখ যে তাকে দিনে দিনে তিলে তিলে দহন করছে, ঠিক না জানলেও অমৃত আন্দাজে তার কতকটা বুঝে নিয়েছিল ; কিন্তু লীলার যে দুঃখ তাতে সহানুভূতি জানাতে গেলে তার হৃদয়ে আরও আঘাত লাগ্‌তে পারে, এই ভেবে সে বিষয়েও সে বিশেষ সাবধানে চলত।

অমৃত নানারকমে লীলার মনকে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করত। লীলা তার এই চেষ্টা বুঝতে পারে কি না লীলার ব্যবহারে অমৃত তা জানতে পারত না। সে-ই লীলাকে বলে বলে তাকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে আরম্ভ করে। যেটুকু সময় তারা রাস্তায় কিংবা সাঁওতাল-পল্লীর মধ্যে ঘুরে বেড়াত, অমৃত নানা কথাবার্ত্তা দিয়ে তাকে প্রফুল্ল কোরে তোলবার চেষ্টা করত। যেদিন লীলা অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশী কথা বলত, কিংবা একটু বেশী হাসত, সেদিন তার বুকের বোঝা অনেক হাল্কা হয়েছে বলে বোধ হোতো। কিন্তু লীলার সঙ্গে বিকেলে বেড়ানোর এই সুখও তার বেশী দিন সইলো না। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের এই বেড়ান নিয়ে সেখানে নানারকম কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। অমৃত কোন দিনই কারো কথাকে বড় একটা আমোল দিত না, কিন্তু লীলার সুনামের জন্য এবার তাকে লোকের কথার কাছে ঘাড় নীচু করতে হোলো। লীলার কানে সেই সব কথা ওঠবার আগেই সে তার সঙ্গে বিকেলে বেড়ান বন্ধ কোরে দিলে। জীবনে এই সে প্রথম পরাজয় স্বীকার করলে, কিন্তু তার সান্ত্বনা ছিল যে, তার জীবনের সর্ব্বোত্তমার জন্য এই তার সর্ব্বপ্রথম পরাজয়।

মাস দুয়েকের মধ্যেই অরুণ আশ্চর্য্য রকমের উন্নতি কোরে ফেল্লে। তার অসাধারণ ধৈর্য্য ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে তার মাষ্টার পর্য্যন্ত অবাক্ হোয়ে গেল। লীলা ভেবেছিল, হয়তো এই বুড়ো-খোকাকে পড়াতে তাকে বিস্তর দুর্গতি ভোগ করতে হবে, কিন্তু শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও উন্নতি দেখে তারও অরুণকে পড়ানোর কাজে একটা উৎসাহ এসেছিল। লীলা অরুণের সঙ্গে যতক্ষণ পারত ততক্ষণ গল্প করত। কথাবার্ত্তার ভেতর দিয়ে যে খুব তাড়াতাড়ি ভাষা শেখবার সুবিধা হয় সে অভিজ্ঞতা তার নিজের জীবনেই হয়েছে। ইংরেজদের স্কুলে ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে দিনরাত গল্প করবার সুবিধা পেয়েছিল বলেই অত তাড়াতাড়ি সে ঐ ভাষা শিখতে পেরেছিল। তা ছাড়া লীলা প্রায়ই অরুণকে বাঙালী কবিদের কবিতা ও নানারকম লেখা পড়িয়ে শোনাত। কবিতার দিকে অরুণের বিশেষ ঝোঁক ছিল, সে মাঝে মাঝে ইংরেজিতে কবিতাও লিখত। বিলেতে বসে সে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যে-সব গল্প শুনত, তাতে তার ধারণা হয়েছিল যে, বাঙালীর মধ্যে কবি নাই, কিন্তু লীলার মুখে এই সব কবিতা শুনে-শুনে তার বাংলা শেখবার জেদ আরও চড়ে গেল। আগ্রহের মুখে অরুণ লীলার কাছ থেকে গোটাকয়েক গান পর্য্যন্ত শিখে ফেল্লে।

বিলেতে ফিরে যাবার দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, অরুণের মনে লীলার মূর্ত্তি ততই চেপে বসছিল। এই ক-মাস প্রায় রাত-দিনই সে লীলার সঙ্গ ছাড়া হয়-নি। অরুণ বুঝতে পারত যে, লীলার কথাবার্ত্তা ধরণ-ধারণ এমন কি হাসির মধ্যেও এমন একটা করুণ, এমন একটা বিষাদের সুর বাজতে থাকে যে, লীলা চেষ্টা কোরেও সেটাকে চেপে

রাখ্‌তে পারে না। বিশেষ কোরে লীলা যখন গান গায় তখন এই বিষাদের রাগিণী যেন বন্যা ছাপিড়া হোয়ে ছুট্‌তে থাকে। কতদিন লীলার গান শুন্‌তে শুন্‌তে অরুণের চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে; চোখের জল মুছে ফেলবার আগেই হঠাৎ লীলা গান থামিয়ে অরুণের দিকে ফিরে চেয়েছে; অরুণও দেখেছে, লীলার চোখও জলে, ভরা! দুজনেই দুজনের চোখে জল দেখে বিস্মিত হয়েছে! দুজনেই ভেবেছে—ওর কিসের দুঃখ!

একদিন পাহাড়ে বসে লীলা গান গাইছিল, আর মুগ্ধ অরুণ বসে বসে শুনছিল। লীলা গাইছিল, নিরাশার গান, বিফলতার গান। সেদিন অরুণ আর থাকতে না পেরে লীলাকে জিজ্ঞাসা কোরে ফেল্লে—আচ্ছা, আপনার মনে এমন কোন দুঃখ আছে যাতে আপনি নিশিদিন কষ্ট পাচ্ছেন।

অকস্মাৎ এই প্রশ্নের জন্য লীলা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, সে অরুণের কথার কোন জবাব দিতে না পেরে ঘাড় নীচু কোরে চুপ্

...।

আবার বল্লে—আপনার মনে যে দুঃখ আছে সেটা কিন্তু কোরেও লুকিয়ে রাখ্‌তে পারেন না। আপনার হাবে-ভাবে ...এমন কি আপনার হাসিতে পর্য্যন্ত দুঃখ মূর্ত্তিমন্ত হোয়ে হয়তো আমি নিজে দুঃখী বলে আমার চোখে এটা যেমন ধরা ...চোখে তা পড়ে না—

দিনরাতই কথাবার্ত্তা, হাসি-তামাসা নিয়ে থাকৃত। তাকে মধ্যে মধ্যে হিংসা পর্য্যন্ত হোতো। সে প্রায়ই ভাবতো—বাঃ এই লোকটী, কোন ভাবনা চিন্তা নেই, হেসেই জীবনটা কাটিয়ে আজকে হঠাৎ তার মুখে দুঃখের কথা শুনে সে একটু অবাক্ হোয়ে গেল।

লীলা বল্লে—আপনার দুঃখ! আপনার কি দুঃখ?

—আমার দুঃখ নেই! মনে করেছেন জগতের য়ত দুঃখ আপনিই সব একচেটে কোরে ফেলেছেন? দেখু ছেলেবেলা জ্ঞান হবার আগেই মাকে হারিয়েছি, একটু বড় হোতে না হোতে বাবা চলে গেলেন। বিদেশে বিজাতির হাতে মানুষ হয়েছি; ভারতবর্ষ আমার স্বদেশ বটে, কিন্তু এত বড় দেশের মধ্যে আমার নিজের বল্‌তে কেউ নেই। আজ যদি এইখানে ধরুন, এই পাহাড়ের ওপর যদি আমার হয়, তা হোলে আমার জন্য চোখের জল ফেল্‌বে এমন লোক কেউ নেই। আমার মতন হতভাগা আমি তো আমার জীবনে আর দুটী দেখি-নি।

কথাগুলো বলেই সে অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হোয়ে প তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবার উপক্রম হচ্ছিল, অনেক ঢোঁক গিলে-গিলে সে চোখের জল সাম্‌লে ফেল্লে। অরুণের বুকের মধ্যে যে ব্যথার তরঙ্গ উঠেছিল তারই একটা ঢেউ লীলার বুকে গিয়ে ফিরে ফিরে আঘাত করতে লাগ্‌ল্‌। সে তাকে একটু উৎসাহ দেবার জন্য বল্লে জীবন একটু আশ্চর্য্য রকমের বটে, কিন্তু ভেবে দেখুন, বাবা কারো বেঁচে থাকে না। এই আমার বাবা নেই, মারও যে-রকম, তাতে যে কোন মুহূর্ত্তেই তিনি মারা যেতে পারেন দুনিয়ায় আর কেউ নেই। কিন্তু আপনার ভবিষ্যৎ আছে ডাক্তার হোয়ে অর্থ উপার্জ্জন করবেন, লোকের উপকার করবেন

লীলার কথা মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে অরুণ বলে উঠ্‌ল—ছাই কর্‌বে! যে লোকের উপকার কর্‌তে পারে সে মহা ভাগ্যবান। আর অর্থ উপার্জ্জন করার কথা যা বল্লেন, অন্ততঃ সেজন্য আমি ডাক্তারী পড়্‌তে ঢুকি-নি। আমার যা অর্থ আছে, দশটা ডাক্তার দশ জীবন ধরে উপার্জ্জন কর্‌লেও তত টাকা উপায় কর্‌তে পার্‌বে না।

অরুণের দমে-যাওয়া মনটাকে একটু চাঙ্গা কোরে তোলবার জন্য লীলা

তাদের কথাৰ্দ্ধি বৰ্দ্ধে মোড় ফিরিয়ে দিয়ে তাকে বল্লে—আচ্ছা আপনি পাশ কোরে দেশে ফিরে এসে কোথায় বসবেন? কলকাতায় নিশ্চয়?

—কলকাতায় কেন! আমি পাশ কোরে এসে এখানেই বস্‌ব।

অরুণের কথা শুনে লীলা একটু আশ্চর্য্য হোয়ে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা —কেন? এখানে কেন? এখানে দু-তিনজন ডাক্তার আছেন, তার কাছে শুনেছি তাদের ব্যবসাই ভাল কোরে চলে না।

—হ্যাঁ ব্যবসা যদি ভাল কোরে চালাবার ইচ্ছা থাকৃত তবে কোতেই গিয়ে বস্‌তুম, কিন্তু আমার সে ইচ্ছা নেই। আমি নীচেই খানিকটা জমি কিনে এখানে বাড়ী কর্‌ব। আপনারা যে হাঁসপাতাল কোরে দিচ্ছেন সেইখানে কাজ কর্‌ব। তা ছাড়া [illegible] কাছে আমি অনেক বিষয়ে ঋণী। এইখানে এসে আমি তবু বুঝতে পেরেছি যে, আমি নিজের দেশে এসেছি। এখানকার [illegible]তিক দৃশ্যও আমার চোখে বড় সুন্দর লাগে। আমি ইউরোপের সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়িয়েছি, হয়তো স্বাস্থ্যের হিসাবে সে সব এখানকার চেয়ে অনেক ভাল, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়াও এখানকার [illegible]র আমার বড় ভাল লাগে। এই সাঁওতালদের মতন সরল লোক আমি এর আগে কখনো দেখি-নি। এখানে এসে মাতৃহীন আমি [illegible]র স্নেহ পেয়েছি, আপনার মত বন্ধু পেয়েছি—আমি ফিরে এসে আমাদের বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ এই পাহাড়টা সরকারের কাছে থেকে কিনে এর ওপর একটা বিশ্রামের ঘর তৈরি কর্‌ব।

অরুণের কথা শুনে লীলার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎবেগে একটা শিহরণের ঢেউ বয়ে গেল। তার মুখ, কান লাল হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে সে পাথরের গায়ে আঁচড় কাট্‌তে কাট্‌তে [illegible] জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনি কি আমাকে বন্ধু মনে করেন?

—নিশ্চয়ই করি। আপনি? আপনি কি আ[illegible] বন্ধু মনে করেন না?

লীলা ঘাড় হেঁট কোরেই উত্তর দিলে—করি।

অরুণ আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—এই দেখুন, শীগ্‌গীরই আমাকে একবার দেশে যেতে হবে। আমি শুনেছি যে, আমাদের সেখানে প্রাসাদের মতন বাড়ী আছে। আমাদের প্রজারা বাবাকে রাজা বলে ডাকৃত, আমাকে তারা সবাই দেখ্‌তে চায়ে চিঠি লিখেছে; চিঠিতে তারা আমাকেও রাজা বলে সম্বোধন করেছে। শুনেছি, বাংলা দেশের পল্লীগ্রাম নাকি একটা দেখবার জিনিষ। এতগুলো প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও আপনাদের ছেড়ে সেখানে যেতে আমার মন কিছুতেই চায় না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় যে আর বিলেতে গিয়েই বা কি হবে!

পল্লীগ্রামের কথা শুনে লীলা বল্লে—আমারও পাড়াগাঁ দেখতে ভারি ইচ্ছা করে। ছেলেবেলা থেকে এই পাহাড় আর বালি দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গিয়েছে। শুনেছি যে, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের চারিদিকেই গাছপালা, বাংলা-মায়ের সেই শ্যামল শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের নাকি কখনো অতৃপ্তি হয় না।

অরুণ বল্লে—তা হোলে আমাদের দেশে চলুন না, সেখানে থাকবার কোন অসুবিধা হবে না—কথাটা বলা-মাত্র অরুণের মুখের ওপর দিয়ে একটু দুষ্ট হাসি খেলে গেল। সে মনে করেছিল যে, লীলার অলক্ষ্যেই এই হাসিটা খেলে গিয়েছে, কিন্তু লীলার চোখে সেটা এড়িয়ে যায়নি।

লীলা একটু ঠাট্টার সুরে বল্লে—আমার মতন লোকের কি আর রাজাদের বাড়ীতে যাওয়া শোভা পায়?

—ঠিক বলেছেন, রাজাদের বাড়ীতে এম্‌নি যাওয়া আপনার শোভা পায় না—

এই অবধি বলেই অরুণ তার গলার আওয়াজ অপেক্ষাকৃত নামিয়ে বল্লে—কিন্তু আমি যদি সেখানে আপনাকে রাণী কোরে নিয়ে যাই! তা হোলে যাবেন? বলুন?

অরুণের কথাটা লীলা ভাল কোরে ধরতে পারলে না। কথাগুলো তার কানের মধ্যে ঢুকে মগজ অবধি পৌঁছবার আগেই যেন এলিয়ে শিরা-উপশিরা দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়্ল। তার মাথা থেকে পা অবধি ঝিম্ ঝিম্ কর্তে লাগ্ল।

এতদিন চেপে থেকে থেকে হঠাৎ সেদিন অরুণের হৃদয়ের দুয়ার খুলে গিয়েছিল। সংযম ও সংস্কারের দেওয়াল দিয়ে এতদিন সে তার হৃদয়াবেগকে কোন রকমে রুদ্ধ কোরে রেখেছিল, আজকে হঠাৎ ভেতর থেকে কিসের ধাক্কা পেয়ে সব বাঁধ ভেঙে গেল। উচ্ছ্বসিত আবেগে সে বল্তে লাগ্ল—লীলা তুমি বোধ হয় জান না, আমি তোমায় ভালবাসি—কত ভালবাসি। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলুম—তুমি তোমাদের বাগানে দাঁড়িয়ে উন্মনা হোয়ে উদাস দৃষ্টিতে নিভন্ত সূর্য্যের দিকে চেয়েছিলে, সেইদিনই তোমার ঐ বেদনা-ভরা মুখ আমার মনের মধ্যে গাঁথা হোয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে ভাব করবার জন্য আমি প্রতিদিন কত ছলে তোমাদের বাড়ীর চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়েছি—সে কথা তুমি জান না। তোমার কথা কখনো শুনি-নি, স্বপ্নে মনে হয়েছে যেন তুমি আমায় ডাক্‌ছ,—আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি। তারপর যেদিন প্রথম তোমার গান শুনি, যেদিন এইখানে, এই রকম সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে প্রথম কথা বলি,—আমার জীবনে সে রকম সৌভাগ্যের দিন আর কখনো হয় নি। আমার কাছে সেই কয়েক মুহূর্ত্ত চির স্মরণীয় হোয়ে থাক্‌বে। লীলা—তুমি আমায় বিয়ে করবে? বল, তা হোলে এই হতভাগা—

অরুণ আরও অনেক কথা বল্‌তে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার উচ্ছ্বাসের

মুখে বাধা পড়্‌ল। সে দেখ্‌লে যে, লীলা চোখে কাপড় দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে। লীলাকে কাঁদ্‌তে দেখে সে তার কথা থামিয়ে ফেল্লে। তার মনে হোলো, হয়তো না জেনে সে লীলার অন্তরে আঘাত করেছে। নিজের জীবনের সঙ্গে লীলাকে জড়িয়ে নিয়ে এতদিন ধরে কল্পনায় সে ভবিষ্যৎ জীবনের যে মনোভিরাম ছবি এঁকেছিল, লীলার চোখের জলে তার মন থেকে সে ছবি মুছে যেতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে লীলার দিকে চেয়ে থেকে মুমূর্ষুর নিশ্বাস নেবার শেষ চেষ্টার মতন সে উঠে একেবারে লীলার পাশে গিয়ে বসে তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে—আমায় ক্ষমা কর লীলা, আমি না জেনে তোমার মনে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। আমি ভেবেছিলুম যে, আমার ভালবাসা আমি কখনো তোমার কাছে প্রকাশ করব না; কিন্তু আমার অন্তর যে এত দুর্ব্বল তা আমি জান্‌তে পারি-নি। প্রত্যেক মানুষের জীবনেরই একটা স্বতন্ত্র ধারা আছে। সেই ধারার গতি দেখে তার অদৃষ্ট বুঝতে পারা যায়। আমার এই প্রেম যে ব্যর্থ হবে তা আমি জানতুম, তাই ঠিক করেছিলুম সে কথা তোমায় কখনো জান্‌তে দেব না। কিন্তু 'অকস্মাতের খেলা' বলে একটা কথা আছে শুন্‌তে পাই, নিজের চোখেও দেখেছি আমার মতন অনেক অভাগার জীবনও এই 'অকস্মাতে'র হাতে পড়ে একেবারে বদ্‌লে গেছে। হয়তো সে আমার জীবন-নদীতেও একটা বিপরীত স্রোত বইয়ে দিতে পারে, সেই আশাতেই আমি তোমার কাছে আমার প্রেম নিবেদন করেছিলুম। আমার কথায় যদি তোমার অন্তরে আঘাত লেগে থাকে তো আমায় ক্ষমা কোরো লীলা, আমি আর তোমার চোখের সাম্‌নে আস্‌ব না। আমায় ভাল না বাস্‌তে পার—আমায় ক্ষমা কোরো।

অরুণের কথা শেষ হোয়ে যেতেই লীলা তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে গেল।

পাহাড় থেকে নেমে লীলা বাড়ীর দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌ল। তখন আধখানা সূর্য্য হাতীবসার আড়াল থেকে সোনালীর মাঠ-পথ সোণায় মুড়ে দিচ্ছিল। পৃথিবীর সোনালী, আর পশ্চিম আকাশের রক্ত-রাঙা রং অরুণের চোখকে ধাঁধিয়ে দিতে লাগ্‌ল। ক্রমে সূর্য্য হাতীবসার গা গড়িয়ে রক্তসাগরে ডুবে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা আব্‌ছায়ায় চতুর্দ্দিক আঁধার হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। অরুণ দেখ্‌তে লাগ্‌ল, লীলা সেই আব্‌ছায়ার ভেতর দিয়ে পথ বেয়ে চলেছে। হঠাৎ এক জায়গায় মুহূর্ত্তের জন্য থেমে লীলা একবার পেছন ফিরে দেখ্‌লে। লীলা পেছন ফিরতেই অরুণের বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেল, যন্ত্রচালিতের মতন সে মাটি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। লীলাকে আবার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হোতে দেখে সে বসে পড়্‌ল। এতক্ষণ এক নিমেষের জন্য লীলা অরুণের দৃষ্টিপথ থেকে সরে যায়-নি—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বিমূঢ় অরুণ স্তব্ধ হোয়ে সেখানে বসে রইলো।

সন্ধ্যার আব্‌ছায়া ঘন হোতে হোতে গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হোলো, অরুণ তবুও সেখান থেকে উঠ্‌তে পার্‌লে না। তার সমস্ত শক্তি রাত্রির অন্ধকারে সেইখানে ছড়িয়ে গিয়েছিল, আবার সেই শক্তিকে জড়ো কোরে পাহাড় থেকে নামবার তার আর ইচ্ছা কর্‌ছিল না। অসহায়ের মত সে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে পাহাড়ের ওপর শুয়ে রইলো।

১৪

লীলা বাড়ীতে এসে বিছানায় উপুড় হোয়ে বালিসে মুখ গুঁজে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। কিছুতেই সে কান্না থামাতে পার্‌ছিল না। অরুণের মিনতি-ভরা কথাগুলো তখনো তার বুকের মধ্যে বাজছিল—"লীলা আমায় ভালবাস্‌তে না পার, আমায় ক্ষমা কোরো। আমি তোমার কাছে আর আস্‌ব না।" পাহাড়ে অরুণের পাশে বসে আর সেখান থেকে বাড়ীতে এসে কতবার সে মনকে সংযত কোরে অরুণের কথাগুলো ভাল কোরে ভাব্‌বার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার অসংযত মন কিছুতেই বাধা মানে-নি, কোথা থেকে চোখের জল এসে তার সব চিন্তাগুলোকে এলোমেলো কোরে দিয়ে যেতে লাগ্‌ল। বিয়ে সে কর্‌তে পারে না, এ-জগতে কাউকে তার বিয়ে করবার অধিকার নাই, তার জন্মের সঙ্গেই সেটা ঠিক হোয়ে গিয়েছে! কিন্তু ভালবাসবার অধিকার—সেটা যে তার অন্তরের জিনিষ! সেখানে সমাজ নাই, সংস্কার নাই, বাধা দেবার কেউ নাই। তবুও সে ভেবে রেখেছিল, জীবনে কাউকে ভালবাস্‌বে না। সংসারের সহস্র দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আবার কেন জোর কোরে আর একটা কষ্টকে টেনে নিয়ে আস্‌বে? যার বাপ-মায়ের লৌকিক বিয়ের অনুষ্ঠান হয়-নি, সংসারের যত নিন্দা, যত ঘৃণা, যত কিছু অভিশাপ সবই যে তার জন্য তোলা থাকে, তার ওপরে নিজে ইচ্ছা কোরে আর একটা যন্ত্রণা বাড়াবার দরকার কি? চোখের সাম্‌নেই সে তার মার যন্ত্রণা দেখ্‌তে পাচ্ছে, আবার বিয়ে কর্‌লে সে যে সন্তানের জননী হবে তাকেও তো তার মতন নিন্দার ভাগী হোতে হবে। তাদের অবস্থা দেখে তখন তাকে তিলে তিলে পুড়ে মরতে হবে—এখন তার মার যে রকম হচ্ছে! লীলা নিজের যুক্তি তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে নিজের মনকে ঠিক কোরে ফেলেছিল, মনকে বুঝিয়েছিল যে, এ-বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হোয়ে গিয়েছে।

কিন্তু একটা মানুষের মধ্যে হাজার মানুষের মন চুপ্ কোরে বসে থাকে; যখন যে সুবিধা পায় তখনই সে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে, লীলার সে অভিজ্ঞতা ছিল না। অরুণের কথা যেদিন থেকে সে মনে মনে ভাবতে আরম্ভ করেছিল, যেদিন সে মনে মনে ভেবেছে—না না, তা কখনো হোতে পারে না, সেদিন থেকে তার অজ্ঞাতেই সে তাকে ভালবাস্‌তে আরম্ভ করেছিল। যে চিন্তা তার অব্যক্ত-চেতনালোকে নিশিদিন জাগ্রত ছিল, অরুণের কথায় আজ সে স্বরূপমূর্ত্তিতে তার মনের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। অকস্মাৎ সে অনুভব করলে, অরুণকে সে ভালবাসে, তখুনি তার মনে পড়্ল তাকে সে বিবাহ কর্‌তে পারে না। আর তখুনি বুঝতে পার্‌লে, মর্ম্মে মর্ম্মে—যাকে ভালবাসা যায় তাকে না পেলে কি দুঃখ।

অরুণ যে লীলার জন্মের ইতিহাস জান্‌ত না, লীলা তা জান্‌ত। তার মনে হোতে লাগ্‌ল, সে যদি তার কথা জান্‌তে পারে তা হোলে হয় তো তার সমস্ত ভালবাসা এক মুহূর্ত্তে কোথায় চলে যাবে। কেন সমাজ এই বন্ধন দিয়ে মানুষের মনের এই অতি স্বাভাবিক গতিকে এমনভাবে বেঁধে রেখেছে? ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মন সমস্ত সমাজের ওপর আক্রোশে ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল কোন রকমে একবার যদি এই সংস্কারগুলোকে কোনদিক দিয়ে আঘাত কর্‌তে পারে, তা হোলে তার মনটা যেন একটু তৃপ্তি পায়। লীলার বিদ্রোহী মন ভেতর থেকে গর্জ্জে উঠে বল্‌তে লাগ্‌ল—কেন আমি কিসে হীন? কার চেয়ে হীন? নিজের অস্তিত্ব নিজের কাছে এমন কোরে হীন কোরে রেখেছি বলেই সমাজ আমাকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে!

লীলা ঠিক কর্‌লে, সে অরুণকে তার জন্মবৃত্তান্ত খুলে বলে দেখ্‌বে তবুও সে তাকে গ্রহণ কর্‌তে পারে কি না। সে বিছানা ছেড়ে উঠে মুখে চোখে জল দিয়ে তাকে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌ল।

অরুণ যে লীলাদের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করছে বিরাজমোহিনী ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারেন-নি। সুকুমারের যেদিন থেকে অরুণের সঙ্গে বিলেত যাওয়ার ঠিক হয়েছে, সেইদিন থেকে তিনি তাকে আর অরুণকে বিলেতে থাকা ও পড়া সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সুরু করেছিলেন। অরুণ যে ছেলেবেলা থেকে সেখানেই কাটিয়েছে, নিজের দেশের চেয়ে যে সেখানকার অভিজ্ঞতাই তার বেশী সে কথা বিরাজের মনেই থাকত না। তিনি যখন ছেলেদের সেখানে থাকা, খাওয়া, পরার ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন তখন সেখানে বাইরের কোন লোক উপস্থিত থাকলে তার মনে হোতো যে, বিরাজ বুঝি বয়সের অর্দ্ধেককাল বিলেতেই কাটিয়ে এসেছেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে সুকুমার আর অরুণ কি করবে, অরুণের বাড়ী কোথায় হবে, কোন কোন মেয়ের সঙ্গে তাদের বিয়ে দেবেন, সে সব তাঁর ঠিক করা ছিল। সুকুমারের ছেলেবেলা থেকেই তার মার মুরব্বিয়ানা সহ্য করা, শুধু সহ্য করা নয়, বিনা বিচারে তা পালন করা অভ্যাস হোয়ে গিয়েছিল; কিন্তু অরুণ ছেলেবেলা থেকেই অভিভাবকহীন, তার মাথার ওপর কোন রকম চাপ্ না থাকায় তার যা ইচ্ছা তাই কোরে এসেছে। বিলেতে স্কুলের বোর্ডিংয়ে যতদিন সে ছিল, ততদিন তার ইচ্ছা স্কুলের বাঁধাবাঁধি নিয়ম কানুনে ঠোকা খেত বটে, কিন্তু সে অনেকদিন হোয়ে গিয়েছে। দেশে এসে হঠাৎ এই মহিলাটীর উপদেশের ঠেলায় সে বিব্রত হোয়ে পড়েছিল। নাওয়া, খাওয়া, কাপড় পরা, সকালে ওঠা প্রভৃতি নিয়ে তিনি নিজের ছেলে সুকুমারকে প্রত্যহ যেমন উপদেশ দিতেন, অরুণ আসার পর থেকে তার ওপরেও সেই রকম উপদেশের ধারা বর্ষিত হোতে লাগল। নতুন লোক পেলে তাঁর এই ইন্দ্রিয়টা একটু বেশী রকমের প্রবল হোয়ে উঠত। প্রথম দিনকয়েক অরুণের মনে পালাই-পালাই ডাক ছাড়তে আরম্ভ করেছিল, উপদেশের সঙ্গে সে যদি স্নেহ না পেত, তবে বোধ হয় চক্ষু-লজ্জারও

খাতির না রেখে, সে কলকাতায় পালিয়ে যেত। লীলার চিন্তা তার মনে ঢোকবার পর বিরাজের উপদেশগুলো তার আর কানেই লাগ্‌ত না।

সেদিন পাহাড় থেকে অরুণ বাড়ীতে ফিরে এসে "কিচ্ছু খাব না" বলে বিছানায় শুয়ে পড়েও নিশ্চিন্ত হোতে পার্‌লে না। বিরাজমোহিনী এসে তাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ কর্‌লেন—কেন খাবে না? রাত্রে না খেলে কি কি রোগ হয়, কোথায় কে রাতে না খেয়ে আলস্য কোরে শুয়ে পড়্‌ত তারপর তার কি রকম অসুখ হয়েছিল ইত্যাদি—। মনে মনে বিরক্ত হোয়ে অরুণ যখন তাঁকে বল্লে যে, তার শরীরটা আজ তত ভাল নেই, বিরাজ তখন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তাকে আক্রমণ কর্‌লেন। কি হয়েছে? কেন শরীর খারাপ হোলো? রোজ বারণ করি অত রাত্রি কোরে বাইরে থেক না। সুকুমার দিনকতক রাত কোরে বাড়ী ফির্‌তে আরম্ভ করেছিল শেষকালে তাকে কি ভোগানই না ভুগ্‌তে হোলো—

কোন কথা বল্লে বিরাজ পাছে আবার উৎসাহ পান, এই ভয়ে অরুণ চুপ্‌ কোরে পড়ে রইলো, পায়ের কাছ থেকে চাদরখানা তুলে নিয়ে সে মাথা পর্য্যন্ত চাপা দিয়ে পাশ ফিরে শুলে। অরুণকে পাশ ফির্‌তে দেখে বিরাজ একটা নেকড়ার পটী অডিকলোনে ভিজিয়ে তার মাথায় লাগিয়ে দিয়ে তাকে ঘুমুতে বলে চলে গেলেন।

অরুণ বিছানায় পড়ে-পড়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। কত রকমের চিন্তা তার মাথার মধ্যে এসে তালগোল পাকাতে সুরু কোরে দিলে, তার একটারও সে খেই ধর্‌তে পার্‌ছিল না। সে ভাব্‌ছিল লীলার কাছে হঠাৎ অমনভাবে ঐ-সব কথাগুলো বলে ফেলা ঠিক হয়-নি। কিন্তু সে তো সোজাসুজি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার্‌ত। লীলার সঙ্গে এতদিন মিশে তার চরিত্র সম্বন্ধে অরুণের যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাতে তার প্রস্তাব শুনে সে অমন কোরে কেঁদে উঠ্‌বে এটা সে কিছুতেই

মনে কর্‌তে পারে-নি। তার মনে হোলো—রমণীর চরিত্র বাস্তবিকই দুর্জ্ঞেয়। বিশেষ কোরে এ-দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। এক-একবার সে ভাব্‌ছিল যে, কালই লীলার কাছে গিয়ে তার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইবে। তার পর—তার পর নিজের ভবিষ্যতের একটা ভাবনাও তার অন্তরের মধ্যে উঁকি মার্‌ছিল। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে অরুণ ফিরে দেখ্‌লে যে, সেখানটা একেবারে ধূ ধূ কর্‌ছে। লীলার চোখের জল তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে একেবারে ধুয়ে-মুছে নিয়ে গিয়েছে—

লীলা কি কাউকে ভালবাসে! কাকে ভালবাসে? কাকে সম্ভব! অরুণ ভাবতে লাগ্‌ল—লীলাদের বাড়ীতে সে তো অমৃত ছাড়া আর কোন ছেলেকে কখনো দেখে-নি। দুই একদিন অমৃতর চোখের দৃষ্টি দেখে তার মনে হয়েছে বটে যে, অমৃত যেন লীলাকে ভালবাসে। কিন্তু লীলার চোখে সে তো কখনো কিছু দেখে-নি। হোতে পারে অমৃতকেই সে ভালবাসে। কিন্তু অমৃতর নামে সুকুমারদের বাড়ীতে সে অনেক নিন্দা শুনেছে; দেশে এত লোক থাকতে লীলার মতন মেয়ে কি কোরে অমৃতকে ভালবাস্‌তে পারে, তা সে কিছুতেই ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিল না। বাড়ীর কাছেই তো সুকুমার রয়েছে! সুকুমারের সঙ্গেই তো তার—

আচ্ছা, সুকুমারদের বাড়ীতে এত লোক আসে, কিন্তু লীলাদের কখনো এখানে দেখতে পাওয়া যায় না! এর কারণ কি? নিশ্চয় এর মধ্যে কোন রহস্য আছে! নানা রকম ভাবনায় অরুণের মাথা গরম্‌ হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে বিছানা ছেড়ে উঠে মাথাটা বেশ কোরে ধুয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়্‌ল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই সে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

ভোর বেলা ঘণ্টা দেড়েক ঘুরে বেড়িয়ে অরুণ কতকটা সুস্থ বোধ কর্‌লে। কাল রাত্রে ঘুম না হওয়ার জন্য তার মাথাটা ভয়ানক ভারী

বোধ হচ্ছিল, আবার ঘুরুলে পাছে মাথা ধরে সেই জন্য ও কতকটা বিরাজ মোহিনীর জেরার ভয়ে বেড়াবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে বাড়ী ফিরতে হোলো। বাড়ীর কাছে একটা বড় কেয়া-ঝাড়ের ধারে লীলাদের দুঃখু চাকর দাঁড়িয়েছিল, অরুণকে দেখেই সে তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বল্লে—দিদিমণি এই চিঠিখানা আপনাকে দিয়েছেন—

চিঠিখানা অরুণের হাতে দিয়েই দুঃখু হন্ হন্ কোরে বাড়ীর দিকে চলে গেল।

অরুণের আর বাড়ী ফেরা হোলো না। খামখানা হাতে নিয়ে সে নিশ্চল হোয়ে কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলো। সেখানা খুলতে তার ভরসা হচ্ছিল না। অরুণের মনে হোতে লাগল, না জানি কি রহস্য এই চৌকো কাগজটুকুতে মোড়া রয়েছে! তার মনের মধ্যে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব সুরু হোলো। সমস্ত রাত্রি জাগরণ আর চিন্তায় তার মস্তিষ্ক এম্‌নিতেই অবসাদগ্রস্ত হয়েছিল, কান কিছু ভাব্‌বার শক্তি আর তার ছিল না। সে খামখানা পকেটে পুরে আবার সাঁওতাল-পল্লীর রাস্তা ধরে এগিয়ে চল্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে কয়েকবার খামখানাকে পকেট থেকে বের কোরে ছিঁড়ি-ছিঁড়ি কোরেও সে ছিঁড়্‌তে পারছিল না, না-জানি আবার কি আঘাত সইতে হবে!

অনেকক্ষণ লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে-ঘুরে অরুণ একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে লীলার চিঠিখানা খুলে ফেল্লে। লীলা লিখেছে—

অরুণ বাবু,—

কাল আমি যে ব্যবহার করেছি তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। এই রকম ব্যবহারের জন্য আমি নিজেই লজ্জিত হচ্ছি। আপনি আমায় যে প্রশ্ন করেছিলেন, কাল তার জবাব দিতে পারি-নি, সে প্রশ্নের জবাব দেবার মতন মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। আপনি

আমাকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আপনাতে আমাতে বিবাহ হওয়া অসম্ভব। শুধু আপনার সঙ্গে নয়, কোন ভদ্র-সন্তানের সঙ্গেই আমার বিয়ে হোতে পারে না। আমার বিষয় আপনি ভাল কোরে জানেন না, যেদিন জানবেন, সেদিন আমার সঙ্গে কখনো পরিচয় ছিল বলে বোধহয় নিজেই অনুতপ্ত হবেন। এ-কথা নির্লজ্জের মতন আপনাকে লিখ্‌তে আমার যে অন্তর্দ্দাহ হচ্ছে, তা আমার মতন অবস্থা যার না হয়েছে, সে তা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌বে না। সোনালীতে, শুধু সোনালীতে কেন, বাঙলা দেশে অনেক মেয়ে অনেক পরিবারই আপনার মতন স্বামী, আপনার মতন জামাই পেলে কৃতার্থ হবে। যদি বিকেলে পাহাড়ে বেড়াতে আসেন, তা হোলে আমার সমস্ত কথা আপনাকে বল্‌তে পারি। আপনি আমায় বন্ধু বলেছিলেন, সেই দাবীতেই এই চিঠি লিখলুম, আশা করি আমার মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা কর্‌বেন ইতি—

লীলা—

লীলার চিঠি পড়ে অরুণের মনে হোলো, এ আবার কি রহস্য! সমস্ত দিনটা আশা ও নিরাশার দোলায় দোল খেতে-খেতে তার মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। লীলা তাকে সন্ধ্যেবেলায় পাহাড়ে দেখা করবার জন্য লিখেছিল, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল কালচক্রের কোন একটা অঙ্গ কোথায় বিগ্‌ড়ে গিয়ে সময় আর কিছুতেই অগ্রসর হচ্ছে না। অনেক কষ্টে বিকেল অবধি কোন রকমে বাড়ীতে বসে থেকে সে বেরিয়ে পড়্‌ল। অনেকক্ষণ এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়িয়ে সে যখন পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছল তখনো রোদ চড়চড় কর্‌ছে। রৌদ্রতপ্ত পাথরের ওপর উপুড় হোয়ে সে লীলাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে রইলো।

লীলা যখন অরুণের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এল, তখন যদিও সূর্য্য ডুবে যায়-নি, কিন্তু রোদের ঝাঁজ তখন অনেকটা কমে এসেছে। সে এগে

দেখ্‌লে যে, পাথরের ওপর হাতে মাথা রেখে অরুণ অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে। লীলা খানিকক্ষণ তার পাশে বসে থেকে তাকে ডেকে তুল্লে। লীলার ডাক শুনে অরুণ ধড়্‌মড়্‌ কোরে উঠে পড়্‌ল।

লীলা বল্লে—আমার আস্‌তে দেরী হোয়ে গিয়েছে বোধ হয়?

অরুণ চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে উঠে বল্লে—তোমার দেরী হয়নি, আমিই বোধ হয় তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি—

তারপর আর দুজনের কারো মুখে কোন কথা নেই। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছিল, চারিদিক নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ কোরে গৃহযাত্রী কোন মহিষের গলার ঘণ্টার অতি করুণ ঠুং ঠুং শব্দ বাতাসে ভেসে আস্‌ছিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে যাবার পর অরুণ নিস্তব্ধতা ভেঙে বল্লে—লীলা তুমি কেন আমায় বিয়ে কর্‌তে পারবে না, তার কারণ বল্‌বে বলেছিলে—

লীলা বেশ দৃঢ়স্বরে বল্লে—হ্যাঁ, সেই কথাই আপনাকে বল্‌ব বলে ডেকেছিলুম।

দুই এক মিনিট চুপ্‌ কোরে থেকেই লীলা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। তার নিজের ইতিহাস, তার মার ইতিহাস, তার বাবার ইতিহাস, তার জন্মের ইতিহাস—যতটুকু তার জানা ছিল, সব অকপট ভাবে খুলে বলে যেতে লাগ্‌ল। লীলা এমন সহজ ও সোজাভাবে তাদের কথা বল্‌ছিল যে, মাঝে মাঝে অরুণ মনে কর্‌ছিল, সে বুঝি অন্য কোন পরিবারের কথা বল্‌ছে। সমস্ত কথা খুলে বলে সে বল্লে—সমাজে আমাদের স্থান নেই। আমি নিজে সামাজিক জীব নই বলে কোন সমাজভুক্ত কেউ আমায় বিয়ে কর্‌তে পারে না। মানুষের সমাজ শুধু নারীকেই দণ্ড দেবার ব্যবস্থা কোরে রেখেছে, তার অভিযোগ সেখানকার বিচারালয়ে গ্রাহ্য হয় না।

অরুণ লীলার কথাগুলো শুনে কিছুক্ষণ গুম্‌ হোয়ে বসে থেকে বল্লে

—দেখ লীলা, সমাজের এই একচোখো ব্যবস্থা আমি মানি-না। মানি না, তার কারণ এই সব সামাজিক ব্যবস্থাকে মান্‌তে হোলে মনুষ্যত্বকে মানা চলে না। আমি যে সমাজের মধ্যে মানুষ হয়েছি, সেখানকার সমাজ এখানকার চেয়ে লক্ষগুণে উদার হোলেও এ-সব বিষয়ে তাদের মতামতও ব্যবস্থা প্রায় একই রকমের। আমি বুঝতে পারি না, কেন মানুষ মানুষের জন্য এই পীড়নের ব্যবস্থা কোরে রেখেছে! সমাজের মধ্যে পুরুষ যতদিন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হোয়ে থাকবে, ততদিন স্ত্রী-পুরুষের ব্যবস্থার এই তারতম্য থাকবেই। মানুষ যতদিন মানুষ না হবে, ততদিন এই সমস্যা কিছুতেই যাবে না। লীলা আমি তোমাকে বিয়ে কোরে এদের দেখাতে চাই যে, এখানে অন্ততঃ একজন লোকও আছে যে তাদের মতন নয়। সমাজের এই বাধা সত্ত্বেও আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে তোমার কি কোন আপত্তি আছে?

লীলা অরুণের কথার কোন জবাব দিতে পারলে না। সে মাথা নীচু কোরে ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

অরুণ আবার বল্লে—বল লীলা, আমায় বিয়ে করতে তোমার কোন আপত্তি আছে?

এবার লীলা বল্লে—কেন আপনি আমায় বিয়ে কোরে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনটা ভারবহ কোরে তুলবেন।

অরুণ বল্লে—আমার জীবনের সুখ-দুঃখ সেটা সম্পূর্ণ আমার নিজের মনের ওপর নির্ভর করে। নিজের জীবনের সুখ-দুঃখ যদি অন্য কারো হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যায়, তবে সে যেমন ভাবে সেটা গ্রহণ করবে সেইটেই সুখ-দুঃখের মাপকাটি হোয়ে দাঁড়ায়। তোমাকে বিয়ে করলে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে। কারণ, আমি তোমায় ভালবাসি। সমাজ তাতে কি ভাব্‌বে বা না ভাব্‌বে তা আমি জান্‌তে চাই না।

অরুণের কথায় লীলার সমস্ত ভাবনাগুলোকে ওলোট-পালোট কোরে দিয়ে গেল। তার মনে হচ্ছিল, সংসারের সকলেই তাকে ঘৃণার চোখে দেখে না, সকলেই সমান নয়। অরুণের প্রতি মনে মনে অবিচার করেছিল বলে লীলা অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত হোতে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই নিবিড় হোয়ে তাদের দুজনের চতুর্দ্দিকে জমা হোতে লাগ্‌ল। নীল আকাশের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে অন্ধকার ঝরে ঝরে ক্রমে মাঠ, পথ সব ঢেকে ফেল্লে। সেই নিবিড় অন্ধকারে অরুণ লীলার একখানা হাত সস্নেহে নিজের হাতে তুলে নিলে, তারপর ধীরে ধীরে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার অশ্রু-সজল লবণাক্ত ঠোঁটে চুমু খেলে। লীলা একবার অরুণের বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা কর্‌লে, তারপর দু-জনে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হোলো। নিশার অন্ধকারে দুটী শঙ্কিত প্রাণ যেন একে অন্যের হৃদয়ে আশ্রয় নিলে। রাত্রির অন্ধকার নিবিড়তর হোতে লাগ্‌ল।

অরুণ ঠিক কোরে রেখেছিল যে, জাহাজে চড়বার আগে একবার আগ্রা, দিল্লী ও ভারতবর্ষের অন্য-অন্য জায়গায় যে-সব দেখ্‌বার জিনিষ আছে তা দেখে নেবে। কিন্তু দেশের কাজ সেরে সে সোনালীতে ফিরে এসে আবার জমাট হোয়ে বস্‌ল, নড়্‌বার নামও কর্‌লে না। বিলেতে রওনা হোতে তার মাসখানেক দেরী ছিল, আসল কথা, এই কটা দিনের জন্য লীলাকে ছেড়ে যেতে তার মন কিছুতেই চাইছিল না। অভাব যে সময়কে টেনে কতখানি লম্বা কোরে দিতে পারে, এই কয়েক সপ্তাহ দেশে থেকে সে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় কোরে এনেছে। বিলেতে থাকতে আগ্রার তাজমহল দেখ্‌বার জন্য তার মন চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌ত, কিন্তু এখন তার হৃদয়-যমুনার তীরে যে তাজমহল আপনিই গড়ে উঠেছিল, নিপুণ কারিগরের মতন তাকেই সে নানাভাবে সাজিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল। লীলা আর অরুণ দুজনে সেই নির্জ্জন পাহাড়টাতে বসে কত কল্পনাই কর্‌ত। সম্মুখে তাদের দীর্ঘ দুটী বৎসরের বিরহ। অরুণ যদিও মুখে বল্‌ত যে, দু-বৎসর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে, কিন্তু তার মন বল্‌ত—দু-বছর সে কত যুগ? দু-বছর কি কাট্‌বে? তারপর দু-বছর পরে যখন তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তখনকার সুখের কল্পনায় তাদের দুজনের মনেই পুলক সঞ্চারিত হোতো, সে সম্বন্ধে আর কোন কথা হোতো না, কথার দ্বার রুদ্ধ হোয়ে মৌন অন্তর মুখরিত হোয়ে উঠ্‌ত—সে ভাষায় শব্দ নাই, একসুরে বাঁধা থাক্‌লে অন্তর তা বুঝতে পারে। অরুণ বল্‌ত, ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান তারা তন্ন তন্ন কোরে ঘুরে দেখ্‌বে। কবি-সম্রাট্‌ সাজাহানের হৃদয়-ভরা প্রেম-সরোবরে যে শতদল ফুটে

উঠেছে, যার সৌরভে পৃথিবীর নিভৃততম কোনের লোকেরাও মত্ত হোয়ে ছুটে আসে—একলা কি তা উপভোগ করা যায়? বেড়ানোর কথা উঠলে অরুণের আর জ্ঞান থাকত না। আরব, মিশর; পারস্য, ইতালী, গ্রীস, ফ্রান্স, নরওয়ে কোন জায়গা তারা বাদ দেবে না। তখন তাঁদের বিপুল অবসর, পড়ার তাড়া নাই, কিছু নাই—

জাহাজে চড়বার কথা উঠলেই লীলা ভয় পেত। নীল সমুদ্রের বড় বড় দানবের মতন ঢেউগুলো জাহাজখানাকে মোচার খোলার মত নিয়ে লোফালুফি করে,—এ সব শুনে সে চঞ্চল হোয়ে উঠত, যেন এখুনি তাকে জাহাজে চড়তে হচ্ছে। লীলার ভয় পাওয়া দেখে অরুণ তাকে ঠাট্টা করত, লজ্জায় তার সুন্দর মুখ লাল হোয়ে উঠত—মুগ্ধ অরুণ সে মুখ দেখে আত্মহারা হোয়ে যেত।

দেখতে দেখতে অরুণের যাবার দিন এগিয়ে এল। তাঁদের যাবার দিন সোনালীর অনেকে তাদের ষ্টেশনে বিদায় দিতে এলেন। সোনালীর ছোট্ট ষ্টেশনে এ-রকম জন-সমাগম প্রায়ই হয় না। অরুণ তার অমায়িক ব্যবহারে এই কয়মাসের মধ্যেই সোনালীর অনেক ছেলে-মেয়েকে সখ্যতা সূত্রে বেঁধে ফেলেছিল। এই বাপ-মাহারা ছেলেটীকে বিদায় দিতে তাদের সকলের হৃদয়ই ভারাক্রান্ত হোয়ে উঠছিল। অরুণ সকলের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিলে। দেখতে দেখতে গাড়ী ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেল। বিরাজমোহিনী অনেকক্ষণ থেকে অরুণ আর সুকুমারকে গাড়ীতে উঠে বসবার জন্য টিক্‌টিক্ করছিলেন, ঘণ্টা পড়ায় তিনি ষ্টেশনশুদ্ধ লোককে শুনিয়ে বল্লেন—অরুণ, সুকুমার আর দেরী নয়, গাড়ীতে উঠে বস।

মায়ের আজ্ঞা শুনে সুকুমার আস্তে-আস্তে গাড়ীর মধ্যে গিয়ে বস্‌ল। অরুণ কিন্তু কিছুতেই গাড়ীর মধ্যে গিয়ে বস্‌তে পারছিল

না। তার উৎসুক চোখ-দুটো ষ্টেশনের একপাশ থেকে আর একপাশ পর্য্যন্ত মুহুর্মুহু ছুটোছুটি করছিল। তার খালি মনে হচ্ছিল এত লোক এল, কিন্তু কৈ লীলা তো এল না! দেখ্‌তে দেখ্‌তে দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ে গেল। বিরাজমোহিনী অরুণকে ডেকে বল্লেন—অরুণ এখনও তুমি—তাঁর কথা শেষ হবার আগেই সে টপ্‌ কোরে গাড়ীর হাতল ধরে উঠে পড়্‌ল। বিরাজ একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাদের গাড়ীর দরজাটা একেবারে আগ্‌লে দাঁড়িয়ে শেষ উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন।

লীলা অরুণকে বিদায় দিতে ষ্টেশনে আস্‌বে বলেছিল, কিন্তু ষ্টেশনে তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে তার মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠল! সে হাসি মুখে সবার সঙ্গে কথা বল্‌ছিল. সবার কথার উত্তর দিচ্ছিল বটে, কিন্তু যাবার সময় লীলাকে দেখ্‌তে না পেয়ে মনটা তার কিছুতেই স্থির হোতে পারছিল না। বিরাজমোহিনীর উপদেশগুলো—ভাজা-মসলা, আমসত্ত্ব, নারকোলের চিঁড়ে—এ-সব কথা তার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ ষ্টেশনশুদ্ধ লোককে সচকিত কোরে দিয়ে গার্ডের বাঁশী বেজে উঠ্‌ল—গাড়ী ছেড়ে দিলে।

অরুণ গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়িয়ে সোনালীকে শেষ দেখা দেখে নিতে লাগ্‌ল। সূর্য্য তখন ঠিক হাতীবসার মাথায় ওপর স্থির হোয়ে দাঁড়িয়েছে—অরুণের মনে পড়্‌ছিল, এই সন্ধ্যার সময় কতদিন সে লীলার সঙ্গে সেই পাহাড়টাতে বসে কাটিয়েছে—হঠাৎ দূরে একটা সাঁকোর গোড়ার কাছে এক রমণীমূর্ত্তি অরুণের চোখে পড়্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ীখানা সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। চকিতের মত সে দেখ্‌তে পেলে—লীলা। লীলার চোখে চোখ পড়্‌তেই সে হাত তুলে তাকে অভিবাদন করলে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে রেলগাড়ী অরুণকে লীলার

কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। দূরে—দূরে—বহুদূরে। শেষ কালে তার মূর্ত্তি অরুণের চোখের সাম্‌নেই মিলিয়ে গেল।

রেলগাড়ী ছুটে চল্‌ল—সন্ধ্যার আব্‌ছাওয়ার ভেতর দিয়ে—বনের অন্ধকারের ভেতর দিয়ে—

অমৃত কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিল না। দিব্যি হেসে-খেলে সুখে-দুঃখে সে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু কোন এক মাহেন্দ্রক্ষণে লীলার মূর্ত্তি তার অন্তরে অক্ষয় চিতার রচনা কোরে দিয়ে গেল, তার জ্বালায় সে নিশিদিন জ্বলে পুড়ে মর্‌তে লাগ্‌ল। অমৃতকে আগে কেউ বিয়ে কোরে সংসারী হোতে বল্লে, সে বল্‌ত—এম্‌নি কোরেই হেসে-খেলে জীবনটাকে ফুঁকে দেব। লোকের অগ্রাহ্যকে সে গ্রাহ্যই কর্‌ত না। সে ভাব্‌ত, তার মনের মধ্যে যে অপার আনন্দের উৎস আছে, সেটা যেদিন বন্ধ হোয়ে যাবে, সেদিন যেন তার মৃত্যু হয়। বাইরের শত্রুকে গ্রাহ্য না কর্‌লেও সে বেচারী জান্‌ত না যে, মানুষের মনের মধ্যেই হাজার শত্রু কেল্লা পেতে বসে আছে। কবে কোন সুযোগে কে আক্রমণ করে তার কোন স্থিরতা নাই। লীলার সঙ্গে তার মিলন অসম্ভব সে কথা সে তার মনকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে, ধম্‌কে-ধাম্‌কে কিছুতেই ঠিক কর্‌তে না পেরে শেষে শ্রান্ত হোয়ে পড়েছিল। ঠিক এম্‌নি সময়ে ভুবনের হাঁসপাতাল তৈরির কাজ পড়াতে সে সমস্ত ভুলে যাবার জন্য কায়মনে সেই কাজে লেগে গেল। নিজের মনকে ব্যস্ত রাখবার জন্য দিনরাত অমৃত হাঁসপাতাল নিয়ে পড়্‌ল। ইঁট পোড়ান, ছুতোর খাটান, কলকাতায় যাওয়া এই সব নানারকম কাজে সে আপনাকে ছড়িয়ে দিলে। কিন্তু সে দেখ্‌লে, যাকে ভোল্‌বার জন্য সে মনের ওপর এত জবরদস্তি কর্‌ছে, সব কাজের বোঝা ঠেলে তারই মূর্ত্তি তার মনের সাম্‌নে সর্ব্বদাই জ্বল্‌জ্বল্ কোরে ফুটে ওঠে। এই তো গেল মনের ভেতরকার শত্রুর আক্রমণ। ওদিকে বাইরের আক্রমণ, যাকে সে এতদিন আমোলা

দেয়-নি, সেগুলো এবার তাকে এমন কায়দায় বাগিয়ে ধরতে লাগল যে, তাদের আর তেমনভাবে অগ্রাহ্য কর‍্বা সম্ভব হোয়ে উঠ্‌ল না।

অমৃতর সংসার ছিল তিনজনকে নিয়ে। সে তার মা আর এক বিধবা বোন, সংসারে তারা এই তিনটী প্রাণী। কিছু দিন থেকে তার মার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়্‌ছিল। একদিন রাত-দুপুরে কোথা থেকে মড়া পুড়িয়ে বাড়ীতে ফিরে এসে সে দেখলে যে, মার ভয়ানক জ্বর। মায়ের অবস্থা দেখেই অমৃতর ভয় হোলো, সে তখুনি ডাক্তার ডেকে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলে বটে, কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারা গেল না। দিন-চারেক ভুগে সেই অসুখেই তিনি মারা গেলেন।

মার মৃত্যুর পর অমৃত সংসার অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌ল। বিধবা জরাজীর্ণ মা যে তার সংসারের কতখানি আগ্‌লে ছিলেন, এতদিনে সে তা ভালো কোরে বুঝতে পার্‌লে। মার মৃত্যুর পর আর এক মুস্কিল বাধ্‌ল—

অমৃতর বোন সুহাসিনীর বয়স যখন এগারো বছর, তখন তার বিয়ে হয়েছিল। বর্দ্ধমান জেলার একটি পিতৃমাতৃহীন ছেলে সোনালীর এক কয়লার খনিতে চাকরী করত, ঘর-জামাই করবার ইচ্ছায় অমৃতর বাবা এই ছেলেটির সঙ্গে তার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার জো কি? বিয়ের পর বছর দুই যেতে না যেতে সুহাসিনীর স্বামী নিশ্চিন্তপুরে চলে যাওয়ায় বৃদ্ধ ঈশান আবার দুর্ভাবনায় পড়্‌লেন। এই দুর্ভাবনা তাঁর মেটে-নি, যতদিন না মৃত্যু এসে তাঁর সকল ভাবনা মিটিয়ে দিয়ে যায়। মেয়ে বিধবা হবার পর ঈশানকেও বেশীদিন বাঁচতে হয়-নি, তারই বছর তিনেক পর তিনিও মারা গেলেন। অমৃতর মা বেঁচে থাকাতে এতদিন সে কোন দিকেই লক্ষ্য করে-নি। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই সোনালীর হিন্দু, ব্রাহ্ম প্রায় সকলেরই টনক্ নড়ে গেল যে— এ বড় খারাপ দেখাচ্ছে—সুহাসিনী একে যুবতী, তায় বিধবা! আর অমৃত

একে পুরুষ তায় অবিবাহিত, তায় মাতাল। হোক্ না কেন ভাই, এ অবস্থায় তাদের এক সঙ্গে থাকাটা আর ভাল দেখায় না। অবশ্য প্রতিবেশীরা সঙ্কোচেই হোক, কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, তাদের মনের কথাটা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই আলোচনা কর্‌ছিল; অমৃতকে তা জানায়-নি। একদিন অমৃতদের আপিসের একটি বৃদ্ধ কর্ম্মচারী অমৃতকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বল্লেন। ইনি অমৃতর বাবার আমোলের লোক, তাঁর সঙ্গে একত্র কাজও করেছেন। তিনি বল্লেন—সুহাসিনীকে আপাততঃ অন্যত্র কোথাও রেখে দেবার বন্দোবস্ত কর, তারপর তুমি বিয়ে কর্‌লে তাকে নিয়ে আস্‌লেই হবে। কিন্তু এ অবস্থায় তোমাদের একত্র থাকাটা লোকের চোখে বড় খারাপ দেখায়।

কথাটা শুনে অমৃতর মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। সেদিন আর সে কোন কাজ কর্‌তে পার্‌লে না। মানুষের মনের অনেক রকম পরিচয় সে এই বয়সেই পেয়েছে, কিন্তু মানুষের মন এতদূর পর্য্যন্ত নাম্‌তে পারে দেখে সে সেদিন বাস্তবিকই বিস্মিত হোয়ে গেল। কিন্তু এ বিষয়ে পরামর্শই বা সে কার সঙ্গে কর্‌বে? সুহাসিনীর সঙ্গে এই কথা নিয়ে আলোচনা করা যায় না। এই কথার পেছনে কত বড় একটা কুৎসিত ইঙ্গিত আছে, সেটা মনে পড়্‌তেই তার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ল।

ওদিকে লোকনিন্দা ক্রমে হাওয়ায় ভাস্‌তে ভাস্‌তে সুহাসিনীর কানে পৌঁছতে লাগ্‌ল। অমৃত তার মুখ দেখে সব কথাই বুঝতে পার্‌ত, সুহাসিনীও সঙ্কোচে সে-সব কথা তার কাছে খুলে কিছু বল্‌তে পার্‌ত না।

একদিন্ রাতে অমৃত খেতে বসেছে, এমন সময় সুহাসিনী বল্লে—দাদা তুমি এবার একটা বিয়ে কর।

অমৃত বল্লে—কেন রে?

—আর কতদিন এমন কোরে ভেসে ভেসে বেড়াবে, সংসারটাকে রাখ্‌তে হবে তো?

—তুই ক্ষেপেছিস্, এখন আবার বিয়ে!

—না-না, অন্ততঃ বাবার নামটা রাখ্‌তে হবে তো?

—তা হোলে তুই একটা বিয়ে কর না, কর্‌বি তো বল, আমার হাতে পাত্র আছে।

—তুমি যে কি বল দাদা—

সুহাসিনীর চোখ জলে ভরে এসেছিল, সে আর কোন কথা বল্‌তে পারলে না। সে মনে কর্‌লে, দাদাকে কেন যে সে বিয়ে কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ছে, তা বোধ হয় সে বুঝতে পার্‌ছে না; অথচ মুখ ফুটে পরিস্কার কোরে কিছু বলবার যো নেই। একটু পরে অমৃতর অলক্ষ্যে আঁচলে চোখের জল মুছে ফেলে আবার সে বল্লে—তুমি বিয়ে না কর্‌লে আমার আর এখানে থাকা চল্‌বে না—

কথাটা শুনেই অমৃতর মাথা ঘুরে গেল। সে থালা থেকে মুখ তুলে দেখ্‌লে, সুহাসিনী আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদ্‌ছে।

সুহাসিনী এতদিন পরে কেন যে আবার তাকে বিয়ে কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ছে, তার কারণটা ঠিক অনুমান কর্‌তে না পার্‌লেও সে মনে মনে একটা আন্দাজ কর্‌ছিল। তার কান্না দেখে অমৃতর সমস্ত সন্দেহ দূর হোয়ে গেল। সে তাকে বল্লে—দেখ সুশী, মার মৃত্যুর পরে তোর এখানে থাকাটা লোকের চোখে ভাল ঠেক্‌ছে না। তুই অন্য জায়গায় গিয়ে থাক্‌বি?

সুহাসিনী চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লে—কোথায় যাব? আমার শ্বশুর-বাড়ীর তিন চুলোতে তো আর কেউ নেই—

—শ্বশুরবাড়ী কেন! তুই লীলাদের ওখানে গিয়ে থাক্ না?

সুহাসিনী লীলাদের সমস্ত ইতিহাস জান্‌ত। চিরন্তন সামাজিক

সংস্কারবশতঃ সে-ও তাদের মনে মনে ঘৃণা করত! লীলা ও অমৃত সন্ধ্যার সময় এক সঙ্গে বেড়াতে আরম্ভ করায় তাদের নামে যে নিন্দার ঢেউ উঠেছিল, অমৃতর মা ও সুহাসিনীর কানে পৌছতে তা বিলম্ব হয়-নি। সংবাদটা তারা একেবারে অবিশ্বাস করতেও পারে-নি। সুহাসিনী তাদের এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়ে প্রথমে সংবাদটা পায়, কিন্তু কথাটা তার কাছে তেমন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়-নি। কিন্তু খবরটা যখন তাদের মার কানে গিয়ে পৌছল, তখন তিনি এক-তরফা ডিক্রি দিয়ে বলে দিলেন যে, ও-সব লোক না করতে পারে এমন কাজই নেই! যে নিজের বাপ-মাকে ছেড়ে বাইরের লোকের সঙ্গে চলে আসতে পারে, তার দ্বারা সবই সম্ভব। লীলা সেই রকম লোকেরই মেয়ে তো! তবে তিনি মেয়েকে এইটুকু বুঝিয়ে দিতেও কসুর করেন-নি যে, এতে অমৃতর কোনই দোষ নেই, কারণ ওরা মায়াবীর জাত, ওরা যে কোন পুরুষকে ইচ্ছা করলেই ভেড়া বানিয়ে ফেলতে পারে।

মার পেটের ভাই হোয়ে অমৃত তাকে সেই রকম লোকের বাড়ীতে রাখবার প্রস্তাব করাতে সুহাসিনী আর কান্না চেপে রাখতে পারলে না। সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—মাগো! তুমি কেন আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে গেলে না, তা হোলে আজ আমার এই খোয়ার হোতো না।

খোয়ার যে কি হোলো তা অমৃত বুঝতে পারলে না! সে একটু হতভম্ব হোয়ে বোনকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। সুহাসিনী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্লে—তুমি কি বলে আমায় ওদের ওখানে রাখবার কথা বল্লে। ও-মাগীদের কথা কে না জানে—.

সুহাসিনীর কথা শুনেই অমৃতর মাথায় চড়াৎ কোরে রক্ত চড়ে গেল। সে অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে বল্লে—চুপ কর্ সুশী, ওরা তোর-আমার ও সোনালীর অনেকের চাইতে ঢের ভাল।

সুহাসিনী মুখের কাপড়টা সরিয়ে বোধ হয় একটা কড়া রকমের জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু অমৃতর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে তার আর কোন কথা বল্‌তে সাহস হোলো না। সে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার মুখে কাপড় দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সেখান্ থেকে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল।

অমৃত যখন বিছানায় গিয়ে শুলে, তখন তার মনটা অবসাদে একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়েছে। সুহাসিনীকে সে বড় ভালবাস্‌ত। ছেলেবেলা সুহাসিনী তার ওপর কত অত্যাচার করেছে, তার কত সখের জিনিষ সে ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু কখনো সে তাকে কিছু বলে-নি। যদি কখনো সে তাকে বক্‌ত, তা হোলে সুহাসিনীর অভিমান কিছুতেই ভাঙ্‌ত না। তাকে নিয়ে কোলে কোরে ঘুরে ঘুরে, লজঞ্চুস কিনে দিয়ে, ফুটবল-খেলার মাঠে নিয়ে গিয়ে কত রকমে সে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করেছে। তারপর সেই আদরের বোন তেরো বছর বয়সে বিধবা হবার পর সে কখনো তাকে একটা কড়া কথা পর্য্যন্ত বলে-নি। আজ পিতা-মাতার অবর্ত্তমানে সে তাকে এমন কোরে ধমক দেওয়ায় তার অনুতাপ হোতে লাগ্‌ল। সে বুঝতে পারছিল সুহাসিনী তার ঘরে গিয়ে কাঁদ্‌ছে। মধ্যে মধ্যে তার কান্নার হেঁচ্‌কীর এক-একটা আওয়াজ তার বুকের মধ্যে এসে ধাক্কা দিতে লাগ্‌ল। অমৃত আর শুয়ে থাক্‌তে পার্‌ল না, সে আস্তে আস্তে উঠে সুহাসিনীর পাশে গিয়ে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লে—সুশী, রাগ করিস্ নি ভাই, আজকে আমার মেজাজটা বড় বিগ্‌ড়ে ছিল—

অমৃতর আদরের কথা শুনে তার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল। অনেক কষ্টে সে তাকে শান্ত কোরে আবার এসে নিজের বিছানায় লুটিয়ে পড়্‌ল।

বিছানায় পড়ে অমৃত ভাব্‌ছিল—কত রকম অসম্ভব অবস্থার ভেতর

দিয়ে মানুষকে বেঁচে থাক্‌তে হয়! তবু মানুষ বেঁচে থাকবার জন্য পাগল। মৃত্যুকে মানুষ এত ভয় করে কেন? মৃত্যুর পর মানুষের যদি আর কোন জীবন থাকে, তবে সেটা যে-রকমই হোক না কেন, বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তার তো আর যোগ থাক্‌বে না। তবু মানুষ বাঁচবার জন্য পাগল। মৃত্যু যে দিন তার বীভৎস চেহারা নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে অসহায় পেয়ে গলা টিপে ধরে প্রাণটুকু এই দেহ থেকে বার কোরে দেবে—সেই অবস্থাটাই মানুষ সহজে মেনে নিয়েছে। সহজে কি মেনেছে? উপায় নাই বলেই মেনেছে। পৃথিবীর সঙ্গে নিজের মনের যদি থাপ না থায়, তবে এই জীবন বন্ধন ছিঁড়ে ফেল্‌তে দোষ কি? দোষ কিছুই নেই, মর্‌তে যদি না হোতো তবে তার কথা ছিল; মর্‌তে যখন হবেই, তখন মৃত্যুকে বীরের মতন আলিঙ্গন করাই শ্রেয়। কিন্তু—কিন্তু—অমৃত আর ভাবৃতে পারছিল না। অসহায়ের মতন সে পাশ-বালিশটাকে চেপে ধরে চোখ বুঁজিয়ে পড়ে রইলো।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনটি বছর কেটে গেল, কালের বুকে অতি ক্ষীণ তিনটী বুদ্বুদের মত—। সুকুমার বি-এ পাশ কোরে দেশে ফিরে এল, কিন্তু অরুণের দেশে ফেরা হোলো না। ইউরোপের মহা-সমর আরম্ভ হওয়ায় বিলেত-প্রবাসী বাঙালী ছাত্ররা মিলে একটা দল গঠন কোরে ইংরেজ সেনাদলে প্রবেশ করেছিল। অরুণ পাশ কোরে বেরিয়ে এই দলে যোগ দিয়েছিল। কলেজ থেকে বেরিয়েই দেশে ফেরবার ষোল আনা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, বন্ধুদের উপরোধে তাকে বাঙালী সেনাদলের ডাক্তার হোয়ে রণক্ষেত্রে যেতে হোলো। রণক্ষেত্র থেকে প্রতি ডাকেই চিঠি লেখবার নিয়ম নাই। মধ্যে মধ্যে লীলা তার কাছে থেকে এক-একখানা পোষ্টকার্ড পেত। অতি সংক্ষেপে তাতে লেখা থাক্‌ত, এখনও সে জীবিত আছে।

সুকুমার দেশে এসেই নানারকম কাজে লেগে গেল। চাকরী সে কোথাও কর্‌বে না, তা আগে থাক্‌তেই ঠিক করা ছিল; তার যা বিষয় আশয় ছিল, তাতে চাকরী কর্‌বার কিছু দরকারও ছিল না, এম্‌নিতেই সে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পার্‌ত। দেশে এসেই সে সোনালীর মেয়ে-স্কুলটার সংস্কারের দিকে মন দিলে। সেখানে বাঙালী ছেলেদের জন্য যে স্কুলটা হয়েছিল, তার কর্ত্তৃপক্ষরা সুকুমারকে সেটার দিকেও একটু নজর দেবার জন্য অনুরোধ করলেন, সুকুমার এর জন্যও খাটতে আরম্ভ কর্‌লে। কয়লার খনিতে কাজ কর্‌বার জন্য সোনালীতে কয়েক হাজার কুলি থাক্‌ত, তারা ছুটি পেলেই মহুয়ার মদ খেত, আর হাল্লা কোরে বেড়াত, সুকুমার এদের এক সঙ্গে জড়ো কোরে এক একদিন বক্তৃতা দিতে লাগ্‌ল। রাত্রে

তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য সুকুমারের চেষ্টায় সেখানে একটি নৈশ-বিদ্যালয়ও খোলা হোলো। কাজ কিছু হোক্, আর নাই হোক্ বছর-খানেকের মধ্যেই অনেকগুলি কাজের গোড়াপত্তন হোয়ে গেল।

সুকুমারের অর্থ ছিল, তার ওপর সে বিলেত-ফেরত। সবার ওপরে তার মা বিরাজমোহিনীর মত মুরুব্বী তার মাথার ওপরে। দু'দিনেই তার সোনালীতে জম-জমাট নাম হোয়ে গেল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় হয় কোন চায়ের পার্টিতে, না হয় কোন সান্ধ্যভোজে, নিদেন ছেলেদের লাইব্রেরীতে কোথাও না কোথাও একটা মজলিসে তাকে দেখ্‌তে পাওয়া যেতই। বিবাহ-যোগ্য মেয়ে যাঁদের ঘরে, এই রকম অভিভাবক-মণ্ডলে একটা সাড়া পড়ে গেল। কোথাও সে একদিন নেমন্তন্ন খেতে গেলেই অন্য সবাই সন্দেহ কর্‌ত বোধ হয় তারা নিজেদের মেয়েটীর সঙ্গে সুকুমারের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করবার চেষ্টা কর্‌ছে।

সুকুমারের সর্ব্বত্র অবাধ গতি ছিল। সে সেখানকার বিবাহযোগ্যা প্রায় সমস্ত মেয়ের সঙ্গেই মেলামেশা কর্‌ত, কিন্তু বিশেষ কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়া এখনো তার হোয়ে ওঠে-নি। আসল কথা, বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হোলে কোন কোন ছেলের মন যেমন যে-কোন মেয়েকেই হৃদয় সমর্পণ কর্‌তে প্রস্তুত হোয়ে থাকে, সুকুমারের মনের অবস্থাটাও কতকটা সেই রকমের হয়েছিল। এতদিন সে এইখানকার কোন মেয়েকে বিয়ে কোরে ফেল্‌ত, কিন্তু তার মার ইচ্ছা যে তার ইচ্ছার ওপর মুগুর-হস্তে বসে আছে সে জ্ঞান সে কখনো হারায়-নি,—সে জ্ঞান হারাবার মত শক্তিও তার ছিল না। মার বজ্র-শাসনের চাপে থেকে নিজের মানসিক শক্তির বিকাশ হবার সুযোগ কখনো তার হয়-নি।

একদিন বিরাজ সুকুমারকে বল্লেন—হ্যাঁরে, সুবালাকে তোর পছন্দ হয়? সুবালা সোনালীর একটি মধ্যবিত্ত ব্রাহ্ম গৃহস্থের মেয়ে। সম্প্রতি সে বি-এ

পাশ কোরে সেখানকার মেয়েদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছিল। এই মেয়েটীর ওপর বিরাজের অনেকদিন থেকেই নজর ছিল। সুকুমার তার মার কথার কোন জবাব না দিয়ে ভাল মানুষটীর মতন জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগ্‌ল।

বিরাজমোহিনী আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে! বল্‌ না, সুবালা মেয়েটী তো ভাল, লেখাপড়াও শিখেছে।

এবার সে বল্লে—আমি কি বল্‌ব মা? তোমার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা, তোমার যখন পছন্দ হয়েছে—

বিয়ের সময় বাঙালীর ছেলেরা পিতামাতার একান্ত বাধ্য হোয়ে ওঠে বলে তাদের নামে একটা দুর্নাম শুন্‌তে পাওয়া গেলেও সুকুমারের বেলা সে কথা খাটে না। মার ইচ্ছাতেই যে তার ইচ্ছা, এর মধ্যে কোন কপটতা ছিল না; বরং এইটেই তার জীবনে সার সত্য ছিল। মার ইচ্ছাকে চিরকালই সে বিধাতার ইচ্ছা বলে মানতে বাধ্য হয়েছে, এ ক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হবার কোন বিশেষ কারণ ছিল না। মাতৃভক্তির সহস্রবার পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও সুকুমারের মুখ থেকে এই কথাগুলো শুনে বিরাজের মনটা খুসীতে ভরপূর হোয়ে উঠ্‌ল। আবার আজ নতুন কোরে তাঁর মনে হোলো, সুকুমারের মতন বাধ্য ছেলে, তার মতন ভাল ছেলে আর কারো হয় না। বিরাজ ভেতরে ভেতরে সুবালা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে লাগ্‌লেন।

দেশে ফেরবার প্রায় বছরখানেক পরে একদিন লীলাদের বাড়ীর ধার দিয়ে সাঁওতাল-পল্লীতে যেতে যেতে হঠাৎ সুকুমারের লীলাদের কথা মনে পড়্‌ল। হঠাৎ তার মনে পড়্‌ল, বাড়ীর পাশে অসহায়া সেই দুটী প্রতিবেশীনী তারা কেমন আছে? লীলাদের কথা মনে হোতেই সুকুমারের মনের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো ছবি পরে পরে ভেসে যেতে লাগ্‌ল। তাদের

কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হোতে লাগল যে, এতদিন তারা তাদের ওপর অবিচার করেছে। লীলাদের কথা নিয়ে অরুণের সঙ্গে তার বিলেতে দুই-একদিন কথাবার্তা হয়েছিল। অরুণের সঙ্গে তর্ক কোরে সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, সোনালীর যারা লীলাদের সঙ্গে মেলা মেশা বন্ধ কোরে দিয়েছে, তারা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছে। আর এই অন্যায়ের গোড়া যে তার মা, সে কথাটা অরুণ স্পষ্ট কোরে না বল্লেও ভাবে তা জানিয়ে দিয়েছিল। লীলাদের একঘরে করার মূলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার মার যে কতটা হাত ছিল সে কথা সুকুমার যতটা জানত, অরুণের ততটা জানবার সুযোগ হয়-নি। সেদিন লীলাদের চিন্তা তার মনকে এমনি আঁকড়ে ধরলে যে, কিছুতেই সে মনকে অন্য কাজে লাগাতে পারছিল না। সে নিজের বুদ্ধিতে নানাদিক দিয়ে তাদের অবস্থার কথা স্বাধীনভাবে বিচার কোরে দেখলে যে, লীলাদের ওপর সত্যই অবিচার করা হয়েছে। সুকুমারের মনে একটা সান্ত্বনা ছিল যে, লীলার জন্মবৃত্তান্তের কথা তাদের স্কুলে তার মা লিখে পাঠান-নি। এই কার্য্যটা যে কে করেছিল, বিরাজমোহিনীও তা জানতে পারেন-নি; তবে এর জন্য তিনি মোটেই দুঃখিত হন-নি। লীলা সুকুমারের বাল্য ও কৈশোরের সখী ছিল, লীলার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তার মনের মধ্যে একটা প্রবল ইচ্ছা হোতে লাগল। তাদের কথা নিয়ে বিরাজের সঙ্গে একটু আলোচনা করবার ইচ্ছা তার হচ্ছিল, কিন্তু এই চার বছরে তাদের ওপরে বিরাজের মনের ভাব যে কিছুমাত্র বদলায়-নি, তা জানবার অবসর ইতিমধ্যে সুকুমারের হয়েছিল বলে সে ঠিক করলে যে, মাকে লুকিয়েই একদিন তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

পরদিন সন্ধ্যে হবার একটু আগে সুকুমার লীলাদের বাড়ীতে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। সঙ্কোচে প্রতি পদেই তার পা জড়িয়ে আসছিল। এতদিন ও এত কাণ্ডের পরে কোন মুখ নিয়ে আবার সে তাদের বাড়ীতে

যাবে, বার-বার এই কথাটা তার মনের মধ্যে ঘা দিতে লাগ্‌ল। সুকুমার মনকে বোঝাচ্ছিল, লীলাদের ওপর যে অবিচার ও লাঞ্ছনা হয়েছে তার জন্য সে বিন্দুমাত্রও দায়ী নয়। মার আদেশে সে তাদের বাড়ীতে যাওয়া, লীলাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছিল; কিন্তু সে যে মার আদেশ—সুকুমারের মনে হোলো, তার মা এই অবিচার করেছেন বলে সোনালীর অন্য সবাই বা কেন তাদের ওপরে এই ব্যবহার করলে? এখানকার লোকগুলো কি অপদার্থ! যাব কি যাব না, কর্‌তে কর্‌তে সে লীলাদের দরজার কাছে এসে পড়্‌ল।

তখন রোদ পড়ে গিয়েছে। সুকুমার লীলাদের বাগানের বেড়ার এ-ধার থেকে দেখ্‌লে যে, বাগানের এক-জায়গায় একখানা ইজি-চেয়ার পেতে ভুবন শুয়ে রয়েছে। সুকুমার বিলেতে যাবার আগেও অনেকদিন ভুবনকে দেখে-নি, ভুবনকে দেখেই সুকুমার বুঝতে পার্‌লে যে, সে আগের চাইতে অনেক রোগা হোয়ে গিয়েছে। তার উজ্জ্বল গৌর বর্ণ আর নাই, তার স্বভাব-বিষণ্ণ মুখ যেন আরও বিষণ্ণ হোয়ে পড়েছে। ভুবনকে দূর থেকে দেখে সুকুমারের মনে কিসের একটা ধাক্কা লাগ্‌ল। সে বেড়ার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কোরে বাগানের দরজা খুলে একেবারে ভুবনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভুবন অন্যমনস্ক হোয়ে বসেছিল, সে সুকুমারের মুখের দিকে চাইতেই সুকুমার তার পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লে—আমায় বোধ হয় চিন্‌তে পাচ্ছেন না? আমি সুকুমার।

বিলেতে থেকে সুকুমারের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছিল বটে, তবু ভুবন যে তাকে চিন্‌তে পারে-নি এমন নয়। কিন্তু সুকুমার যে তার বাড়ীতে এসেছে তা সে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিল না। বিস্ময়ে অবাক হোয়ে সে খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বল্লে—সুকুমার! বস বাবা বস, কবে এলে?

ভুবনের মুখের ভাব দেখে সুকুমারও একটু অপ্রস্তুত হোয়ে পড়েছিল। বিস্ময়-বিমূঢ় ভুবনের মুখের ভাব দেখে তার মনে হোলো, বোধহয় তার আসাটা ভুবনের মনঃপূত হয়-নি; কিন্তু ভুবনের কথা শুনে সে আশ্বস্ত হোয়ে তার চেয়ারের পাশে ঘাসের ওপরেই বসে পড়ল।

সুকুমার বল্লে—এসেছি তো অনেক দিন, এসেই গোটাকতক কাজে পড়ে গিয়েছি—একেবারে নাইতে খেতে সময় পাইনে। রোজই মনে করি আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌ব, কিন্তু তা আর হোয়ে ওঠে না।

সুকুমারের আগমনে ভুবন একটু ব্যস্ত হোয়ে পড়ল। তাকে কোথায় বসাবে, কি বল্‌বে সে কিছুই ঠিক কোরে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না।

সুকুমার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার শরীর কেমন আছে? আগের চেয়ে যে ঢের রোগা হোয়ে গিয়েছেন।

—আর বাবা, আমার এখন গেলেই হয়, রোগে ভুগে-ভুগে আমার কি আর কিছু আছে—

সুকুমার একবার এদিক-ওদিক চেয়ে বল্লে—লীলা কোথায়? তাকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি-না—সে কি এখনো পড়্‌ছে?

ভুবন ক্ষীণস্বরে লীলা—বলে একবার ডাক্‌লে। কাছেই একটা মালী কাজ কর্‌ছিল, সে তাকে ডেকে বল্লে—ওরে দিদিমনিকে একবার ডেকে দে তো।

সুকুমার ভুবনকে আস্তে-আস্তে তার অসুখ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন কর্‌তে লাগ্‌ল। তারপর সে এখানে এসে কতগুলো নতুন কাজে হাত দিয়েছে তাও তাকে বল্লে। ভুবন তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌ছিল বটে, কিন্তু সে মনের মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তি ভোগ কর্‌ছিল, এমন সময়ে লীলা এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি মা?

সুকুমার দেখ্‌লে, তার সাম্‌নে লীলা এসে দাঁড়িয়েছে। তার শৈশবের

সঙ্গিনী, তাঁর কৈশোরের সহচরী সেদিনকার সেই লীলার সঙ্গে আজকের লীলার কত প্রভেদ! সেই হরিণীর মত আনন্দময়ী, চপলা আজ স্থিরা, গম্ভীরা, বিষাদ প্রতিমা। বিধাতা অযাচিত ভাবে তার ওপরে সৌন্দর্য্যরাশি ঢেলে দিয়েছেন বটে, কিন্তু কিসের অভাবে যেন সেই সৌন্দর্য্য ম্লান হোয়ে পড়েছে। লীলার দিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবতে লাগল, ভুবনের যৌবন যেন অতীতের গর্ভ থেকে উঠে এসে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলছে—কি মা?

সুকুমার কিছুক্ষণ মুগ্ধের মতন লীলার দিকে চেয়ে থেকে তাকে বল্লে—লীলা আমায় চিনতে পার?

লীলা মুখে একটু কাষ্ঠ-হাসি হেসে জবাব দিলে—চিনতে পারব না কেন? না চেনার কারণ তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, ভাল আছ তো?

ভুবন সুকুমারকে দেখে অস্থির হোয়ে পড়েছিল! সে ভাবছিল যে, এ-সময় লীলা কাছে থাকলে বড় ভাল হোতো। কিন্তু লীলার মুখে সুকুমারের কথার জবাব শুনে তার অস্থিরতা না কমে বরং বেড়েই উঠল। সে ভাবতে লাগল, লীলা যদি সুকুমারের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার কোরে ফেলে তা হোলে তাদের পক্ষে সেটা ভারি অন্যায় হবে।

সুকুমার লীলাকে বল্লে যে, তারা সেখানে একটা সমিতি করেছে। সেখানকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে, ছায়াবাজী দেখিয়ে এ-বিষয়ে তাদের চোখ ফুটিয়ে দেওয়াই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে লীলাকে সে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অনুরোধ করলে। সুকুমার বল্লে—লীলা তুমি এখানকার ভাষা জান, এখানকার অধিবাসীরা এ-সব বিষয়ে কি রকম অজ্ঞ তাও তোমার অজানা নাই, তোমাকে পেলে আমাদের খুবি সুবিধা হবে।

সুকুমারের কথা শুনে ভুবন ও লীলা দুজনেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হোয়ে রইলো। সে তাদের সঙ্গে রহস্য করছে, না তার এই আহ্বানের মধ্যে সত্যই

আন্তরিকতা আছে তা তারা দুজনের কেউ ঠিক কোরে বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না। লীলা সুকুমারকে কি জবাব দিতে গিয়ে একটু হেসে চুপ্‌ কর্‌লে। ভুবন এ-রকম অবস্থায় কখনো পড়ে-নি, এ ক্ষেত্রে তার কি বলা উচিত বা অনুচিত তাও সে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিল না। সে অসহায়ের মত ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ কোরে একবার লীলার আর একবার সুকুমারের মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌ল। লীলা কি একটা কথা বল্‌তে গিয়ে থেমে গেল দেখে ভুবন মনে কর্‌লে, বোধ হয় সে কোন কড়া কথা বল্‌তে যাচ্ছিল। ভুবন একবার মিনতি-ভরা করুণ-নেত্রে লীলার মুখের দিকে চাইলে। লীলার চোখ দুটো জ্বল্‌ জ্বল্‌ কোরে জ্বল্‌ছিল, ভুবনের চোখে চোখ পড়্‌তেই সে তার উদ্যত রসনাকে দাঁত দিয়ে চেপে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। সুকুমার আবার বল্লে—কি বল লীলা তোমার কি মত?

লীলা বল্লে—এ কাজে আর কার অমত হবে বল? কিন্তু আমার এর মধ্যে থাকা বোধ হয় সম্ভব হবে না।

—কেন? তোমার তো আর সংসারের কোন কাজ কর্‌তে হয় না, অন্য কোন বিশেষ কাজও তোমার নেই।

লীলার বুকের মধ্যে ক্রমেই কথার রাশি জমা হোয়ে সেগুলো মুখ ফুটে বেরিয়ে পড়্‌বার জন্য ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌ছিল। কিন্তু ভুবনের করুণ-দৃষ্টি তার সমস্ত বক্তব্যকে এমন বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখ্‌ছিল যে, সে আর কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপ্‌ কোরে রইলো। অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ থাকার পর সুকুমার আবার জিজ্ঞাসা করলে—কি বল লীলা?

লীলা এবার বেশ শান্তভাবে বল্লে—আমার এখন অন্য কোন কাজে মন দেওয়া অসম্ভব। মার শরীরের যে-রকম অবস্থা তাতে এ সময় তাঁকে ছেড়ে কোন কাজে লাগা আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না।

সুকুমারের কথাগুলো লীলা যে কি ভাবে গ্রহণ করেছে, সুকুমার তা

বুঝতে না পারলেও ভুবন অন্তরে-অন্তরে তা বেশ বুঝতে পারছিল। পাছে সে তার জবাবে কোন অপ্রিয় কথা বলে ফেলে এই উৎকণ্ঠায় ভুবন এতক্ষণ বড়ই অশান্তি ভোগ করছিল। কিন্তু লীলা বুদ্ধি কোরে তার নাম দিয়ে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করল দেখে সে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। লীলার কথা শেষ হোতেই ভুবন বল্লে—আমার তো বাবা শরীরের যে-রকম অবস্থা তাতে কবে আছি, কবে নেই। যে কটা দিন বেঁচে আছি, লীলা সর্ব্বদাই আমার চোখের ওপর থাকে এই আমার ইচ্ছা।

সুকুমারদের সমিতিতে যোগ না দেবার যে কারণ ভুবন তাকে বল্লে সেটা সুকুমারের ঠিক বলে মনে হোলো না! কিন্তু কারণ যতই বেমানান হোক্ না কেন, লীলা যে তাদের সমিতিতে যোগ দিতে অনিচ্ছুক সুকুমার তা স্পষ্টই বুঝতে পারলে। এই অনিচ্ছার গোড়ার কথাটাও সে একরকম অনুমান কোরে নিলে। সে আর সে সম্বন্ধে কোন কথা না পেড়ে অন্য কথা তুল্লে।

লীলাদের বাড়ী থেকে ফিরে এসে সেদিন সুকুমারের মন বড়ই বিক্ষিপ্ত হোয়ে পড়ল। ছেলেবেলায় যারা বন্ধু থাকে, তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রথমে তত কষ্ট হয় না, যত কষ্ট হয় বহুকাল পরে আবার যখন দেখা হয়। বিচ্ছেদের বেদনা তখনই বিশেষ কোরে অনুভব করা যায়, যখন বুঝতে পারা যায় যে, বন্ধু আর সে বন্ধু নেই; তার মনের ভাব আর নিজের মনের ভাবে অনেক বদল হোয়ে গেছে, দুজনে ভিন্ন ভাবের ভাবুক—ভিন্ন পথের পথিক।

লীলা যে এত বদলে যেতে পারে—সেই হাস্যমুখরা, চঞ্চলা কিশোরী! আজ পরিপূর্ণ যৌবন তার দেহের কানায় কানায় ঢলঢল্ করছে। লীলা যে এত সুন্দরী, তা এমনভাবে কোন দিন তার চোখে ধরা পড়ে-নি। সুকুমারের মনে হচ্ছেল যে, তার গাম্ভীর্য্য আর বিষণ্ণতা তার সৌন্দর্য্যকে যেন আরও সুমধুর কোরে তুলেছে।

বিছানায় পড়ে পড়ে কিছুতেই স্নুকুমারের ঘুম আস্‌ছিল না। সে নিজেই আশ্চর্য্য হোয়ে যাচ্ছিল যে, এতদিন পরে লীলার চিন্তা তাকে এমন কোরে আঁকড়ে ধর্‌ল কেন? লীলার কথার মধ্যে যে একটুখানি খোঁচা ছিল তার জ্বালাও সে ভুলতে পার্‌ছিল না। তার কথাগুলো নিয়ে সে মনের মধ্যে যতই আলোচনা কর্‌ছিল, ততই সে বুঝতে পার্‌ছিল যে, লীলার মতন অবস্থায় পড়্‌লে হয়তো সে তার চেয়েও ঢের বেশী কথা শুনিয়ে দিত। লীলার অবস্থার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সহানুভূতিতে তার হৃদয় ব্যথিত হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, মনে পড়্‌ল যে, তার মা-ই তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী। তার মার সঙ্গে প্রথম যেদিন সে ভুবনের বাড়ীতে যায়, সেদিনের কথা তার মনে পড়্‌তে লাগল। কত ধীর, কত নম্র সেই মহিলাটী—আজও পর্য্যন্ত তার সেই স্বভাবের কিছুই তো ব্যতিক্রম হয়-নি। জীবনে সে ভুল করেছে—কিন্তু মানুষ তো সারাজীবন ধরে কত ভুলই করে, মানুষ তার বিচার কর্‌বার কে? এ অবস্থায় তারই ওপরে শুধু এই দণ্ড কেন দেওয়া হোলো? স্নুকুমার তার মার ব্যবহারটা কিছুতেই ভালভাবে নিতে পার্‌ছিল না। এতদিন পরে জীবনে এই প্রথম সে মার ব্যবহারের বিচার করলে! বিচার কোরে দেখলে যে, এ-ক্ষেত্রে তার মা ষোল আনাই অন্যায় করেছেন। ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মার ওপর রাগ হোতে লাগ্‌ল। কিন্তু তখুনি আবার তার মনে হোলো—মা যে অন্যায়ই করুন না কেন, সে যে মা; মা—মা। আবার তখুনি মনের এক কোন দিয়ে লীলার সুন্দর মুখখানা উঁকি দিতে লাগ্‌ল। মনটাকে কোন দিক দিয়ে স্থির কর্‌তে না পেরে শেষকালে সে ভাবনার কোলেই আত্মসমর্পণ কোরে ভেসে চল্‌ল।

গোলাবৃষ্টির মধ্যে থেকে একজন আহত সেনানীকে উদ্ধার কর্‌তে গিয়ে অরুণ নিজে আহত হোয়ে আজ ক-দিন থেকে হাঁসপাতালে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে তার জ্ঞান হয়, সে চোখ চায় বটে, কিন্তু সে কি রকম একটা শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চায়, কোন কথা বলে না। অরুণকে সাধারণ সৈন্যদের হাঁসপাতালে রাখা হয়-নি। সে নিজে ডাক্তার, সামরিক উচ্চ কর্ম্মচারীদের হাঁসপাতালে তাকে রাখা হয়েছে। তার ওপর নিজের প্রাণ তুচ্ছ কোরে একজন উচ্চ-কর্ম্মচারীকে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে থেকে তুলে আনার জন্য তাকে সমর বিভাগের সর্ব্বপ্রধান পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মাথায় আঘাত পেয়ে অরুণের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হোয়ে গিয়েছিল; শুধু তাই নয়, তার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপই হোতে চলেছিল। প্রায় চারদিন একভাবে কাট্‌বার পর একদিন ভোর বেলা অরুণের জ্ঞানসঞ্চার হোলো। ডাক্তার ও যারা তার পরিচর্য্যা কর্‌ছিল, তারা দেখ্‌লে যে, জ্ঞান হয়েছে বটে, কিন্তু রুগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন; কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার ইহলোকের লীলাখেলা শেষ হোয়ে যেতে পারে। ডাক্তার একজন নার্সকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে কি বলে চলে গেলেন। নার্স ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে অরুণের কাছে ফিরে এল। সে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ডাক্তার তোমার কে আছে?

অরুণ তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ উদাস-দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে চোখ বন্ধ কোরে ফেল্লে। তার মুখের ভাব দেখে মনে হোলো, যেন সে নার্সের কথা বুঝতে পারে-নি। কিছুক্ষণ পরে আবার সে চোখ খুলতেই নার্স তাকে

জিজ্ঞাসা করলে—ডাক্তার, তোমার নিকটতম আত্মীয় কে আছেন—যাঁকে আমরা তোমার অবস্থার কথা জানাতে পারি ?—

প্রশ্ন শুনে অরুণের চোখ আবার বন্ধ হোয়ে গেল। তার দুই গাল দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। অতি ক্ষীণস্বরে সে উত্তর দিলে—ইহলোকে আমার কেউ নাই।

—কেউ নাই! বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, বন্ধু ?—কেউ নাই! তোমার যদি এখানে মৃত্যু হয়, তবে সে কথা জানাতে পারি এমন কেউ তোমার নাই!

অরুণ হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিলে—আপনারা একজনকে আমার কথা জানাতে পারেন—

অরুণ নিজের বুকের কাছে হাত দিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। তাকে সেই রকম করতে দেখে নার্স সেখান থেকে সরে গিয়ে একখানা ছবি এনে তার হাতে দিয়ে বল্লে—ডাক্তার, তোমাকে যখন আহত অবস্থায় এখানে আনা হয়, তখন তোমার জামার পকেটে এই ছবিখানা ছিল।

অরুণ আগ্রহের সঙ্গে ফোটোখানা নার্সের হাত থেকে নিয়ে দেখতে লাগল। তারপর সেখানা তার হাতে ফিরিয়ে দিলে। ফোটোর পেছনে ঠিকানা লেখা ছিল, সে নার্সকে বল্লে—আমার অবস্থার কথা একে লিখে জানাতে পারেন, আর ছবিখানাও তার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, পেছনে ঠিকানা লেখা আছে। দেখবেন, এটা যেন নষ্ট না হয়, অনেক কষ্টে আমি ও খানাকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

আবার তার কথাগুলো এলোমেলো হোয়ে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সে সংজ্ঞাহীন হোয়ে পড়ল।

অরুণ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হোয়ে হাঁসপাতালে পড়ে আছে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্রে খবরটা প্রকাশ হওয়া-মাত্র

সুকুমারের উদ্যোগে সোনালীতে এক সভা আহূত এবং সভা থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাকে তার করা হোলো। সোনালীর অনেকেই অরুণকে চিন্‌ত, যারা না চিন্‌ত, তারা অন্ততঃ তাকে দেখেছে। তার ওপর একজন বাঙালীর ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন বীরত্ব দেখিয়েছে বলে দেশের সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোয়ে উঠ্‌ল। সোনালীর সকলেই অরুণের কথা নিয়ে গর্ব্ব করতে লাগ্‌ল। কিন্তু সহরের একপ্রান্তে একখানা নির্জ্জন বাড়ীর মধ্যে দুটী নারী-হৃদয় এ সংবাদে কি রকম বিক্ষুব্ধ হোয়ে উঠ্‌ল, সে সংবাদ কেউ পেলে না।

কিছুদিন থেকেই লীলার মনে হচ্ছিল কি যেন একটা শক্তি তাদের দু-জনকে দু-জনের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অরুণের কথা, ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে করতে প্রায়ই তার মনে হোতো, হঠাৎ একদিন এই স্বপ্নজাল হয়তো কিসের ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হোয়ে যাবে। নানারকম ভাবনা ও কল্পনা তার মাথার মধ্যে এসে ভিড়্ করত —এক-একটি চিন্তা এক-একটি সমস্যা। ভেবে ভেবে সে একটি সমস্যাও পূরণ করতে পারত না।

সে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছিল যে, তার মা দিনে দিনে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে, কোন দিন অতর্কিতে মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করবে—সে যে কোনও দিনই হোতে পারে—আজ, কাল, পরশু—যে কোন দিন। তার পর ইহজীবনের মতন মা বলে ডাকা শেষ হোয়ে যাবে। মার মৃত্যুর পর সে কোথায় যাবে? তাকে কি এই জনশূন্য বাড়ীতে প্রেতের মতন একলা ঘুরে বেড়াতে হবে? আত্মা যদি অমর হয়, মৃত্যুর পর হয়তো তার মা বাবা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসবেন—কিন্তু সে সান্ত্বনায় লাভ কি? দেহী ও বিদেহীর মধ্যে যে স্থূল যবনিকার অন্তরাল রয়েছে, তা ভেদ কোরে কি সে বাবা-মাকে দেখ্‌তে পাবে? তবে কি সমস্ত জীবন ধরে এই অন্তর্দ্দাহ ভোগ

কর্‌তে হবে? না না তা সে কখনো পার্‌বে না। কখনো কখনো তার মনে হয়েছে, মার মৃত্যুর আগেই যদি তার মরণ হয় তো সে বেঁচে যায়। ভগবান নারীকে এমন অসহায় করেছেন যে, পুরুষের আশ্রয় ছাড়া তার আর উপায় নেই! এখানকার উদার, অনুদার সমস্ত সম্প্রদায়েরই একই ব্যবস্থা। যারা অনুদার, তারা একদিক দিয়ে ভাল, কারণ তারা স্পষ্টই বলে যে, নারীকে শাসনে রাখাই তাদের ধর্ম্ম! কিন্তু যারা উদার, যারা সর্ব্বদা অন্য সমাজের ব্যবস্থার নিন্দা করে তাদের ব্যবহারেও তো সেই পুরোনো ধারাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের ওপরেই তার বিশ্বাস শিথিল হোয়ে আস্‌ছিল। ঈশ্বর যে দয়াময়, সে বিশ্বাস তার বহুদিন আগেই ঘুচে গিয়েছিল, ক্রমে সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হোয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে ভাব্‌ত, মানুষের যখন সমস্ত আশার প্রদীপ নিভে যায়, যখন সে আর কোন দিক দিয়েই কূল পায় না, মানুষের অবসন্ন মন যখন একটা কিছু অবলম্বনের জন্য হা-হুতাশ কর্‌তে থাকে—ঈশ্বর মানুষের মনের সেই বিকৃত অবস্থার অতি-বিকৃত একটা কল্পনা মাত্র। যার যেমন কল্পনা, সে নিজের মনে সেই রকম ঈশ্বর গড়ে নেয়, কেউ সাকার, কেউ বা নিরাকার।

দিন কতক অসহ্য গরমের পর কাল রাত্রি থেকে অঝোরে বাদল নেমেছে। সকাল বেলা লীলা তার ঘরের একটা জানলা খুলে দিয়ে বাইরের জগতটা দেখ্‌ছিল। কদিন থেকে বৃষ্টির তোড়জোড় চল্‌ছিল বটে, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল না, আজ যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। যতদূর চোখ যায়—একেবারে সেই হাতীবসা পাহাড় পর্য্যন্ত আকাশ অন্ধকার। দূরের পাহাড়-গুলোকে দেখাচ্ছিল, ঠিক যেন আকাশ থেকেই খানিকটা কোরে অন্ধকারের চাপ পৃথিবীর ওপর খসে পড়ে গিয়েছে। বর্ষার উদ্দাম নৃত্য আর তার পায়ের নূপুরের আওয়াজ—যেন পৃথিবীতে মেঘ আর মল্লারের জল্‌সা চলেছে। থেকে থেকে কালো আকাশের এপার ওপার চিরে দামিনীর বিকাশ!

অসতর্ক সুন্দরীর লীলায়িত নৃত্যভঙ্গীর মাঝে মাঝে যেমন ওড়নার ফাঁক দিয়ে কাঁচুলী ও নীবি-বন্ধনের মধ্যেকার অনাবৃত স্থানটুকু প্রকাশ হোয়ে দর্শকদের চোখকে মুহূর্ত্তের জন্ম ধাঁধিয়ে দেয়, বর্ষাসুন্দরীর কালো কষ্টি-পাথরের মতন সেই ওড়নার ফাঁক দিয়ে মধ্যে মধ্যে তেম্‌নি তার দেহের রং ফুটে বেরিয়ে পড়ছিল। সেদিন বর্ষাসুন্দরীর আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না, নিজের খেলায় নিজেই সে মাতোয়ারা—এই খেলার খেয়ালে এখুনি যেন পৃথিবীকে সে চুর কোরে দিতে পারে।

বর্ষার নূপুরের ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনতে শুনতে লীলা একমনে তার জীবনের কথা আলোচনা কর্‌ছিল। জীবন তার ঘটনাবহুল নয়, জীবনে তার বৈচিত্র্যও কিছু নেই, একাধারে এতদিন কেটে গিয়েছে। তার জীবনের যা চরম দুঃখ, তার জন্ম সে নিজে দায়ী নয়, তার বাপ-মা, সমাজ সেজন্ম দায়ী। সমাজের এই সনাতন-মার্কা তার দেহের ওপর মারা না থাকা সত্ত্বেও, সমস্ত লোকের এই ঘৃনিতা অবমানিতাকে যে ভালবেসেছিল, যার সংস্পর্শে এসে জীবন, তার মধুময় হোয়ে উঠেছিল, অন্ধকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছিল সে আজ কোথায়? বিদেশে রণক্ষেত্রের কোন হাঁসপাতালে তার মুমূর্ষু প্রাণটুকু ইহলোক থেকে বিদায় নেবার জন্ম ধুক্‌ধুক্ কর্‌ছে। সে কি বাঁচ্‌বে? লীলার গাল বেয়ে দু-ফোঁটা অশ্রু বুকের ওপর গড়িয়ে পড়্‌ল।

নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তাকে নিয়ে খেলাতে খেলাতে আবার কোন দুঃখের সাগরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে! এইতো সবেমাত্র সে জীবনযাত্রার পথে পা বাড়িয়েছে, এখনও তার মা বেঁচে আছেন। এখনই তাকে যে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হচ্ছে, না জানি জীবনপথে চল্‌তে চলতে তাকে কত যন্ত্রণাই পেতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তেই যদি জীবনবন্ধ ছিন্ন হোয়ে যায়—। লীলা অন্তরের সঙ্গে বল্‌তে লাগ্‌ল—প্রভু সত্যই যদি তুমি থাক, তবে আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমায় রক্ষা কর—

সংবাদপত্রে যথাসময়ে মৃতদের তালিকায় অরুণের নাম প্রকাশিত হোলো। সোনালীতে মহা ধুম কোরে অরুণের স্মৃতিসভা হোলো। ঠিক হোলো যে, অরুণের নামে সেখানে শ্রমজীবীদের জন্ত একটি নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হবে। দিনকতক খুব হৈ-চৈ হবার পর আবার সব স্থির হোয়ে গেল। সংসার থেকে যারা চলে যায়, তাদের নাম কোরে লোকে দিনকতকই হৈ-চৈ করে, তারপর আর তাদের নামই কেউ করে না। অরুণ বাইরের লোক, তার নামে সোনালীর লোকেরা যা করলে তাই যথেষ্ট।

অরুণের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ভুবন সেই যে বিছানায় গিয়ে পড়েছিল আর উঠে-নি। ভুবন তার সমস্ত জীবনের বিনিময়ে বুঝতে পেরেছিল যে, মানুষের শক্তি কিছুই নাই। মানুষের শক্তির একমাত্র পরিচয় সে জীবনে যতটুকু পেয়েছিল, তাতে সে বুঝতে পেরেছিল যে, তারা সংঘবদ্ধ হোয়ে দুর্ব্বলকে পীড়ন করতে পারে মাত্র। এই তাদের স্বভাব, তাই তাদের মিলিত শক্তি স্বভাবতঃই এই দিকে ছুটে চলে। সমস্ত জীবনব্যাপী দুঃখ, পীড়ন ও অত্যাচারের কণ্টকময় পথ দিয়ে চলতে চলতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তার ধারণা হোয়ে গিয়েছিল যে, পীড়ন-নীতিই জগতের প্রবলতম নীতি; তাই এই নীতি সমস্ত জগতের ওপর রাজত্ব করছে। শুধু মানুষ নয়, মানুষের শক্তির বাইরে যে মহাশক্তি সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করছে তার মধ্যেও তো পীড়নের অভাব নাই। এই পীড়নের বিরুদ্ধে সে মনে মনে কতবার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, কিন্তু বার-বার পরাজিত হোয়ে শেষে সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। মানুষের এই শক্তির নেশা, অহমিকার নেশা যতদিন

না দূর হবে ততদিন দুর্ব্বল যে, সে পীড়িত হবেই, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা বৃথা। এই মহাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ কোরে ভুবন জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল। তার অভাব ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র অভাব তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছিল। লীলার ভবিষ্যৎ-চিন্তায় যখন সে আকুল তখন অরুণ এসে লীলাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করায় সে নিশ্চিন্ত হোয়ে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু সে দেখলে, নিশ্চিন্ত হওয়া তার ভাগ্যে নাই, মৃত্যুর দিন অবধি তাকে সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

অরুণার মৃত্যুসংবাদ ভুবনের অন্তরকে যতই বিক্ষুব্ধ করুক না কেন বাইরে তার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না। সেদিন থেকে তার রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলতে লাগল। সমস্ত দিন সে চোখ বন্ধ কোরেই থাকত, কথাবার্ত্তা প্রায়ই বলত না, মাঝে মাঝে এক-একবার চোখ চাইত। তার অন্তরে যে কতবড় ঝড় চলেছে, সেটা তার বাইরের শান্ত ভাব দেখেই বুঝতে পারা যেত। ডাক্তারেরা বলে দিয়েছিলেন যে, এই শোয়াই তার শেষ শোয়া, তবে মৃত্যু কতদিনের মধ্যে আসবে তা ঠিক কোরে বলা যায় না। ছ-মাসেও হোতে পারে, আবার দু-বছরও এই অবস্থাতে কাটতে পারে, কিন্তু সে আর উত্থানশক্তি ফিরে পাবে না।

ভুবনের অবস্থা চিকিৎসকেরা যতটা জানতেন, ভুবন নিজে তার চেয়ে কিছু কম জানত না। সে বুঝতে পারছিল, এতদিন যার জন্য অপেক্ষা কোরে সে বসেছিল, তিল তিল কোরে অগ্রসর হোতে হোতে সে একেবারে তার মুখের কাছে এগিয়ে এসেছে। মৃত্যু চিরদিনই তার মনের সামনে একটা রঙিন স্বপ্নের মতন ছিল। কি কারণে জানা যায় না, তার বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর আবার সে সুবোধের সঙ্গে মিলিত হবে, সেজন্য মৃত্যুকে সে বরণই কোরে নিয়েছিল। কিন্তু সুবোধ তার ওপর যে ভার দিয়ে গিয়েছিল, তা শেষ কোরে যেতে পারলে না বলে একটা দুঃখ

নিয়েই তাকে এখান থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল। কিন্তু জীবনে সে যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তাতে সে বেশ জান্‌তে পেরেছে যে, মানুষের কিছু করবার সাধ্য নাই। সমস্ত জীবনে সে যত রকম অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে সবাইকেই সে শান্তভাবে গ্রহণ করেছে। সুবোধ তাকে বলে দিয়েছিল, জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার প্রধান অস্ত্র এই, যে-রকম অবস্থাই হোক না কেন, বীরের মতন তাকে গ্রহণ কর্‌বে। মানুষ যে মৃত্যুকে পরম শত্রু বলে মনে করে, সেই মৃত্যুকে পর্য্যন্ত যে আদরে বরণ কোরে নিতে পারে পৃথিবীতে হার্‌তে হার্‌তেও সে জিতে যায়। সুবোধের এই উপদেশ পাথরে লোহার দাগের মতন চিরকাল ধরে তার মনে দাগা রয়েছে। এতদিন তো সে সেই উপদেশই মেনে চলেছে, কিন্তু—বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভুবনের খালি মনে হোতো, জীবনযুদ্ধে হেরে হেরে সে কি জিত্‌তে পেরেছে? মাঝে মাঝে তার মনে হোতো, জেতবার আশা মনের মধ্যে থেকে উপ্‌ড়ে না ফেল্লে সুখ কিংবা দুঃখ মানুষের মনকে অভিভূত কর্‌বেই—কিন্তু এখন আর সে চিন্তারও অবসর নাই, মৃত্যু এসে পড়েছে—ধীরে, অতি ধীরে, সন্তর্পণে, চোরের মতন—

সেদিন সকাল থেকে ভুবনের বুকের যন্ত্রণাটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের হোতে আরম্ভ হয়েছিল, থেকে থেকে তার দম বন্ধ হোয়ে আস্‌ছিল। ডাক্তারেরা আজ খুব সাবধানে থাকৃতে বলে গিয়েছিলেন, হয়তো আজই মৃত্যু হোতে পারে। সমস্ত দিন কষ্ট ভোগ করার পর বিকেলের দিকে ভুবনের নিশ্বাসটা অনেক সরল হোয়ে আসাতে বুকের যন্ত্রণা কমে এল। এ-কয়দিন অমৃত দিনরাত ভুবনের কাছে বসে আছে। নিজের মার সেবা সে মনের মতন কোরে কর্‌বার অবসর পায়-নি বলে তার একটা দুঃখ ছিল। সে মনেই কর্‌তে পারে-নি যে, তার মা অত শীগ্‌গীর মারা যাবেন। ভুবনকেও সে প্রায় মার মতনই ভালবাস্‌তো, তার কষ্ট দেখে অমৃত বড় কাতর হোয়ে পড়েছিল।

ভুবনের অবস্থা দেখে আজ দু-তিন দিন থেকে লীলা বড় অস্থির হোয়ে পড়েছিল। অমৃত লীলার এই অস্থিরতা দেখে একটু চিন্তিত হোয়ে পড়্ল। অমৃত ও লীলা দুজনেই ভুবনের শরীরের অবস্থা জানৃত, তারা জানৃত যে, যে-কোন দিন হঠাৎ ভুবনের মৃত্যু হোতে পারে। শুধু তারা নয়, তাদের বাড়ীর চাকর-বাকরেরা পর্য্যন্ত এ-কথা জানৃত। ভুবনের মৃত্যুর কথা নিয়ে লীলা কত সময় অমৃতর সঙ্গে আলোচনা পর্য্যন্ত করেছে। রাত্রিদিন এই মৃত্যুর কথা শুনে আর সেই কথা আলোচনা কোরে মার মৃত্যুটা লীলার কাছে সহজ ব্যাপার হোয়ে এসেছিল। ভুবনের এই অবস্থা দেখে লীলা যে এতটা অস্থির হোয়ে পড়্বে অমৃত তা ভাবৃতেই পারে-নি। লীলাকে দেখে অমৃত ভাব্লে, তবু এখনো তার মার মরণ হয় নি, ভুবনের মৃত্যুর পরে না জানি সে কি রকম অস্থির হোয়ে পড়্বে।

লীলা এই কয়দিন দিনরাত ভেবেছ—খালি ভেবেছ। চিন্তার সীমা নাই; সমস্যার সমাধান নাই। মার মৃত্যুতে তার যে কি হবে? জগতে আজ পর্য্যন্ত যত লোকের মা মরেছে, বোধ হয় তার মত অসহায় অবস্থায় কেউ তার সন্তানকে ফেলে যায়-নি। মার মৃত্যুর পর সে কোথায় যাবে? এই ভাবনা ক্রমে তার আসন্ন মাতৃবিচ্ছেদের দুঃখকে গ্রাস কোরে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। কদিন থেকে শয়নে-স্বপনে এই উৎকণ্ঠা লীলাকে একটু একটু কোরে দগ্ধ কর্‌ছিল। অনেক চিন্তার পর লীলা স্থির করেছিল, —মার মৃত্যুর পর তাকে যে অবস্থায় পড়্তে হবে তার চেয়ে মৃত্যুই মঙ্গল। অনেক চিন্তার পর সে স্থির কর্‌লে, মার মৃত্যুর পরেই হোক্, কিংবা আগেই হোক্ আত্মহত্যা কোরে সমস্ত চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার পাবে। বাঁচা কিসের জন্য? তার দ্বারা এ জগতের কি কাজ হবে? লোকের পীড়ন কর্‌বার, নিন্দা কর্‌বার একটা উপলক্ষ-মাত্র হোয়ে বেঁচে থাকা—না না তার দ্বারা সে হবে না। তার চেয়ে সাদরে মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়।

তার বাবা যে পথে গিয়েছে, অরুণ যে পথে গিয়েছে—আজ তার মা যে পথের পাত্রী।

মৃত্যুর চিন্তা লীলাকে যতই আঁকড়ে ধর্‌ছিল, মুক্তির আনন্দে তার মর্ম ততই হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। মৃত্যু তো স্থির, কিন্তু কি ভাবে, কোথায় কি উপায়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌বে তাই নিয়ে সে একটু চিন্তিত হোয়ে পড়্‌ল। বাড়ীতে বিষ খেয়ে মরে থাকা হবে না, কারণ যারা তাকে ঘৃণা করে তারাই হয়তো তার দেহটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌বে। তার এই সুন্দর দেহ মৃত্যুর আঘাতে কি রকম বিকৃত হোয়ে যাবে,—এই দেহটাকে দেখে তারা কত কথাই বল্‌বে? কেন, তাদের সে সুযোগ দেবার দরকার কি? অরুণের সঙ্গে যেখানে তার পরিচয় হয়েছিল, সেই খানে গিয়ে বিষ খেয়ে মরবার একটা ইচ্ছা তার মনের মধ্যে থেকে থেকে উঁকি মার্‌ছিল! কিছুক্ষণ সেই পাহাড়টার কথা ভাব্‌তেই সে যেন শুন্‌তে লাগ্‌ল, সেই নীরস পাথরগুলো তাকে ডাক্‌ছে—এস, এস এইখানে চলে এস, আমরা নীরস নই, আমাদেরই বুক ফুঁড়ে যে ধারা প্রবাহিত হয় পৃথিবী সেই নীরে পুষ্ট। লীলার মনের মধ্যে কে যেন বল্‌তে লাগ্‌ল অরুণ যেন তাকে নিয়ে যাবার জন্য সেই বড় পাথরখানার ধারে তেমনি ভাবে এসে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে। একটা দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা তাকে সেই পাহাড়টার দিকে টেনে নিয়ে চল্‌ল। কিছুদূর যাবার পর লীলার মনে পড়্‌ল—বাড়ীতে তার মার অবস্থা, হয়তো এখুনি তাকে দরকার হোতে পারে। কথাটা মনে হওয়া-মাত্র সে সেখান থেকে ফিরে বাড়ীর দিকে ছুটে চল্‌ল।

লীলার মনে কয়েকদিন থেকে যে অবসাদ এসেছিল, আত্মহত্যা কর্‌বার কল্পনা মাথায় আস্‌তেই তার সমস্ত অবসাদ দূর হোয়ে গেল। মার ঘরে ঢুক্‌তে প্রতিবারই তার বুকের মধ্যে ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌ত, মনে হোতো

না জানি এবার গিয়ে কি দেখ্‌তে হবে? আজ কিন্তু সে ভরা বুক নিয়ে মার খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অমৃত খাটের ওপরে বসে ভুবনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, সে ইসারায় তাকে জানালে —এখন একটু ভাল বলে মনে হচ্ছে।

ভুবন চোখ বুঁজিয়ে স্থির হোয়ে পড়েছিল; সে ঘুমুচ্ছে কিনা তা বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। লীলা খাটের ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে মার দিকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। সেই নিস্পন্দ স্থির দেহখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার যে কত কথা মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল তার অন্ত নাই। মার শরীর দিনে দিনে যে ভেঙে পড়্‌ছে লীলা তা লক্ষ্য করত, তাই নিয়ে মায়েতে-মেয়েতে কত কথা কাটাকাটি, অভিমান, রাগারাগি পর্য্যন্ত হোয়ে গিয়েছে। কিন্তু মার চেহারা এত খারাপ হোয়ে গিয়েছে তা লীলার চোখে এমন কোরে কখনো ধরা পড়ে-নি। ভুবনের দিকে চেয়ে থাকৃতে থাকৃতে তার হৃদয় মথিত হোয়ে চোখের কোন জলে ভরে উঠ্‌ল। সে ঘাড় নীচু কোরে ভুবনের শুষ্ক অধরোষ্ঠে চুমু খেয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভুবন চুপ্‌ কোরে আবিষ্টের মত পড়েছিল। ঘরের মধ্যে সে আর অমৃত ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। ঘরের দেওয়ালে একটা ঘড়ি টাঙান ছিল, সেইটার টক্‌ টক্‌ আওয়াজ ও মধ্যে মধ্যে ভুবনের দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ ভুবন অতি ক্ষীণস্বরে—লীলা, বলে ডেকে একবার চোখ চাইলে।

অমৃত বল্লে —কিছু দরকার আছে মাসীমা, লীলাকে ডেকে দেব?

ভুবন একবার মাথাটা ঘুরিয়ে অমৃতকে দেখে আবার চোখ বুঁজিয়ে ফেল্লে। অমৃত আস্তে ভুবনের চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে দিতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটবার পরে ভুবন বল্লে—অমৃত,

এখনো বসে আছিস্ বাবা !—গেল-জন্মে নিশ্চয় তুই আমার বাবা ছিলি। নইলে কোথাকার কে তুই—তোর ঋণ এ-জন্মে আর শোধ করা হোলো না—

ভুবনের কথাগুলো শুনে অমৃতের কান্না ঠেলে আসতে লাগ্ল। কোন রকমে সে কান্নাটাকে গিলে ফেলে বল্লে—কেন মাসীমা, তুমি ও সব কথা বল্ছ? বরং আমিই তোমার ঋণ শুধ্তে পারলুম না। আমার মতন লক্ষ্মীছাড়া যাকে কেউ বাড়ীর দরজা মাড়াতে দেয় না, যাকে লোকে আস্তাকুড়ের সামিল জ্ঞান করে, তাকে তুমি বুকে স্থান দিয়েছ। আমার জন্য তুমি সহায়হীন হয়েছ। কোথাকার কে তুমি—কোথায় ছিলে, মায়ের মত আমার সমস্ত হৃদয়খানা জুড়ে বসেছ। ঋণের কথা বল্ছ মাসীমা, আমার কাছে যদি তোমার ঋণই থাকে, তবে ছেলের ঋণ আর কোন মায়ে শোধ করে?

ভুবনের দুই গাল দিয়ে জল গড়িয়ে বালিস ভেসে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ চুপ্ কোরে পড়ে থেকে অতি ক্ষীণ কান্নার সুরে সে বল্তে লাগ্ল—আবার যদি কখনো জন্ম হয়, আবার যদি আমায় এই পৃথিবীতে আস্তে হয়—ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা, যেন তুই আমার ছেলে হোয়ে আসিস্। তোর যেমন সুন্দর হৃদয় সেই রকম সুন্দর তুই দেখ্তে হবি, আমি তোকে মনের মতন কোরে সাজিয়ে রাখ্ব—আমার ছেলে হয়-নি, ছেলের সাধ আমার মেটে-নি বাবা—

অমৃত বল্লে—মাসীমা আমি ঈশ্বর মানি না। তবুও যে শক্তি আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তার কাছে কখনো কোন ভিক্ষা চাই-নি, আজ তার কাছে আমি এই ভিক্ষা চাইছি যে, মানুষের যদি পুনর্জ্জন্ম হয়, তা হোলে জন্ম-জন্ম যেন তুমি আমার মা হও, আমি যেন জন্ম-জন্ম তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করি।—

অমৃতর কথা শেষ হবার আগেই লীলা ঘরের মধ্যে ঢুকে একেবারে ভুবনের খাটের কাছে এসে দাঁড়াল। মার চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে দেখে সে অমৃতের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে, তার চোখও জলে ভরা। লীলা ভাবলে যে, নিশ্চয় মাতে আর অমৃত-দাতে তার কথাই হচ্ছিল। লীলার ইচ্ছা হোলো যে, সে মাকে জানিয়ে দেয় যে, তার জন্য আর কাউকে ভাব্‌তে হবে না। কিন্তু সে ইচ্ছাকে চেপে রেখে মুখে একটু হাসি এনে বল্লে—কেমন লাগ্‌ছে মা, একটু ভাল বোধ হচ্ছে ?

ভুবন বল্লে—এখন ভাল আছি, আর কোন কষ্ট নেই। লীলা একটা গান গা না মা, বহুদিন তোর গান শুনি-নি। শুনিয়ে দে, আর বোধ হয় শুন্‌তে হবে না।

লীলা একখানা হাল্কা চেয়ার তুলে নিয়ে খাটের পাশে রেখে তার ওপরে বসে ধরা গলায় আস্তে আস্তে গান গাইতে লাগ্‌ল। গান শুন্‌তে শুন্‌তে ভুবনের যেন তন্দ্রা আস্‌তে লাগ্‌ল। সে চোখ দুটো বুঁজিয়ে ফেল্লে। তার দুই চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত জল গড়িয়ে মাথার বালিশ ভিজে যেতে লাগ্‌ল। মাথার শিয়রে বসে অমৃত নিঃশব্দে কাঁদ্‌ছিল, লীলারও দুই গাল দিয়ে ধারা বেয়ে পড়্‌ছিল। তিন জনেই কাঁদ্‌ছে—দু-জন নারী, একজন পুরুষ। জগতে তিনজনেই তারা পরিত্যক্ত, নিন্দিত। একজন ওপারের যাত্রী, আর দু-জন.........

সেদিন দুপুর থেকেই আকাশটা মেঘ্‌লা কোরে কোরে বিকেল নাগাদ খুব এক পস্‌লা বৃষ্টি হোয়ে গেল। বৃষ্টিটা থামবার একটু পরে সন্ধ্যার কাছাকাছি ভুবনের অসুখ হঠাৎ বেড়ে উঠ্‌ল। বিকেলে অমৃত একবার বাড়ী যেত, বৃষ্টিটা বন্ধ হোতেই সে বেরিয়ে পড়েছিল। লীলা মার পাশে বসে বসে ভাব্‌ছিল কখন অমৃত আস্‌বে—এই সময় বারকয়েক কাশি হোয়েই ভুবনের হেঁচ্‌কী উঠ্‌তে আরম্ভ হোলো। লীলা প্রথমটা কিছু বুঝতে পারে-নি,—অসুখ বাড়্‌লে নিশ্বাস নেবার কষ্ট হয় তা সে জান্‌ত, কিন্তু যখন সে দেখ্‌লে যে ভুবনের মুখটা মধ্যে মধ্যে বিকৃত হোয়ে যাচ্ছে, আর গলা দিয়ে ঘড়্‌ ঘড়্‌ কোরে এক রকম শব্দ হচ্ছে, তখন সে ভয় পেয়ে গেল। অসুখের এ-রকম অবস্থা ইতিপূর্ব্বে সে কখনো দেখে-নি। ভুবনের সেই অস্বাভাবিক মুখ আর নিশ্বাস নেবার যন্ত্রণা দেখে লীলার বুকের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কি কর্‌বে, কোথায় যাবে, কি কর্‌লে মার যন্ত্রণার লাঘব হবে কিছুই ঠিক কর্‌তে না পেরে সে ঘর আর বাইরে ছুটোছুটি কোরে বেড়াতে লাগ্‌ল। শেষকালে লীলা একজন চাকরকে তাড়াতাড়ি অমৃতকে ডেকে আন্‌তে পাঠিয়ে দিলে। মার পাশে বসে বসে লীলা বার-বার ঘড়ির দিকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, তার এক-একটা মুহূর্ত্ত যেন এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছিল। ভুবনের নিশ্বাস নেবার কষ্ট দেখে সে ভাব্‌ছিল—এই তো মৃত্যু! ওঃ, প্রাণটা বেরিয়ে যেতে না জানি কত কষ্টই হয়? কিন্তু মার মৃত্যুর পর তাকেও যে মর্‌তে হবে।

হঠাৎ ভুবনের মুখ দিয়ে একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ বেরিয়ে তার

চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আস্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। মার চোখের সে রকম চাহনি লীলা কখনো দেখে-নি। ভয়ে তার বুকের ভেতর একটা অস্বাভাবিক দপ্‌দপানি সুরু হোলো। একলা সে এখন কি ক'রবে? অমৃত-দা কখন গিয়েছে এখনো ফির্‌ছে না কেন? ভুবন আরও দুই একবার সেই রকম আওয়াজ কর্‌তেই লীলা ঘর থেকে ছুটে একেবারে সদর দরজা অবধি পালিয়ে এল, কিন্তু সেখানে সে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পার্‌লে না, তখুনি আবার সেখান থেকে ছুটে ভুবনের ঘরে এসে ঢুক্‌ল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ঘর আর সদর দরজা অবধি ছুটোছুটি কোরে যখন তার দম্‌ প্রায় বন্ধ হোয়ে এসেছে, এমন সময় অমৃত এসে উপস্থিত হোলো।

অমৃত এসে রুগীর অবস্থা দেখে তখুনি ডাক্তারের কাছে ছুট্‌ল। লীলা বল্লে—অমৃত-দা দুঃখুকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দাও না।

অমৃত চল্‌তে চল্‌তে বল্লে—আমায় গিয়ে ডাক্তারকে রুগীর অবস্থার কথা বল্‌তে হবে, দুঃখুর দ্বারা তা হবে না। বোধ হয় একটা ইন্‌জেক্‌সন্‌ দিতে হবে।

লীলা বল্‌তে যাচ্ছিল যে, এক্‌লা থাক্‌তে তার বড় ভয় কর্‌ছে, কিন্তু সে কথা বলবার আগেই অমৃত বাইসাইকেল চড়ে বেরিয়ে পড়্‌ল।

সন্ধ্যা হবার অনেক আগেই লীলার হুকুমে চাকরেরা ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তার চোখে একটুও অন্ধকার সহ্য হচ্ছিল না। ভুবনের গলার সেই একঘেয়ে আওয়াজ শুন্‌তে শুন্‌তে তার মনে হোতে লাগ্‌ল—মৃত্যুর মূর্ত্তি কি ভীষণ! কত ব্যথা কী নারকীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে মৃত্যু আসে। তবুও তাকে মর্‌তে হবে। এই যন্ত্রণাকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করেছে। পলে পলে, 'একটু একটু কোরে' দগ্ধ হোয়ে মরার চেয়ে কয়েক মুহূর্ত্তের এই যন্ত্রণা—এ ঢের ভাল। এই ব্যথার

মধ্যে দিয়েই তো পরম মুক্তির সোপানে গিয়ে পৌঁছন যাবে—মৃত্যুর চিন্তায় বিভোর হোয়ে লীলা ভুবনের খাটের একপাশে বসে রইলো।

একটু পরেই অমৃত ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হোলো। ডাক্তার একেবারে ইন্‌জেক্‌শনের যন্ত্রপাতি সঙ্গে কোরে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি রুগীর নাড়ী পরীক্ষা কোরে একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বল্লেন—অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বটে, কিন্তু সাম্‌লেও উঠ্‌তে পারেন, কিছু বলা যায় না। রাত্রি এগারোটার মধ্যে যদি মারা না যান, তবে আমায় একবার খবর দেবেন আর একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে যাব।

ইন্‌জেক্‌শন দেবার পর ভুবন একটু শান্ত হয়েছিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই তার যন্ত্রণা আবার বাড়্‌তে লাগ্‌ল। রুগীর ঘরে অমৃত ও লীলা ছাড়া আর কেউ নাই। বাইরের কোন লোকের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধই ছিল না, ভুবনের যে এমন অসুখ, তা সোনালীর কেউ জান্‌তই না, জান্‌বার প্রয়োজনও বোধ কর্‌ত না। ঘরের মধ্যে ভুবনের গলার আওয়াজ ও মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। অমৃত ও লীলার মধ্যে কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হোলে ইসারাতেই তা চলেছে। রাত্রি প্রায় দশটার সময় অমৃত লীলাকে খাট থেকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লে—আর বোধ হয় দেরী নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হোয়ে যাবে, বলে মনে হচ্ছে। কথাটা শুনেই লীলার মাথা থেকে পা অবধি যেন একটা বিদ্যুতের ঝিলিক্ বয়ে গেল। কোন রকমে দেওয়াল ধরে নিজেকে সে সাম্‌লে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় অমৃত যেন একটু নিশ্চিন্ত হোলো। অনেকক্ষণ থেকেই তার মনে হচ্ছিল যে, এ-সময়টা লীলার এখানে না থাকাই ভাল। কিন্তু সে কথাটা সে লীলাকে মুখ ফুটে বল্‌তে পাচ্ছিল না। লীলা বেরিয়ে যেতে সে আবার ভুবনের পাশে এসে বস্‌ল।

লীলা তার মার ঘর থেকে বেরিয়ে টল্‌তে টল্‌তে নিজের ঘরে এসে খাটের ওপর উপুড় হোয়ে শুয়ে পড়্‌ল। অনেকক্ষণ সেইভাবে পড়ে থেকে যখন সে উঠ্‌ল, তখন তার শারীরিক দুর্ব্বলতাটা অনেকখানি কেটে গিয়েছে। সে আস্তে আস্তে উঠে চাবি দিয়ে একটা হাতবাক্স খুলে ছোট্ট একটা শিশি বের কোরে বাক্সটা বন্ধ কোরে ফেল্লে। এই শিশিটার মধ্যে ভুবনের বুকের মালিশের একটা ওষুধ ছিল। ওষুধটা একবার মাত্র দরকার লেগেছিল, তার পর লীলা সেটাকে ভুবনের ঘর থেকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। লীলা শিশিটা নিয়ে আলোর কাছে গিয়ে ওষুধটার নাম একবার ভাল কোরে পড়ে নিলে। ঠিক সেই সময় ঘরের বাইরে কি একটা শব্দ হোতেই সে টপ্‌ কোরে শিশিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্লে। তার পর সন্তর্পণে সে ঘর থেকে বেরিয়ে ভুবনের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে থেকে ভুবনের গলার সেই ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ আস্‌ছিল, কিছুক্ষণ সে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আবার পা টিপে টিপে নিজের ঘরে এসে ঢুক্‌ল। তার পর আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে বিছানার ওপর ফেলে দিলে। ঘরের মধ্যে দেওয়ালে যেখানে বড় বাতিটা জ্বল্‌ছিল ঠিক তারই নীচে একখানা বড় আয়না টাঙান ছিল, লীলা একবার সেই আয়নার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল, নিজের চেহারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি জানি কেন তার হাসি পেতে লাগ্‌ল, তার বিষাদ কালিমামাখা মুখে হঠাৎ একটু হাসি ফুটে উঠ্‌ল। হঠাৎ তার হো হো কোরে পাগলের মতন একবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠবার একটা দুর্জ্জয় বাসনা হোতে লাগ্‌ল, লীলার বোধ হচ্ছিল যে, সেই পাগলা হাসিটা তার গলার কাছে এসে বিষম জোরে ফেটে বেরিয়ে পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। সে নিজের গলাটা দু-হাতে চেপে ধরে ছুটে সদর দরজার দিকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

অন্ধকার পথ, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আকাশটা যেন অন্ধকারের

ভারে পৃথিবীর দিকে নেমে পড়েছে, মধ্যে মধ্যে সমস্ত পৃথিবীকে চম্‌কে দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক্‌—কোথাও রাস্তা দেখা যাচ্ছিল না, অন্ধকারে যেন সমস্ত মুড়ে রেখেছে। লীলা হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে এসে বাগানের দরজা খুলে একবার থম্‌কে দাঁড়াল্‌। সেখান থেকে তার ঘরের আলোটা দেখা যাচ্ছিল। সে খানিকক্ষণ সেই খোলা জান্‌লার দিকে চেয়ে থেকে আবার নিজের ঘরের দিকে ছুট্‌ল। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের মধ্যে এসে বিছানা থেকে সে চাবিটা তুলে নিলে, তার পর হাতীর দাঁতের একটা হাতবাক্স খুলে সে অরুণের একখানা ফোটো বের কোরে বিছানায় এসে বসে পড়্‌ল।

অরুণের ফোটোখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে লীলার অনেক কথা মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তারা দুজনে মিলে ভবিষ্যতের জন্য যে রাজত্ব তৈরি করেছিল, কে এসে তা ধ্বংস কোরে দিলে। কে অরুণকে তার কাছ থেকে নির্দ্দয়ের মত ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে? মৃত্যু! অরুণ যখন তার কাছে ছিল কৈ একদিনও তো তার মনে হয়-নি যে, মৃত্যু তাদের মধ্যে পড়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারে? মৃত্যু যেমন তাদের পৃথক করেছে, সেই মৃত্যুই আবার তাদের মিলনের সোপান হবে। টপ্‌ কোরে এক ফোঁটা জল লীলার গাল বেয়ে ফোটোখানার ওপর গিয়ে পড়্‌ল। লীলার অশ্রু ছবির অরুণের চোখের ওপর গিয়ে টল্‌টল্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। লীলার মনে হচ্ছিল, অরুণও যেন তার বিরহে অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছে। সে হাতবাক্সটা খুলে ফোটোখানা আবার রেখে দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল।

রাস্তায় বেরিয়েই তার মনে হোলো—কোথায় যাই? পাহাড়ের ওপর গিয়ে মর্‌তে পার্‌লে বেশ হয়, অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু সে—লীলা উর্দ্ধশ্বাসে পাহাড়ের দিকে ছুটতে লাগ্‌ল। পথের কাঁকর-নুড়িগুলো

লীলার পায়ের চাপে মুখর হোয়ে উঠ্‌ল। খালি পায়ে তার রাস্তায় চলা কখনো অভ্যাস ছিল না, পাথর লেগে তার পা থেকে মাঝে মাঝে রক্তপাত হোতে লাগ্‌ল। লীলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তার মাথায় তখন রক্ত চড়ে গিয়েছে, দেহের সমস্ত ধমনীতে তখন তার উন্মাদ নৃত্য সুরু হয়েছে। হঠাৎ একবার নিমেষের জন্য বিদ্যুতের আভায় মাঠ-পথ সমস্ত আলোকিত হোয়ে উঠ্‌ল। কে যেন ওপরের ঐ কাল যবনিকাখানা ফাঁক কোরে পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে আবার যবনিকার ওপারে মুখ লুকিয়ে ফেল্লে। বিদ্যুতের আলোতে লীলা দেখ্‌তে পেলে, তারই সাম্‌নে সাঁওতাল পল্লীর দিক থেকে কে যেন এগিয়ে আস্‌ছে। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না কোরে সে সেই উঁচু রাস্তা থেকে পাশের মাঠের ওপর লাফিয়ে পড়্‌ল। মাঠ থেকে রাস্তাটা অনেকখানি উঁচু, সেই উঁচু রাস্তা থেকে অন্ধকারে ও-রকম ভাবে লাফিয়ে পড়ায় তার কাপড় ও দেহের অনেক জায়গা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত ঝর্‌তে লাগ্‌ল। লীলার সেদিকে কোনো দৃষ্টি নাই, সে সেই এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো মাঠের ওপর দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে; কোথায় কোন্‌ দিকে চলেছে তা সে নিজেই জানে না। দৌড়-দৌড়, প্রাণপণে দৌড়—

দৌড়তে দৌড়তে যখন তার দম্‌ প্রায় বন্ধ হোয়ে এসেছে তখন সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার পেছন ফিরে দেখ্‌লে কেউ আস্‌ছে কিনা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু সে যেন কিসের একটা ক্ষীণ শব্দ শুন্‌তে পেয়ে আবার ছুট্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। এবার সে আর বেশীক্ষণ ছুট্‌তে পার্‌লে না, কিছুক্ষণ দৌড়িয়েই একটা জায়গায় এসে থেমে গেল। সেখানে বহুদিন আগে একটা কয়লার খনি ছিল। কয়লা নিঃশেষ হোয়ে যাওয়ায় খনির কাজ বন্ধ হোয়ে গিয়েছে, খনির গহ্বর বর্ষার জলে পূর্ণ। লীলার মনে হোলো, এই ঠিক জায়গা, এইখানে লাফ দিয়ে পড়্‌লেই ঠিক হবে। সে আর-একবার পেছনে ফিরে দেখ্‌লে। চারিদিকে ঘোর

অন্ধকার, কোথাও একটু আলো দেখা যাচ্ছে না। তাদের বাড়ী থেকে এ-জায়গাটা কত দূরে তাও সে ঠিক আন্দাজ কর্‌তে পাচ্ছিল না।

লীলা আস্তে আস্তে একেবারে জলের ধারে গিয়ে বস্‌ল। সেখানে বসে-বসে সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, বাড়ীতে বোধ হয় এতক্ষণ সব শেষ হোয়ে গিয়েছে। মার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে যেন দেখ্‌তে পেলে, তার মা জলের ওপারে দাঁড়িয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকৃছে। লীলা ধড়্‌মড়্‌ কোরে উঠে জলে লাফিয়ে পড়্‌তে যাবে, এমন সময় কে এসে একেবারে তার কোমর জড়িয়ে ধর্‌লে। লীলা সেই অবস্থায় মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়্‌ল।

সেদিন রাত্রে স্কুমার সাঁওতাল-পল্লী থেকে কি একটা কাজ সেরে বাড়ী ফির্‌ছিল। বৃষ্টির উপক্রম দেখে সে না দৌড়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ীর দিকে চলেছিল। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই, তার ওপরে ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চোখের দৃষ্টিকে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ কোরে সে পথ বেয়ে চলেছিল। হঠাৎ বিদ্যুতের আভায় সে দেখ্‌তে পেলে যে, তারই সাম্‌নে কয়েক গজ দূরে একটি রমণী রাস্তা থেকে মাঠের মধ্যে লাফিয়ে পড়্‌ল। স্ত্রীলোকটী পড়ে যাওয়াতে একটা আওয়াজ হয়েছিল, স্কুমার তাকে সাহায্য করবার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দেখ্‌লে যে, সে সেখান থেকে উঠে মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়চ্ছে। স্কুমারের মনে কৌতুহল ও সন্দেহ জেগে উঠ্‌ল। সে পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে তার পেছনে ছুট্‌তে আরম্ভ কোরে দিলে।

বিদ্যুতের আলোতে এক মুহূর্ত্তের জন্য যে মূর্ত্তি স্কুমারের চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠেছিল, সেই এক মুহূর্ত্তের দেখাতেই সে বুঝ্‌তে পেরেছিল যে, সেটী নারী-মূর্ত্তি। লীলার পরণে একখানা চওড়া পেড়ে সাড়ী ছিল; স্কুমার তার মুখ দেখতে পায়-নি বটে, কিন্তু কাপড় আর কাপড় পর্‌বার ধরণ দেখেই সে বুঝ্‌তে পেরেছিল যে, এ সাঁওতালদের মেয়ে নয়। লীলা যত

ছুটছে সুকুমারও তার পেছনে ছুটছে। সুকুমার ক্রমেই এই নারীর ব্যবহার দেখে আশ্চর্য্য হোয়ে যাচ্ছিল। সে ভাবছিল, কে এই নারী, এই প্রলয়ের বুকে এম্‌নি কোরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে! তাদের পাড়ায় এক লীলাদের বাড়ী ছাড়া অন্য কারো বাড়ী নেই, সে কিছুতেই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিল না যে, এই দুপুর-রাতে এমনভাবে কি উদ্দেশ্যে এ মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে ?

লীলা যখন সেই জলপূর্ণ খনির ধারে গিয়ে বস্‌ল, তখন সুকুমারের মনের সন্দেহের অন্ধকারটা একটু কেটে গেল। সে ভাবলে—হয় এই রমণী পাগল, আর না হয় নিশ্চয় সে এখানে আত্মহত্যা কর্‌তে এসেছে। তা না হোলে এই ভীষণ অন্ধকার রাত্রে কি উদ্দেশে লোকে এখানে আস্‌তে পারে। সে পা টিপে টিপে একেবারে সেই মূর্ত্তির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। লীলা নিজের চিন্তায় এতই বিভোর হয়েছিল যে, সুকুমারের উপস্থিতি সে মোটেই জান্‌তে পারে-নি।

জলে লাফিয়ে পড়বার সময় হঠাৎ সুকুমার জড়িয়ে ধরায় লীলার মূর্চ্ছা হয়েছিল। সুকুমার তাকে মাঠে শুইয়ে দিয়ে খনি থেকে আঁজ্‌লা কোরে জল এনে তার চোখে-মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌ল। ঠাণ্ডা জল লাগায় ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে আস্‌তে লাগ্‌ল। মূর্চ্ছাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হচ্ছিল, যেন সে জলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। জলে ডোবার যে-সব যন্ত্রণার কথা ইতিপূর্ব্বে তার শোনা ছিল, এতো সে রকমের নয়, এতো আরামের সঙ্গে সে অগাধ জলে তলিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু এত আরামের! লীলার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল—আঃ—আঃ—মাগো—

হঠাৎ মুখে একটা জোরে জলের ঝাপ্‌টা লাগ্‌তেই তার মূর্চ্ছা একেবারে ভেঙে গেল। মূর্চ্ছাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সে ধড়মড় কোরে উঠে বসেই বুঝ্‌তে পার্‌লে—কোথায় জল! মুহূর্ত্তের মধ্যে তার সব কথা মনে পড়ে গেল।

সুকুমার লীলাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—লীলা, এই ভীষণ অন্ধকার রাত্রে এই জনশূন্য মাঠে কি কর্‌তে এসেছিলে তুমি ?

এত দুঃখের মধ্যেও লীলা না হেসে থাক্‌তে পার্‌লে না। এরা কি আমাকে মরেও জুড়ুতে দেবে না? এতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণী সে, কিন্তু দেবতা ও মানুষে মিলে তার বিরুদ্ধে কি প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রই না করেছে! সে গা-ঝাড়া দিয়ে সেখান থেকে উঠে সুকুমারকে বল্লে—আমি মর্‌তে এসেছিলুম, তুমি আমায় বাঁচিয়েছ, সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ। এই বলে সে আবার জলের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

সুকুমার লীলার পথ আগ্‌লে দাঁড়াল। লীলার কথা শুনে সে একটু থতোমতো খেয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা তার মগজে ভাল কোরে ঢুক্‌ছিল না। সে বল্লে—কেন তুমি মর্‌তে চাও লীলা? আত্মহত্যা যে মহাপাপ, কোন্ দুঃখে তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ ?

সুকুমারের কথা শুনে লীলা চীৎকার কোরে বলে উঠ্‌ল—কেন মর্‌তে চাই—

মাঠের এলোমেলো বাতাস তার গলার আওয়াজটা লুফে নিয়ে আনন্দে ছোঁড়াছুড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল। সুকুমার লীলার একখানা হাত ধরেছিল, তার চীৎকার শুনে সে হাতখানা ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল। তার মনে একটা সন্দেহ হচ্ছিল—লীলার মাথা খারাপ হোয়ে যায়-নি তো! সংসারে তাদের মা ও মেয়েকে যে ভাবে দিন কাটাতে হয়, তাতে মাথা খারাপ হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয়।

লীলা আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—আত্মহত্যা করা পাপ কার্‌ কাছে? যে পৃথিবীতে সুখে দিন কাটাচ্ছে, সৌভাগ্য যার মাথায় নিয়ত পুষ্পবৃষ্টি কর্‌ছে, সে যদি মরতে চায়, তবে তার পাপ হবে। পুত্রবৎসল, স্নেহশীল পিতাকে যদি কোন পুত্র অত্যাচারী পিতা বলে পরিত্যাগ কোরে চলে যায়,

তবে তার পাপ হয়। কিন্তু সংসারে প্রত্যেক পদবিক্ষেপে যার পা ক্ষত-বিক্ষত হোয়ে যায়, মাতৃগর্ভে সঞ্চার হওয়া-মাত্র যার প্রতি সংসারশুদ্ধ খড়্গা হস্ত হোয়ে ওঠে, জীবনধারণের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটা পর্য্যন্ত যাকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়—তার বেঁচে থাকাই মহাপাপ ; আত্মহত্যা তার কাছে পাপ নয়। অনেকদিন আগেই আমার মরা উচিত ছিল, কিন্তু সংসারে আমার চেয়েও অভাগিনী আর একজন আছেন, তাঁকে একলা ফেলে যেতে প্রাণ চাইতো না। আজ তাঁর আত্মা এই সংসার থেকে বিদায় নেবার জন্য উন্মুখ হয়েছে, এর পর আর কিসের জন্য বাঁচা? বাঁচবার ইচ্ছা আমার আর নেই, খুব বেঁচেছি। আমার মত বাঁচতে তোমরা কেউপার-নি—মৃত্যু! যাকে লোকে সব থেকে ঘৃণা করে, জগতের সেই সব থেকে ঘৃণার্হ যে মৃত্যু—আমি আজ তারও দয়ার প্রার্থী—সুকুমার তুমি এখানে কেন এলে, কি কোরে এলে?—আমায় কি তোমরা মরেও বাঁচতে দেবে না?

লীলা মুখে কাপড় দিয়ে হো হো কোরে কেঁদে উঠ্‌ল।

লীলার কান্না দেখে সুকুমারের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। তার খালি মনে হচ্ছিল—লীলা—সেই সেদিনকার লীলা, তার বাল্যসঙ্গী,—সেদিন আর আজকের দিনে কত প্রভেদ। সে কোন সান্ত্বনার কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ সেইভাবে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে সুকুমার বল্লে—লীলা সংসারে নিরবিচ্ছিন্ন সুখ কেউ পায় না। আমি বুঝতে পার্‌ছি না তোমার এমন কি দুঃখ যার জন্য তুমি আত্মহত্যা করতে চাইছ? পাগলামী কোরো না, চল বাড়ী চল।

লীলা মুখের কাপড়খানা সরিয়ে ফেলে বল্লে—তোমায় তো আমি এখানে ডেকে আনি-নি, তুমি বাড়ী যাও। আমায় তোমরা অনেক জ্বালিয়েছ, একটু শান্তিতে মরতে দাও। সুকুমার তোমার পায়ে পড়ি আমায় মরতে দাও—ওঃ, ঈশ্বর নারীকে তুমি এত অসহায় করেছ?

সুকুমার লীলাকে কি একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু লীলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—কোন কথা শুন্‌তে চাই-না তোমার। আমার দুঃখ তুমি বুঝতে পার্‌বে না। সংসারে দুই শ্রেণীর লোক আছে। এক, যারা অপরকে পীড়ন করে, আর এক শ্রেণী, যারা পীড়িত হয়। সুকুমার, তোমরা হোলে প্রথম শ্রেণীর লোক, আমি হলুম পীড়িত। আমার যন্ত্রণা, আমার মনের ভাব তোমরা বুঝতে পার্‌বে না—চেষ্টা কর্‌লেও না।

লীলার কথাগুলো সুকুমারের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়ে আঘাত কর্‌তে লাগ্‌ল। সে ভাব্‌ছিল, এই যে একটি মেয়ে, ফুলের মত নির্ম্মল সে, সংসারে এসে কেবল সে আঘাতই সহ্য করেছে। পৃথিবীতে শোক, তাপ, দুঃখ, যন্ত্রণা আছে, সকলকেই তা সহ্য কর্‌তে হয়, কিন্তু এই বয়সেই তার দুঃখ এত অসহ্য হয়েছে যে, সে মৃত্যুর মুখে ছুটে এসেছে। তা না হোলে কে মর্‌তে চায়? এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে কে চলে যেতে চায়? সহানুভূতিতে সুকুমারের হৃদয় গলে যেতে লাগ্‌ল। সে লীলাকে বল্লে—লীলা আমি যতদূর জানি বাইরের কারো সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্কই নেই। লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখ্‌লেই কোন না কোন দিক থেকে আঘাত সহ্য কর্‌তে হবেই। তোমার মার মৃত্যুর পর তুমি এখনো যেমন ভাবে আছ, তখনো তেম্‌নি দিন কাটাতে পার। লোকের সঙ্গে না মেলা-মেশা কর্‌লেই হবে—

লীলা তখনো কাঁদ্‌ছিল। সুকুমারের কথা শুনে সে বল্লে—না না, আমার দ্বারা তা হবে না, ঐ বাড়ীখানার চারদিক ঘিরে এখানকার যত লোকের অভিসম্পাত নেচে বেড়াচ্ছে, ওখানে আমি থাকুতে পার্‌ব না। আমার অন্য কোথাও আশ্রয় নেই, আমাকে মর্‌তেই হবে—

লীলার কথাগুলো সহস্রকণ্ঠে সুকুমারের কানের মধ্যে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হোতে লাগ্‌ল—আমাকে মরতেই হবে। সে লীলার হাত

ধরে বল্লে—এইখানে একটু বস লীলা। লীলা তার কথা শুনে বসে পড়্‌ল। সুকুমারও তার পাশে বস্‌ল। কারো মুখে কোন কথা নাই, থেকে থেকে এক-একটা দমকা বাতাস পুব দিক থেকে ছুটে এসে শোঁ শোঁ কোরে মাঠের ওপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলে যাচ্ছিল ··· প্রকৃতির দীর্ঘশ্বাস। অনেকক্ষণ চুপ চাপ বসে থাকার পর সুকুমার বল্লে—লীলা, তুমি আমায় বিয়ে করবে? তোমাদের ওপর এখানকার সমাজ যে অত্যাচার করেছে তার জন্য প্রধানতঃ আমরাই দায়ী। আমাদের, অন্ততঃ আমাকে ক্ষমা কর লীলা। দেখ, আমাকে বিয়ে কর্‌লে তুমি অসুখী হবে না।

সুকুমার আবেগে লীলার হাতখানা ধরে বল্লে—বল লীলা, আমায় বিয়ে কর্‌বে?

লীলার মনে হোতে লাগ্‌ল, পৃথিবীটা কি সব ওলোট-পালট হোয়ে গেল? তা না হোলে সুকুমার তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব কর্‌ছে! এ কথা যে সে কখনো কল্পনাও কর্‌তে পারে-নি। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, আবার অদৃষ্ট তাকে কোন পথে টেনে নিয়ে চলেছে—কতকাল—কতকাল সে তার নাকে দড়ি দিয়ে এমন কোরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে? এতক্ষণে কোথায় সে ঐ জলের মধ্যে মরে পড়ে থাকৃত, কিন্তু একি অজানা শক্তি তাকে প্রতিপদে এমন কি মৃত্যুতেও তাকে বাধা দিচ্ছে? তার কি কোন শক্তি নেই? এই এত বড় পৃথিবীর মধ্যে সকলেই নিজের ইচ্ছামত কাজ কোরে বেড়াচ্ছে, একা কি সেই শুধু অক্ষম? কোন দিকেই কি তার স্ব-ইচ্ছায় নড়্‌বার ক্ষমতা নেই? সে মনে মনে এই শক্তির কাছে মাথা হেঁট কর্‌লে। তার অন্তরের মধ্যে যে অন্তর, সে বল্‌তে লাগ্‌ল—তবে এস তুমি হে অ-দৃষ্ট, হে অজানা, আমায় টেনে নিয়ে যাও তোমার যেখানে খুসি, তোমার যা ইচ্ছা আমায় দিয়ে তাই করিয়ে নাও, আমি

তোমার কোলে আত্মসমর্পণ করলুম। অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে লীলা বল্লে—সুকুমার আমি তোমায় বিয়ে করব।

আনন্দাশ্রুলোচনে সুকুমার তাকে বল্লে—লীলা আমরা তোমাদের ওপর অন্যায় করেছি তুমি তার বদলে আমাকে পুরস্কৃত করলে।

লীলা বল্লে – চল বাড়ী যাই, মা বোধ হয় এতক্ষণ আর এ-পৃথিবীতে নেই।

সুকুমার বল্লে—তাড়াতাড়ি চল। তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তা হোলে আমাদের বিয়ের কথাটা তাঁকে জানিয়ে দিই।

লীলা ও সুকুমার দু-জনে হাত ধরাধরি কোরে নীরবে সেই বন্ধুর মাঠের ওপর দিয়ে বাড়ীমুখো চলতে লাগল। পূবের হাওয়া তখন আকাশের বুকের ওপর থেকে মেঘের ঢাকনা উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। শাদা ধপ্ধপে আধখানা চাঁদের আলোয় প্রকৃতি তখন হাসছিল। মাঠ ছাড়িয়ে লীলা ও সুকুমার রাস্তার ওপর উঠল। লীলার শরীর অবসন্ন হোয়ে এসেছিল, ব্যথিত শরীর আর অবসন্ন মন নিয়ে সে সুকুমারের হাতের ওপর ভর দিয়ে চলছিল। আনন্দে উৎফুল্ল সুকুমার তাকে এক-রকম টেনেই নিয়ে চলেছিল। লীলাদের বাড়ীর দরজার কাছে এসে হঠাৎ লীলা তাকে বল্লে—সুকুমার, তোমাকে বিয়ে করা আমার অসম্ভব। আমাদের মধ্যে যা হয়েছে তা তুমি ভুলে যাও। তোমার মার কথা আমার মনেই ছিল না। আমাদের বিয়েতে তিনি সম্মতি না দিলে আমি তোমায় বিয়ে করতে পারব না—আমায় ক্ষমা কোরো।

লীলার কথা শুনে সুকুমার থমকে দাঁড়াল। যতক্ষণ সে এতটা পথ হেঁটে এসেছে, ততক্ষণ তার কোন কথাই মনে ছিল না। পূর্ণ হৃদয় নিয়ে আনন্দের আবেগে অধীর হোয়ে সে এতক্ষণ চলেছে, হঠাৎ লীলার মুখ থেকে এই কথা শুনে সে দমে গেল। লীলাকে বিয়ে করবার

কথা সে যদি মার কাছে গিয়ে বলে, তবে ব্যাপারটা যে কি রকম দাঁড়াবে তা সে যতটা জান্‌ত, লীলাও ততটা জানত না। তবুও তার মনের ভাবটা চেপে রেখে সে লীলাকে বল্লে—লীলা আমার যা মত মারও তাই মত। আমি বেশ জানি যে, তিনি আমার মতের বিপক্ষে কোন্ কথা বল্‌বেন না।

লীলা তাদের দরজাটা ধরে দৃঢ়ভাবে বল্লে—তবুও আগে আমি তাঁর মত্‌টা জান্‌তে চাই।

স্নকুমার ব্যস্ত হোয়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে—আচ্ছা তুমি এইখানেই দাঁড়াও, আমি এখুনি ফিরে এসে মার মত তোমাকে জানাচ্ছি। তুমি এখান থেকে যেও-না।

স্নকুমার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত লীলা সেখান থেকে নড়্‌বে না এই কথা নিয়ে সে বাড়ীর দিকে ছুট্‌ল। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা—

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লীলার পা ধরে আস্‌ছিল। তার অবসন্ন ক্ষত-বিক্ষত পা-দুটো আর তার শরীরকে ঠিক সোজা কোরে রাখ্‌তে পার্‌ছিল না। তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌ল। দাঁড়াতে না পেরে দরজাটা ধরে সে মাটিতেই বসে পড়্‌ল। কিছুক্ষণ সেইভাবে মাটিতে বসে থাকার পর অমৃত ও ডাক্তার বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। অমৃত ডাক্তারকে দরজা অবধি পৌঁছে দিতে এসেছিল। লীলাকে দরজার কাছে দেখ্‌তে পেয়ে সে বল্লে—আর একটা ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হোলো। এখন অনেকটা শান্ত হয়েছেন, আজকের রাতটা বোধ হয় কাট্‌ল।

লীলার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। অমৃত সেদিকে লক্ষ্য না কোরে যেমন ব্যস্তভাবে এসেছিল তেম্‌নি ব্যস্তভাবে আবার বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

মাটির ওপর বসে বসে লীলা ভাব্‌ছিল যে, সে স্নকুমারকে বিয়ে

করতে রাজী হয়েছে শুনলে তার মা কি ভাববে? বিস্ময়ে মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়তো তার কাছে থেকে চমকে দূরে সরে যাবে! কিন্তু আর কোন ভাবনা সে ভাববে না, দুনিয়ার কোন দিকে সে তাকাবে না, অদৃষ্ট তাকে যে পথে টেনে নিয়ে যায় অনুগত ভৃত্যের মত সে সেই পথেই চলবে।

কিছুক্ষণ পরে সুকুমার দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এল। তাকে দেখে লীলার চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে সুকুমার বল্লে—লীলা, মার মত হয়েছে, চল তোমার মার কাছে যাই।

সুকুমার লীলার হাত ধরে তাকে মাটি থেকে টেনে তুল্লে, সে দাঁড়াতে পারছিল না। কোন রকমে সুকুমারের ওপর ভর দিয়ে সে তার মার ঘরে গিয়ে ঢুকল। লীলার সঙ্গে সুকুমারকে দেখে অমৃত একেবারে অবাক হোয়ে গেল। লীলার আলু-থালু চুল, ছেঁড়া কাপড় ও তার মাঝে মাঝে রক্তের দাগ দেখে ক্রমেই তার বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে চলেছিল। সে নির্ব্বাক হোয়ে দু-জনের দিকে চেয়ে রইলো।

সুকুমার ধীরে ধীরে ভুবনের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নতুন ইনজেকশনটা দেওয়ার পর ভুবনের গলা দিয়ে যে বিশ্রী একটা শব্দ বেরুচ্ছিল তা থেমে গিয়েছিল, সে একটু সুস্থ বোধ করছিল। ভুবন ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে রইলো। সুকুমার একটু চেঁচিয়ে বল্লে—আমাকে চিনতে পাচ্ছেন? আমি সুকুমার।

ভুবন ধীরে ধীরে বল্লে—সুকুমার!

—আমি আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি।

এ কথার উত্তরে ভুবন কোনো কথা না বলে উদাস-দৃষ্টিতে সুকুমারের দিকে চেয়ে রইলো।

সুকুমার আবার বল্লে—আমি ও আমরা আপনাদের সঙ্গে যে অন্যায় ব্যবহার করেছি, সেজন্য আমাদের ক্ষমা করুন।

সুকুমারের কথা শুনে ভুবনের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সে ধীরে ধীরে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—সংসারে কারো ওপর আমার রাগ কিংবা ক্ষোভ নেই বাবা, বরং আমি যদি কখনো তোমাদের কাছে কিছু অন্যায় কোরে থাকি তা হোলে তোমরা আমাকে ক্ষমা কোরো।

সুকুমার এ কথার কোনো উত্তর দিলে না। সে কিছুক্ষণ চুপ্ কোরে ঘাড় নীচু কোরে থেকে বল্লে—আমার আর একটি ভিক্ষা আছে।

—কি?

—আমি লীলাকে বিয়ে কর্‌তে চাই, আপনি অনুমতি দিন। আমাকে বিয়ে কর্‌তে তার অমত নেই।

অমৃত ভুবনের মাথার কাছে বসে বাতাস কর্‌ছিল। হঠাৎ তার হাত থেকে পাখাটা খসে ভুবনের বুকের ওপর গিয়ে পড়্‌ল।

সুকুমারের কথা শুনে ভুবনের মনে হোতে লাগ্‌ল, মৃত্যুর পূর্ব্বে তার মাথা খারাপ হোয়ে গেল নাকি? সে একবার বিস্ফারিত নয়নে তার চার-পাশটা ভাল কোরে দেখে নিলে যে, সত্যি-সত্যি তার জ্ঞান আছে কিনা। তার চোখের সাম্‌নে দিয়ে চির-পরিচিত ঘরের আসবাবগুলো একে একে ভেসে যেতে লাগ্‌ল। সেই আয়না, টেবিল, সেই ঘড়ি, সুবোধের ছবিখানা—আস্তে আস্তে তার চোখ দুটো বন্ধ হোয়ে গেল।

অনেকক্ষণ এই অবস্থায় কাট্‌বার পর চোখ বুঁজিয়েই ভুবন বল্লে—কিন্তু তোমার মা—

—আমার মার এ বিয়েতে মত আছে, তিনি মত দিয়েছেন।

ভুবন আবার সেই রকম নিস্পন্দ হোয়ে রইলো। মিনিট পনেরো পরে সে ক্ষীণস্বরে ডাক্‌লে—লীলা!

লীলা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। ভুবনের ডাক শুনে সে এগিয়ে এসে বল্লে—কি মা?

ভুবন কোন কথা না বলে তার হাতখানা সুকুমারের হাতের মধ্যে দিয়ে বল্লে—চির আয়ুষ্মতী হও, আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও—

বল্‌তে বল্‌তে তার স্বর রুদ্ধ হোয়ে এল। সে চোখ দুটো বুঁজে ফেল্লে, তার দুই চোখ উপ্‌চে বালিশে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

অমৃত নির্ব্বাক হোয়ে এই দৃশ্য দেখ্‌ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বহুদিন পূর্ব্বেকার একটা দিনের কথা তার স্মরণ হোতে লাগ্‌ল। সুদূর অতীত থেকে ভুবনের মিনতি-ভরা সেই অনুরোধ আজ যেন নতুন কোরে তার কানে এসে বাজছিল—অমৃত লীলাকে তুই দেখিস্ বাবা, ওদের হাতে পড়্‌লে লীলা আমার মরে যাবে।

সুকুমার ও লীলা যখন ভুবনের ঘর থেকে বাইরে এল, তখন ফর্‌সা হোয়ে গিয়েছে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগ্‌তে তারা দু-জনেই শিউরে উঠ্‌ল।

উদয়-অচলের শিখরে তখন মহা-সমারোহে দিনের অভিষেকের আয়োজন চলেছে। তারা দু-জনে ধীরে ধীরে বাগান পেরিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। সুকুমার বল্লে—লীলা আমি চল্লুম, আবার ও-বেলা আস্‌ব। এর মধ্যে যদি তোমার মার অবস্থা খারাপ হয়, তা হোলে আমায় খবর দিও। এই বলে সুকুমার এক রকম ছুটে সেখান থেকে বাড়ীমুখো রওনা হোলো।

২২

ভুবনের আয়ু ছিল, সে যাত্রায় সে বেঁচে গেল। পরদিন সুকুমার ও লীলার বিয়ের নোটিশ পড়ে গেল। নোটিশ পড়্‌তে না পড়্‌তে সোনালীময় একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। কেউ কেউ কথাটা শুনে ভয়ানক আশ্চর্য্য হোয়ে গেলেন, কেউ-বা আশ্চর্য্য হোয়েও স্বীকার কর্‌লেন না। কেউ-বা গম্ভীরভাবে বল্লেন—লীলার সঙ্গে সুকুমারের যে বিয়ে হবে এ-কথা তাঁরা বহু পূর্ব্বেই জান্‌তেন। লীলার বিষয়ের ইঙ্গিত কোরে কেউ-বা বল্লেন—জলেই জল বাধে।

নোটিশ পড়ার দিন থেকে বিরাজমোহিনীর স্বভাবগম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হোয়ে পড়েছিল। বাড়ী থেকে বেরোন, উপদেশ দেওয়া কিংবা চাকর-বাকরদের ধমক দেওয়া সব বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল। কোথা থেকে কি কোরে যে এত বড় ব্যাপারটা সম্ভব হোলো, তা তিনি নিজেই বুঝতে পার্‌ছিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুকুমার যখন সাঁওতাল-পল্লীতে যায়, আকাশে মেঘ দেখে তখুনি তিনি তাকে যেতে বারণ করেছিলেন। সুকুমারের বাড়ী ফেরবার সময় উত্তীর্ণ হোয়ে যাওয়ায় তিনি চারিদিকে লোক পাঠিয়ে ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি কর্‌ছেন, এমন সময় সুকুমার হুড়্‌মুড়্‌ কোরে ঘরের মধ্যে এসে ঢুক্‌ল। বিরাজমোহিনী তাকে বেশ বড় রকমের একটা উপদেশ দেবার যোগাড় করছিলেন, এমন সময় কোন রকম ভনিতা না কোরেই সে বলে ফেল্লে—মা, আমি লীলাকে বিয়ে কর্‌তে চাই, তোমাকে এ বিয়েতে মত দিতে হবে।

সুকুমারের কথা শুনে বিরাজমোহিনীর মনে হোলো, হঠাৎ কে যেন

তাঁর গলাটা দু-হাত দিয়ে টিপে ধরে গোটাকতক নাড়া দিয়ে চলে গেল। তিনি চেয়ারের ওপর ধপ্ কোরে বসে প্রাণপণ চেষ্টা কোরে বল্লেন—কে লীলা! কাদের লীলা?

তাঁর যেন সব এলোমেলো হোয়ে যেতে লাগ্‌ল। সুকুমার উত্তেজিত হয়েছিল। সে একটু রূঢ় সুরেই বল্লে—আমি বুঝতে পেরেছি যে, লীলাদের ওপর অত্যন্ত অন্যায় করা হয়েছে, আর তার জন্য প্রধানতঃ আমরাই দায়ী। আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে চাই। আমি লীলাকে বিয়ে কর্‌ব, সে বিয়েতে তোমায় মত দিতে হবে।

সুকুমারের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে বিরাজমোহিনী কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। ছেলের মুখে প্রথমে কথাটা শুনে তিনি প্রায় জ্ঞানহারা হোয়ে পড়েছিলেন। সুকুমার তাঁর কাছে লীলাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব কর্‌তে পারে, এ-কথা কখনো স্বপ্নেও তাঁর মনের কোনে স্থান পায়-নি। লীলা! পৃথিবীতে তিনি সব চেয়ে যাকে বেশী ঘৃণা করেন তার মেয়ে তাঁর পুত্রবধূ হবে, আর তাতে তিনি মত দেবেন! সুকুমার কি পাগল হোলো নাকি?

বিরাজ শান্তস্বরে বল্লেন—আমি বেঁচে থাক্‌তে এ বিয়েতে মত দিতে পার্‌ব না।

—বেশ তবে তুমিই বেঁচে থাক। এর জন্য একদিন তোমায় অনুতাপ করতেই হবে—

এই বলে সে তার মার ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

সুকুমারের হাব-ভাব ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গী দেখে বিরাজের ভয় হোলো, বুঝি বা সে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে। তিনি একরকম টল্‌তে টল্‌তে সুকুমারের পেছন-পেছন তার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সুকুমার নিজের ঘরে গিয়ে প্রথমে জামাটা খুলে এক জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর দেরাজের একটা টানা ধরে একবার টান দিলে। দেরাজটায় তালা বন্ধ ছিল খুল্‌ল না। ঘরের এক কোনে একটা পেরেকে দেরাজের চাবি ঝোলান থাক্‌ত। সুকুমার সেখানে গিয়ে দেখ্‌লে যে, চাবি সেখানে নেই। সে আবার ফিরে এসে দু-হাতে টানার হাতলটা ধরে দেরাজের গায়ে পা দিয়ে সজোরে টান্‌তেই চড়্‌চড়্‌ কোরে তালা ভেঙে টানাটা বেরিয়ে এল। বিরাজ অবাক হোয়ে তার কাণ্ড কারখানা দেখ্‌ছিলেন। তিনি জীবনে তাঁর ছেলেকে কখনো এত উচ্ছৃঙ্খল হোতে দেখেন-নি। বিরাজ ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিলেন না যে, কি কোরে তাঁরই সাম্‌নে সুকুমার এমন কোরে দেরাজটাকে ভেঙে ফেল্লে। সুকুমার দেরাজ থেকে চামড়ার খাপে-ভরা একটা পিস্তল বের কোরে খাপ্‌টা খুলে ফেল্লে। পিস্তল দেখেই বিরাজের সর্ব্বাঙ্গ থর-থর কোরে কাঁপ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, তিনি ছুটে গিয়ে তার হাত দুটো চেপে ধরে বল্লেন—সুকুমার! সুকুমার কি হচ্ছে—

সুকুমার বল্লে—তোমরা বাঁচ, নিজের গোঁ নিয়ে বেঁচে থাক, আমায় মর্‌তে দাও। যাও তুমি তোমার নিজের ঘরে যাও, আমি শান্তিতে মর্‌তে চাই।

বিরাজমোহিনী কাঁদ-কাঁদ হোয়ে বল্লেন—এম্‌নি কোরেই কি মার ঋণ শুধ্‌তে হয় বাবা? বেশ, আমি মত দিচ্ছি তোর যাকে খুসী তাকে বিয়ে কর্‌গে যা—

বিরাজের মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরুল না। তিনি কাপড়ে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়্‌লেন। সুকুমার মেঝে থেকে জামাটা তুলে নিয়ে সেটা গায়ে দিতে-দিতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সুকুমারের বিয়ে নিয়ে সোনালীতে আন্দোলনের আর অন্ত রইলো না।

আত্মহত্যা করতে গিয়ে সুকুমার মার কাছ থেকে লীলাকে বিয়ে করবার যে মত পেয়েছিল, তাই সে মায়ের চরম মত বলে ধরে নিলে। বিরাজমোহিনী বুঝতে পারছিলেন যে, সেদিন রাত্রে সুকুমারকে এই বিয়েতে মত দিয়ে একটা দুর্ব্বলতা প্রকাশ কোরে ফেলেছেন। কারণ, সেদিন তিনি যে কথা বলে ছিলেন সেটা তাঁর আন্তরিক কথা নয়। বিরাজমোহিনী ভাবে-ভঙ্গিতে রোজই সুকুমারের কাছে এই বিয়েতে তাঁর মনের অনিচ্ছাটা প্রকাশ করছিলেন বটে, কিন্তু মুখে কোন কথা প্রকাশ করলেন না। তাঁর এই মৌন অসম্মতি সুকুমার যে একেবারেই বুঝতে পারছিল না তা নয়, তবে পাছে তিনি মুখ ফুটে এ বিয়েতে একেবারে অসম্মতি জানিয়ে দেন, এই ভয়ে সে মার সামনে থেকে যতটা সম্ভব দূরে দূরে কাটাতে লাগল। সেদিন রাত্রি থেকে মায়েতে-ছেলেতে কথাবার্ত্তা এক রকম বন্ধ হোয়েই গিয়েছিল।

দিন কুড়ি ধরে সুকুমারের মাথায় আর অন্য চিন্তা ছিল না। সে নিজেকে নিজের মনের কাছে খালি যাচাই করছিল যে, কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা? স্মরণাতীত কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সে কখনো মার অবাধ্য হয়-নি, আর আজ সে তার জীবনের সব থেকে বড় কাজে মায়ের ইচ্ছাকে পায়ে ঠেলে ফেলছে! নিজের মনকে এই কদিন ধরে সে বার-বার জিজ্ঞাসা করছিল—কাজটা ঝোঁকের মাথায় কোরে ফেলা হচ্ছে না-তো? নিজের দিক দিয়ে সে রাশি রাশি যুক্তি তর্ক খাড়া কোরে শেষকালে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ঝোঁকের ওপরেই সে এই কাজ করছে। লীলাকে জানবার বোঝবার তার সঙ্গে ভাল কোরে মেশবার অবসর তার হয়-নি। তাকে বিয়ে কোরে সে নিজের জীবনে সুখী হোতে পারবে কিনা, তাকে সুখী করতে পারবে কিনা, সে কথাও তার অনেকবার মনে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয়েছে যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ বিয়েতেই তো স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে তেমন-ভাবে বোঝবার সুবিধা পায় না।

লীলার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, তাদের সমাজের কোন মেয়েকেই বা সে তেমন কোরে জানে ? সেদিক দিয়ে দেখ্‌লে, এখন তো তার বিয়ে করাই হোতে পারে না। ভেবে ভেবে সে নিজের মনকে ঠিক কোরে ফেল্লে, এ ব্যাপারে যেমন সে চোখ-কান বুঁজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তেমনি ভেবেই চল্‌বে। বিয়ের ব্যাপারে অত নিক্তির ওজনে হিসাব কর্‌তে গেলে কারুর পক্ষেই বিয়ে করা সম্ভব নয়। নিজের দিক দিয়ে সে মনকে বুঝিয়ে এক রকম ঠিক কোরে ফেলেছিল, কিন্তু মার মুখের অপ্রসন্নতা তার বুকের মধ্যে একটা কাঁটার মতন খচ্‌ খচ্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল।

বিরাজমোহিনী সুকুমারের কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক হোয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে যে ভুবনের মেয়েকে বিয়ে কর্‌বে এই চিন্তাটাও তাঁর মনের মধ্যে দুঃসহ হোয়ে উঠ্‌ছিল। মনের মধ্যে একটা আক্রোশের জ্বালা নিয়ে তিনি নিজেই জ্বলে-পুড়ে মর্‌তে লাগলেন। এই কদিন ধরে এই কথা চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে তাঁর মনে হচ্ছিল যে, সুকুমারের মৃত্যু হোলেও বোধ হয় তিনি অন্তরে এত আঘাত পেতেন না।

সুকুমারের বিয়ের খবর সোনালীময় রাষ্ট্র হোয়ে যেতেই একদল লোক সমস্ত ব্যাপারটার একটা হিসাব কোরে স্থির কোরে ফেল্লে যে, ভুবনের অসুখ হওয়াতে তারাই কোন রকম সাহায্যের জন্য সুকুমারকে প্রথমে তাদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর রোজ যাওয়া-আসা কর্‌তে কর্‌তে সে লীলার প্রেমে পড়ে গিয়ে বাধ্য হোয়ে তাকে বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়েছে। লীলা সুন্দরী, সুকুমার কেন, যে কোন পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হোতে পারে। এই ব্যাপারের মধ্যে ভুবনের যথেষ্ট কারসাজী আছে।

সুকুমার কেন যে হঠাৎ লীলাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য এতটা উদ্‌গ্রীব হোয়ে পড়েছে তার কারণ একা সুকুমারই জান্‌ত। সে কথা

সে কারো কাছে প্রকাশ করে-নি। কিন্তু ব্যাপারটা যেদিকে গড়িয়ে চলেছে সেদিকে তাকে আরও বেশী অগ্রসর হোতে দেওয়া উচিত নয় ভেবে সে সোনালীর জনকয়েক মাতব্বরকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, এ ব্যাপারের মধ্যে ভুবনের কোনো কারসাজী নেই; আর নিজের ভাল মন্দের বিচার কর্‌বার বয়স তার হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তার মার মত না হোলে ভুবন কিংবা লীলা কারুরই এই বিয়েতে ইচ্ছা ছিল না। সেজন্য যেন-তেন উপায়ে তাকে মার সম্মতি আদায় কর্‌তে হয়েছে।

কথাগুলো একটু রঙিন হোয়ে বিরাজমোহিনীর কানে গিয়ে উঠ্‌ল। তিনি যখন শুন্‌লেন যে, সুকুমার তাঁর অজ্ঞাতসারেই ভুবনের বাড়ীতে যাওয়া আসা করত এবং সে-ই ভুবনের কাছে লীলাকে বিয়ে কর্‌বার প্রস্তাব করেছিল, তখন অপমানে তাঁর মাথা কাটা যেতে লাগ্‌ল। শুধু তাই নয়, তিনি আরও শুন্‌লেন যে, ভুবন সুকুমারকে বলেছিল যে, বিরাজের মত না জান্‌লে সুকুমারের হাতে লীলাকে দিতে পার্‌বে না, তখন যেন অনলে ঘৃতাহুতি পড়্‌ল। বিরাজ ভেবে দেখ্‌লেন—ভুবনের কি আস্পর্দ্ধা! পাকে প্রকারে সে সবার কাছে জানিয়ে দিতে চায় যে, বিরাজই যেন উপযাচিকা হোয়ে ভুবনের মেয়েকে নিজের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেবার অনুরোধ করেছে। যাকে দেখ্‌লে ভুবন ভয়ে কেঁচোর মতন হোয়ে যেত সেই ভুবনের স্পর্দ্ধা কি কোরে এত বেড়ে উঠ্‌ল তাই ভেবে বিরাজ আশ্চর্য্য হোয়ে যেতে লাগলেন। তিনি আন্দাজ কর্‌লেন যে, সুকুমারই তার স্পর্দ্ধা এতদূর বাড়িয়ে তুলেছে; তা না হোলে ভুবন ত ছার! সোনালীতে এত বড় কার মাথা আছে যে, তাঁকে অপমান কর্‌তে সাহস করে। ভুবনের ওপর সঞ্জাত সমস্ত ক্রোধ তাঁর সুকুমারের ওপর গিয়ে পড়্‌ল। বিরাজমোহিনী স্থির কোরে ফেল্লেন যে, সুকুমারকে এই অপরাধের জন্য দণ্ড গ্রহণ

করতে হবে। এমন দণ্ড দেব!—সুকুমার কি মনে করেছে যে, তার মাকে অন্য মায়েদের মত দুটো মিষ্টি কথা বলে কিংবা ধমক দিয়ে নিজের কাজ করবে? কখনই না, বিরাজ তেমন মেয়ে নয়! দু দিন ধরে উপাসনা আর ভাবনার পর বিরাজ স্থির করলেন যে, সুকুমারকে বিষয় থেকে বঞ্চিত কোরে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তিনি কোন হাঁসপাতালে দান কোরে যাবেন। ভুবন সেখানে হাঁসপাতালের পত্তনি করা-মাত্র বিরাজের মনেও সেই রকম একটা কিছু করার কল্পনা হয়েছিল, কিন্তু এতদিন সেটা কল্পনাতেই থেকে গিয়েছিল।

সুকুমারকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করার কথা মনের মধ্যে আলোচনা করতেই বিরাজের মনে পড়ে গেল যে, বিষয়ে তাঁর জীবনসত্ত্ব আছে মাত্র, দান বা বিক্রয় করবার অধিকার তাঁর নাই। যোগেশ উইল করেছিলেন যে, বিরাজ যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি বিষয় ভোগ করবেন, তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর একমাত্র পুত্র সুকুমার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবে। যোগেশ উইল স্ত্রীকে দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর অনুমোদনেই তিনি এই উইল রেজিষ্টারী করেছিলেন। একদিন বিরাজ আনন্দের সঙ্গে যাতে অনুমতি দিয়াছিলেন, আজ তারই জন্য নিজে অনুতপ্ত হোতে লাগলেন। কিন্তু সুকুমার! য়াকে তিনি সংসারে সব থেকে বিশ্বাস করতেন, যে তাঁর গর্ব্ব ছিল, সেই তাঁকে এতবড় আঘাত দিলে! বিরাজমোহিনী দিনরাত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোরেও মনের মধ্যে শান্তি পাচ্ছিলেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর চেহারা এত খারাপ হোয়ে গেল যে, তাঁকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন তিনি সংঘাতিক কোন ব্যারাম থেকে ভুগে উঠেছেন।

সুকুমার মার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল। সে ভেবেছিল যে, তার মার রাগ বা অভিমান দু-দিনেই পড়ে যাবে, কিন্তু বিয়ের দিন এগিয়ে

আসার সঙ্গে সঙ্গে, তার মার গাম্ভীর্য্য নিবিড়তর হোয়ে উঠ্‌ছে দেখে সে মনে মনে ক্ষুন্ন হোতে লাগ্‌ল। বিরাজমোহিনী তার বিয়েতে কারুকে নেমন্তন্ন করলেন না দেখে সে নিজের চার-পাঁচ জন মাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তার বিয়েতে যোগ দেবার জন্য নেমন্তন্ন কোরে রাখ্‌লে।

বিয়ের আগের দিন রাতে বিছানায় পড়ে সুকুমার খালি এ-পাশ ও-পাশ কর্‌ছিল। বিরাজমোহিনীর এই কয়দিনের ব্যবহারে তার চিত্ত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হোয়ে পড়েছিল। শুয়ে শুয়ে সে ভাব্‌ছিল, তাদের এই নতুন জীবন যাত্রার তোরণেই জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু যে, সে এমন কোরে পথ আগ্‌লে দাঁড়াচ্ছে—না জানি সংসার পথে চল্‌তে চল্‌তে কত বাধা কত দিক দিয়ে এসে তাদের পথ রোধ কোরে দাঁড়াবে? এতদিন ধরে তার বুকের মধ্যে মায়ের ওপর যে অভিমান জমা হচ্ছিল, চোখ ফেটে অশ্রুরূপে তা গলে পড়্‌তে লাগ্‌ল। অভিমানের ঢেউয়ে তার যুক্তি তর্ক সব ভেসে যেতে লাগ্‌ল। এই অবস্থায় কারুকে না জানিয়ে তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। এমন যায়গায় যাবে যে, সেখান থেকে আর কেউ তার কোন সংবাদ না পেতে পারে। আর কেউ পাক্ বা না পাক্, অন্ততঃ তার মা যেন তার কোন সংবাদ পেতে না পারেন। নিজের খরচ নিজে চালিয়ে নেবার মতন যোগ্যতা তার আছে। বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে যাবার জন্য তার মনে সত্যি-সত্যিই একটা দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হোতে লাগ্‌ল। কিন্তু তখুনি তার মনের আকাশে একখণ্ড স্বচ্ছ মেঘের মতন লীলার মূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌ল। সুকুমারের মনে হোলো, কাল যদি সোনালীর লোকেরা জান্‌তে পারে যে, সকাল থেকে তার আর কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না, তবে তারা কি ভাব্‌বে? লীলার কি অবস্থা হবে? না—না এমন কাজ সে কখনো কর্‌বে না, সে যে লীলাকে সুখী কর্‌বার প্রতিজ্ঞা কোরে মৃত্যুর কাছ থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছে।

সেদিন রাত্রির সেই ঘটনার কথা মনে পড়তেই তার অন্তরাত্মা শিউরে উঠ্‌ল।

সুকুমার আগেই ঠিক কোরে রেখেছিল যে, সে এক বন্ধুর বাড়ী থেকে বিয়ে কর্‌তে যাবে। বিয়ের দিন পাছে আবার কোনো রকম অশান্তি বাধে সেই ভয়ে সে সকাল বেলা উঠে স্নান কোরেই বেরিয়ে পড়্‌ল। বাড়ী থেকে বেরোবার আগে সুকুমার তার মার পায়ের ধূলো নিতে গিয়ে দেখ্‌লে যে, বিরাজমোহিনী স্থির হোয়ে ড্রইং-রুমের একখানা চেয়ারে বসে আছেন।

বিরাজের মনের মধ্যে এই কদিন ধরে ধীরে ধীরে যে অশান্তি জমা হোয়ে উঠ্‌ছিল, মনের সেই গ্লানি কোন দিক দিয়ে বের কোরে দিতে না পারায় নিজের জ্বালায় তিনি নিজেই জ্বলে-পুড়ে মর্‌ছিলেন। এই জ্বালা অন্তরে নিয়ে সকাল বেলা তিনি চুপ কোরে বসেছিলেন, এমন সময় সুকুমার ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। মায়ের মুখ দেখে সুকুমারের কিছু বল্‌তে ভরসা হচ্ছিল না। খানিক্ চুপ কোরে দাঁড়িয়ে থেকে সে আস্তে আস্তে বল্লে—আমি যাচ্ছি।

বিরাজ তাঁর কথার কোন উত্তর দিলেন না দেখে সে নীচু হোয়ে মার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কোরে উঠে বেরিয়ে গেল, সুকুমারের চোখের এক ফোঁটা জল বিরাজের পায়ের ওপর টল্‌টল্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

মায়েতে ছেলেতে কোন কথা হোলো না বটে, কিন্তু সুকুমার তার সমস্ত হৃদয়টা নিংড়ে মার পায়ের ওপর যে একফোঁটা তপ্ত অশ্রু রেখে গেল সেই একফোঁটা অশ্রুই বিরাজের মাতৃহৃদয়ের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত দুঃখ নিঃশেষে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মাতৃহৃদয়ের কষ্টিপাথরে তখনি তিনি বুঝতে পার্‌লেন যে, সুকুমার অভিমান কোরে চলে গেল। বিদায়ের সময় তার মাথায় আশীর্ব্বাদী চুমু দিলেন না বলে তখুনি তাঁর মনের মধ্যে তীব্র অনুশোচনার

জ্বালা আরম্ভ হোলো। তাঁর মনে পড়্‌ল যে, তাঁর আশীর্ব্বাদ না নিয়ে সুকুমার তো কখনো কোথাও যায়-নি। বিরাজ শিউরে উঠ্‌লেন!

বিরাজের অন্তর চীৎকার কোরে বল্‌তে লাগল, সর্ব্বনাশ! সুকুমার চলে গেছে? হতভাগা ছেলে জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে অভিমান কোরে মায়ের আশীর্ব্বাদ নিলি-না! যে আশীর্ব্বাদ অভেদ-বর্ম্মের মতন এতদিন দেশে বিদেশে তোকে রক্ষা কোরে এসেছে। তিনি কল্পনায় বিভীষিকা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

বিরাজ তখুনি চারিদিকে লোক পাঠালেন, কিন্তু সুকুমারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সুকুমার যে সেদিনের মত বিদায় নিয়ে চলে গেছে এ-কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিলেন না। তাঁর অন্তর থেকে থেকে খালি বল্‌ছিল যে—সুকুমার ফিরে আসবে, এখুনি এসে সে বল্‌বে, মা আমি বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছি, আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

কিন্তু সুকুমার সেদিন আর বাড়ী ফির্‌ল না।

সমস্ত দিন উৎকণ্ঠায়, অনাহারে ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি কোরে সন্ধ্যার পর বিরাজ অবসন্ন হোয়ে পড়্‌লেন। মোহাবিষ্টের মত অন্ধকার ঘরে গিয়ে তাঁর অবসাদগ্রস্ত দেহটা বিছানায় ঢেলে দিলেন।

ভুবনের বাড়ীতে আচার্য্য তখন সুকুমার ও লীলাকে মন্ত্র পড়াচ্ছিলেন—"তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক, আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক।"

মাকে প্রণাম কোরে রাস্তায় বেরিয়ে স্নকুমারের প্রথমেই মনে পড়্‌ল কাল আবার যখন সে বাড়ী ফিরবে, তখন তার জীবনের গতি অন্য দিকে ফিরে গিয়েছে। অবিবাহিত-জীবনের এই যে কয়েকটা ঘণ্টা তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে, সেই সময়টুকু সে তার শৈশবের লীলাভূমিতে কাটাতে পারলে না বলে মনের মধ্যে একটা দারুণ বেদনা অনুভব করতে লাগল। নিজেকে অত্যন্ত হতভাগা বলে মনে হোতে লাগল। পথ চল্‌তে চল্‌তে সে ভাবছিল, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এই তিনটি জিনিষই মানুষের জীবনের সর্ব্ব প্রধান জিনিষ। কিন্তু এই তিনটির ওপরই মানুষের কোন হাত নেই। লীলাকে যে সে বিয়ে করবে, তার সঙ্গে যে লীলার কখনো বিয়ে হোতে পারে; এ কল্পনাই তার মাথায় কখনো আসে-নি। সেদিনকার সেই লীলা! এই তো সেদিন তারা সোনালীতে এসেছে! সে কতদিন হোয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজও মনে হচ্ছে যেন এই তো সেদিন। লীলা তার বাল্যের সঙ্গিনী ছিল। বাল্যের সঙ্গিনীদের সঙ্গে কৈশোরে আর তেমন ভাব থাকে না, কোন কোন ক্ষেত্রে কথা পর্য্যন্ত বন্ধ হোয়ে যায়, কিন্তু লীলার সঙ্গে তার তা হয়-নি। ছুটির সময় দুজনেই কলকাতার বোর্ডিং থেকে যখন বাড়ীতে আস্‌ত, সে সময় আবার তাদের আলাপ জম্‌ত। ছেলেদের স্কুলে ভাল পড়া হয়, না মেয়েদের স্কুলে ভাল পড়া হয়; তাদের স্কুলের থাম মোটা, না লীলাদের স্কুলের থাম মোটা, এই সব তুচ্ছ কথা নিয়ে তর্ক উঠ্‌ত। মতান্তর মাঝে মাঝে মনান্তরে পরিণত হোতো। কিন্তু কয়েকঘণ্টা পরে আবার দেখা হোলেই তারা ঝগড়া ভুলে যেত। তারপর যখন তার মা তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন—যেদিন তিনি তাকে গম্ভীরভাবে

বলে দিলেন—লীলাদের পাড়াতে আর যেও-না, কিংবা তার সঙ্গে কথা বোলো না। মার কথা শুনে সে আশ্চর্য্য হোয়ে তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা কোরে কিছু জানতে পারে-নি। তিনি শুধু বলে দিয়েছিলেন—ওরা ভাল লোক নয়।

ক্রমে বাইরের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেল। এই জনশূন্য সহায়হীন স্থানে ঐ বাড়ীখানার মধ্যে মা আর মেয়েকে কতদিন একলা কাটাতে হয়েছে! সুকুমারের মনে পড়ল, একদিন পথের মাঝে তার সঙ্গে লীলার দেখা হয়েছিল। জন-মানবহীন মাঠের পথে একলা লীলাকে দেখতে পেয়ে সে তার সঙ্গে কথা বল্‌বে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু তার মুখ ফুটে কথা বেরোয়-নি—ঘাড় হেঁট কোরে চলে গিয়েছিল।

বিরাজমোহিনী কোন কারণ না বল্লেও সুকুমার জান্‌তে পেরেছিল যে, লীলাদের নামে সেখানে একটা নিন্দার ঢেউ উঠেছে। অনেক চেষ্টা কোরেও সে এই নিন্দার কারণটা জান্‌তে পারে-নি। লীলার সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা বন্ধ হবার অনেকদিন পরে, তখন সে কলেজে পড়ে, সেই সময় সোনালীর একটি ছেলের কাছে লীলাদের একঘরে করার কারণটা শুন্‌তে পায়। কারণ শুনেই তার সেদিন মনে হয়েছিল যে, তাদের ওপর অবিচার করা হচ্ছে; কিন্তু তার দুর্ব্বল, ভীরু মন তখুনি আবার মার আদেশের চরণতলে লুটিয়ে পড়েছিল। তারপর সংসারের নানা রকম গণ্ডগোলের মধ্যে লীলাদের অস্তিত্ব তার মন থেকে একেবারে মুছেই গিয়েছিল। এই লীলাকে বিয়ে করা তার কি কোরে সম্ভব হচ্ছে! কেমন কোরে যে তার দুর্ব্বল, ভীরু মন এমন বিদ্রোহী হোয়ে উঠ্‌ল, তা সে নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না।

সুকুমার এই সব চিন্তায় বিভোর হোয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সময়ের কোনো জ্ঞান তার ছিল না। হঠাৎ মাঠের ধার

দিয়ে বারোটার ট্রেণ-খানাকে ষ্টেশনের দিকে যেতে দেখেই তার চমক্ ভেঙে গেল। সে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ্‌লে যে, তখন বারোটা। সুকুমার তখুনি সেখান থেকে সেই বন্ধুর বাড়ীর দিকে রওনা হোলো।

পথে যেতে-যেতে সে মনের মধ্যে আলোচনা কর্‌ছিল যে, লীলাকে বিয়ে কোরে বাড়ীতে আনা বোধ হয় মার মনঃপূত হবে না। সে বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছতেই তারা বল্লে যে, তার মা তার খোঁজে সেখানে লোক পাঠিয়েছিলেন। সুকুমার সে কথায় কান না দিয়ে একজনকে নিয়ে একখানা বাড়ী ভাড়া কর্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌তে বেরিয়ে পড়্‌ল।

সুকুমার তার বিয়েতে চারজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিল। অনেক চেষ্টা কোরে সে একজন আচার্য্য ঠিক করেছিল, আর লীলাদের দিক থেকে এক অমৃত, এই ছ-জন; এ-ছাড়া বিয়েতে বাইরের কোন লোক ছিল না। বর-কনে ও আচার্য্যের বসবার জন্য যে জায়গা ঠিক করা হয়েছিল তার পাশে একখানা শোওয়া-চেয়ার পেতে দিয়ে ভুবনকে সেখানে তুলে এনে শুইয়ে দেওয়া হোলো। বিয়েতে কোন গান হোলো না, আচার্য্য যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব উপাসনা কোরে ও উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। শ্রাদ্ধের অভিনয়ে তাদের উদ্বাহ সম্পন্ন হোলো।

বিয়ে হোয়ে যাবার পর উত্তেজনা ও নাড়াচাড়া হওয়ায় ভুবন একটু বেশী অসুস্থ হোয়ে পড়্‌ল। লীলা বিয়ের আসন থেকে উঠেই মার মাথার শিয়রে গিয়ে বস্‌ল। সুকুমারের সঙ্গে যে ক-জন বন্ধু এসেছিল অমৃত ও সুকুমার তাদের খাওয়াবার বন্দোবস্ত কর্‌তে লাগ্‌ল।

বন্ধুদের বিদায় দিয়ে সুকুমার ভুবনের কাছে এসে বসল। ভুবন ততক্ষণে একটু সাম্‌লে উঠেছিল, সুকুমার এসে দেখ্‌লে যে, সে আস্তে-আস্তে লীলার সঙ্গে কথা বল্‌ছে। সে কাছে এসে বস্‌তেই ভুবন তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—লীলাকে কি কাল নিয়ে যাবে?

ভুবনের মুখে প্রশ্ন শুনেই তার মনে হোলো, এই অবস্থায় লীলাকে নিয়ে যাওয়া শোভন হবে কিনা! এ কথাটা তার এতদিন কেন মনে পড়ে-নি তাই ভেবে সে নিজেই আশ্চর্য্য হোয়ে যেতে লাগ্‌ল।

সে বল্লে—আপনি যদি বারণ করেন তবে লীলা এইখানেই থাক। আপনার শরীরটা ভাল হোলে তারপর ওকে নিয়ে যাব।

ভুবন বল্লে—তাতে তোমার মার আপত্তি হবে না?

সুকুমার আমতা আমতা কোরে বল্লে—আমি লীলাকে নিয়ে মার সঙ্গে থাক্‌ব না। আমি আলাদা বাড়ী করেছি।

সুকুমারের কথা শুনে ভুবন চম্‌কে উঠ্‌ল। সে বল্লে—কেন! এ বিয়েতে কি তোমার মা মত দেন-নি? তুমি না বলেছিলে—

ভুবন আর কথা বল্‌তে পার্‌লে না। সে ভয়ানক হাঁপাতে লাগ্‌ল। সুকুমার বুঝলে যে, কোন রকম চিন্তা না কোরে কথাটা বলে ফেলা ঠিক হয়-নি। সে ভুবনকে বল্লে—মা মত দিয়েছিলেন, কিন্তু পাছে ভবিষ্যতে কোনো রকম অশান্তি হয়, সেজন্য আমি আগে থাক্‌তেই আলাদা থাক্‌বার বন্দোবস্ত করেছি।

ভুবন আর কথা বল্‌তে পার্‌ছিল না। তার নিশ্বাস নিতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল, সে আস্তে-আস্তে চোখ দুটো বুঁজিয়ে নিদ্রিতের মত পড়ে রইলো।

সারা-রাত্রি জেগে বসে থেকে সুকুমারের শরীরে একটা অবসাদ এসেছিল। সে বারান্দায় একখানা ইজি-চেয়ারে বসে-বসে তিন পেয়ালা চা খেয়ে শরীরটাকে একটু ধাতস্থ কোরে নিয়ে ভাব্‌ছিল—কি করা যায়? ভেবে ভেবে কোনো উপায় স্থির কর্‌তে না পেরে সে লীলাকে ডেকে বল্লে—লীলা, তবে তুমি এইখানেই থাক, কি বল?

লীলা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বল্লে—তুমিও এখানে থাক না!

সুকুমার যে কি করবে নিজের মনে ভেবে তার কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। সে বাড়ী ভাড়া করেছিল বটে, কিন্তু শুধু বাড়ী পেলে তো আর সংসার করা চলে না। আসবাব, বাসন, সংসারের কাজের নানা রকম খুঁটিনাটি জিনিষ, চাকর ইত্যাদি যে কিছুই ঠিক করা হয়-নি। পরামর্শ কোরে যে একটা কিছু করবে সে রকম লোকও কাছাকাছি পাচ্ছিল না বলেই সে লীলার কাছে কথাটা পেড়েছিল। কিন্তু লীলা আবার তাকে তাদের বাড়ীতে থাকতে বলে আরও মুস্কিলে ফেল্লে।

সুকুমার মার ওপরে অভিমান কোরে স্ত্রীকে নিয়ে অন্য জায়গায় থাকবার জন্য আলাদা বাড়ী করেছিল বটে, কিন্তু সেটা অভিমান মাত্র। লীলা সুকুমারকে তাদের বাড়ীতে থাকতে বলায় প্রথমেই তার মনে হোলো যে, তা হোলে মা কি ভাববেন! মা অনেক সহ্য করেছেন, কিন্তু এতটা সহ্য করা বোধ হয় তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। এ কথা লীলাকে বলা চলে না। আকাশ-পাতাল ভেবে ভেবে যখন সে কিছুতেই কূল পাচ্ছিল না, এমন সময় তাদেরই বাড়ীর একজন চাকর তাকে একখানা চিঠি এনে দিলে। চিঠির ওপরে বিরাজের হাতের লেখা দেখে সে তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়ে পড়তে লাগল।

বিরাজ সুকুমারের খোঁজ করতে করতে জানতে পেরেছিলেন যে, সে বিয়ের পর লীলাকে নিয়ে থাকবার জন্য আলাদা বাড়ী ঠিক করেছে। কাল সমস্ত দিনরাত্রি এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর মনের মধ্যে দারুণ অন্তর্দ্দাহ গিয়েছে। সকালে উঠে তিনি সুকুমারকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে, আর কোথাও না গিয়ে সে যেন লীলাকে নিয়ে সোজা বাড়ীতে চলে আসে।

প্রায় মাসখানেক ধরে সুকুমারের অন্তরে যে অভিমান জমা হোয়ে ছিল মার চিঠি পড়ে এক মুহূর্ত্তেই তা ভেসে চলে গেল। আনন্দে তার শিরার

মধ্যে রক্ত চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌ল। এই মার ওপরে সে কি কঠোর, কি নির্দ্দয় ব্যবহার করেছে মনে কোরে লজ্জায় তার মনটা নুয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সুকুমার সেইখানে বসে-বসেই ডাক্‌লে—লীলা—লীলা—

শেষ রাত্রের দিকে ঘণ্টা দুই তিন ঘুমিয়ে ভুবন জেগে উঠেছিল। অমৃত সকাল বেলা প্রায়ই ভুবনের কাছে থাক্‌তে পার্‌ত না। সে সময় ভুবনের যা কিছু পরিচর্য্যা লীলাকেই কর্‌তে হোতো। সেদিন সকালে লীলা ভুবনের মুখ ধুইয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কথা বল্‌ছে, এমন সময় সুকুমার চিঠি হাতে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল। সুকুমার ভুবনকে বল্লে—এই দেখুন, মা এখুনি আমাদের যাবার জন্য লিখে পাঠিয়েছেন। সুকুমারের কথা শুনে ভুবন একেবারে বিছানার ওপর উঠে বস্‌ল। তার রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখ লাল হোয়ে উঠ্‌ল। লীলা তখুনি তাকে ধরে আবার শুইয়ে দিলে। ভুবন বল্লে—লীলা কাপড়-চোপড় পরে নাও—

ভুবনের কথার মাঝখানেই লীলা সুকুমারের দিকে চেয়ে বল্লে—মাকে এই অবস্থায় ফেলে—

ভুবন বল্লে—না—না, তোমার শাশুড়ী যখন যেতে লিখেছেন তখন আর দেরী করা উচিত হবে না। তোমরা বেরিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হও।

লীলা একবার সুকুমারের দিকে তাকালে। সে দৃষ্টিতে তার হৃদয়ের ছবিখানা ঝক্‌ঝক্‌ কোরে চোখের ওপর ফুটে উঠ্‌ল। কিন্তু আনন্দে আত্মহারা সুকুমার সে ভাষা বুঝতে পার্‌লে না। সে লীলাকে বল্লে—লীলা কাপড় পরে নাও।

লীলা তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লীলা বিয়ের সাড়ীখানা পরে তখুনি ফিরে এল। সুকুমার তখনো সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে কোন দিকে না চেয়ে একেবারে সোজা গিয়ে ভুবনকে প্রণাম করলে। ভুবন উঠে বসে লীলাকে জড়িয়ে ধরলে। তার বুকের মধ্যে যে ঝড় উঠেছিল, তারই একটু নিশানা চোখের কোনে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে লীলার মাথায় চুমু দিয়ে বল্লে—জন্ম এয়োস্ত্রী হও।

লীলা আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লীলা বাইরে চলে গেলে সুকুমার গিয়ে ভুবনকে প্রণাম করলে। ভুবন তাকে আশীর্ব্বাদ কোরে বল্লে—আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি সুখী হও—

তারপর একটু চুপ্‌ কোরে থেকে অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বল্লে—লীলা বড় অভিমানী মেয়ে বাবা—তার কথায় কোনো দোষ নিও-না।

সুকুমার বুঝতে পেরেছিল যে, লীলার বাড়ী যাওয়া সম্পর্কে তার মার সঙ্গে যে-সব কথাবার্ত্তা হবে সেগুলো হয়তো তেমন প্রীতিকর হবে না। লীলা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, মার কথা শুনে ফেলাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই আগে থাকৃতেই সে যতটা সম্ভব আস্তে কথা সুরু করলে।

মাকে দেখ্‌তে যাওয়ার অনুমতি চাইবার কি ফল হয়, তা জানবার জন্য লীলা উদগ্রীব হোয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে বিরাজ ও সুকুমারের কোন কথাই শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে বিরাজের গলার এক-একটা কথা ঠিক্‌রে এসে তার কানে লাগ্‌ছিল। কিন্তু সে-সব অসংলগ্ন কথার মানে সে কিছুই ধর্‌তে পার্‌ছিল না। তবে বিরাজের কথার সুরে সে বেশ বুঝতে পারছিল যে, সুকুমারের প্রস্তাবটা তাঁর বিশেষ প্রীতিকর হয়-নি। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকৃতে-থাকৃতেই তার মনে হোতে লাগ্‌ল যে, মাকে দেখ্‌তে যাওয়ার অনুমতির জন্য সুকুমারকে পাঠান ঠিক হয়-নি।

সুকুমারের কি একটা কথার জবাবে বিরাজ হঠাৎ চীৎকার কোরে বলে উঠ্‌লেন—মাকে দেখ্‌তে যাবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? ও-রকম মার সঙ্গে সম্পর্ক রাখ্‌তে হয়তো সেখানে গিয়েই থাকুক্‌ না! এখানে থেকে ও-সব চল্‌বে না।

সুকুমার তাড়াতাড়ি বল্লে—আঃ-মা, আস্তে—

বিরাজের শেষবারের প্রত্যেকটি কথা লীলার কানে গিয়েছিল। সে ভাব্‌লে যে, তখুনি ঘরের মধ্যে ঢুকে একবার বিরাজকে জিজ্ঞাসা করে যে, মুমূর্ষু মাকে দেখ্‌তে যেতে চাওয়ায় কি দোষ হয়েছে! কিন্তু সে নিজেকে সংযত কোরে সেখান থেকে সরে গিয়ে একেবারে বাগানে চলে গেল সমস্ত বিকেলটা সে বাগানে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিলে। সুকুমারকে

অনুমতি চাইবার জন্য অনুরোধ করেছিল বলে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগ্‌ল। বিরাজের কথাগুলো তার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেই জ্বালা নিয়ে সে বাগানে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল।

সুকুমার বুঝতে পেরেছিল যে, তার মার কথাগুলো নিশ্চয় লীলা শুন্‌তে পেয়েছে। বিরাজের সেই কথা শুনে সে আর এ-সম্বন্ধে একটি কথা না বলে চুপ্ কোরে গিয়েছিল, তার ভয় হচ্ছিল যে, এ বিষয় নিয়ে আরও জেদাজেদি কর্‌লে হয়তো তার মার মুখ দিয়ে এমন সব কথা বেরোবে, যা শুন্‌লে লীলা মর্ম্মান্তিক আঘাত পাবে। মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ কোরে সে সঙ্কোচে ঘরের ভেতর থেকে বেরুতে পার্‌ছিল না। সে ভাব্‌ছিল, মার কথা শুনে লীলা না জানি কত আঘাতই পেয়েছে? কি বলেই বা তাকে সান্ত্বনা দেবে? মার কাছে একটা চেয়ারে বসে বসে সে এই সব চিন্তায় বিভোর হোয়ে রইলো। কতক্ষণ সে এই চিন্তায় বিভোর হোয়ে বসে ছিল তা সে বুঝতে পারে-নি। চমক্ ভেঙে যেতে সে দেখ্‌লে যে, বিরাজ সেখান থেকে উঠে গিয়েছেন, বেলা পড়ে গিয়েছে।

লীলার কাছে মুখ দেখাতে সুকুমারের ভয়ানক লজ্জা কর্‌ছিল। চেয়ারে থেকে উঠে আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে লীলা যে ঘরে বসেছিল সেই ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে যে, লীলা সেখানে বসে নেই। লীলাকে যে কি বল্‌বে তা সে এখনো ঠিক কর্‌তে পারে-নি; তবে তার মা যে-সব কথা বলেছিলেন ঠিক সেই কথা-গুলো যে বল্‌বে না সেটা ঠিক হোয়ে গিয়েছিল! ঘরের মধ্যে গিয়ে যথন সে দেখ্‌লে যে, লীলা সেখানে নাই, তখন তার বুকের ওপর থেকে যেন একটা গুরুভার নেমে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সোনালীর লাইব্রেরীতে "নারী-সমস্যা" সম্বন্ধে

তার একটা বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। সে লীলার সঙ্গে দেখা না কোরেই জুতো পায়ে দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

বিরাজমোহিনী রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় উপাসনা করতেন। তাঁর সঙ্গে সুকুমারকেও উপাসনায় বস্‌তে হোতো। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর প্রায়ই সন্ধ্যার সময় কাজের জন্য সুকুমারকে বাইরে থাক্‌তে হোতো বলে সন্ধ্যার উপাসনায় সে বস্‌তে পার্‌ত না। লীলা আসার পর থেকে বিরাজ তাকে নিয়েই উপাসনা করতেন। বিরাজ ভাবতেন যে, লীলা যে পরিবারের মেয়ে, তাতে তার চরিত্রের গতি স্বভাবতঃই মন্দের দিকে যাবে; তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর সংস্পর্শে এসে লীলার চরিত্র সংশোধিত হোয়ে যেতে পারে। উপাসনায় বসে নিত্য সকালে ও সন্ধ্যায় একঘণ্টা কোরে বিরাজ লীলাকে উপদেশ দিতেন। উপদেশের সময় একটা কথা তিনি বরাবরই লীলাকে শুনিয়ে রাখ্‌তেন—তুমি যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে এসেছ, সর্ব্বদা সে পরিবারের মর্য্যাদা রেখে চল্‌বার চেষ্টা কোরো। এ জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, তিনি তোমার অন্তরে শক্তি দেবেন।

দু-বেলা এ-রকম কোরে উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও লীলা তার মাকে দেখ্‌তে যেতে চাওয়ায় বিরাজ সেদিন তার ওপর বিশেষ বিরক্ত হয়েছিলেন। লীলা আসার পর উপাসনার জায়গা করার ভার তার ওপরেই পড়েছিল। সে-ই ঘরে আলো জ্বালিয়ে, আসন পেতে জলচৌকি-খানা আসনের সাম্‌নে রেখে সব ঠিক্‌ঠাক্ কোরে বিরাজকে খবর দিত।

সেদিন সন্ধ্যা উৎরে যাবার পরও লীলা উপাসনার কোনো রকম বন্দোবস্ত করছে না দেখে বিরাজ ক্রমেই চটে উঠ্‌ছিলেন। উপাসনা বস্‌বার নির্দ্দিষ্ট সময় পার হোয়ে যাওয়ার পর বিরাজ বাগানে গিয়ে

দেখ্‌লেন যে, লীলা সেই অন্ধকারে একখানা লোহার বেঞ্চির ওপরে স্থির হোয়ে বসে আছে। তিনি একটু রুক্ষস্বরে লীলাকে বল্লেন—আজকে কি উপাসনা কর্‌তে হবে না? সে বসে কি এত ভাবনা হচ্ছে শুনি—ভগবানের নাম কর্‌তে হোলে এদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়।

লীলা নিজের চিন্তায় বিভোর হোয়ে বসেছিল, সময়ের কোনো জ্ঞানই তার ছিল না, হঠাৎ শাশুড়ীর গলা তার কানে যেতেই সে চম্‌কে উঠ্‌ল। বিরাজ নিজে উপাসনার জায়গা কোরে লীলাকে ডাক্‌তে এসেছিলেন, লীলা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর পেছু-পেছু গিয়ে সেখানে বসে পড়্‌ল।

বিরাজের স্বভাবতঃ দীর্ঘ উপদেশ সেদিন প্রায় আরও ঘণ্টাখানেক ধরে চল্‌ল। অন্য দিন লীলা বসে-বসে এই উপদেশ শুনতে চেষ্টা কর্‌ত, কিন্তু সেদিন কোনো কথা তার কানে যাচ্ছিল না; তার দুই কান মায়ের ডাকে ভরে উঠেছিল। সমস্ত সময়টা সে শুন্‌ছিল, ভুবন যেন তাকে ডাক্‌ছে—লীলা মা আমার, একবার আয়—

সেদিন সন্ধ্যাবেলা স্থকুমারের বক্তৃতা খুব জমে গিয়েছিল। সুকুমার ভাল বক্তা, তার ওপরে সেদিনকার বিষয়টাও খুব হৃদয়গ্রাহী ছিল। সে সময় আবার কিসের একটা ছুটিতে সোনালীর যে-সব ছেলেরা বাইরে থাকে তারা সোনালীতে এসেছিল। অন্য অন্য দিনের চেয়ে সে জন্য এবারকার বক্তৃতায় ভিড়ও খুব হয়েছিল। সুকুমার তার ওজস্বিনী ভাষায় আমাদের দেশের শাস্ত্রকারদের নানারকম বিশেষণে অভিহিত কোরে, তাদের অমানুষিকতা তন্ন-তন্ন কোরে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। পাশ্চাত্য দেশের সফ্রীগেট রমণীরা সফরীর মতন গণ্ডূষমাত্র জলে শুধু আন্দোলন তুলে ক্ষান্ত না হোয়ে মধ্যে মধ্যে জোয়ান পুরুষদেরও ধরে রাস্তায় কি রকম প্রহার দেয়, তারই দু-একটা

দৃষ্টান্ত দিয়ে সেদিনকার সভা সে খুবই জমিয়ে দিলে। সভা ভেঙে যাওয়ার পর ছেলেরা তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে, তাকে একটা সাজান গাড়ীতে তুলে নিজেরাই গাড়ী টান্তে টান্তে তাকে বাড়ীতে নিয়ে এল। ছেলেরা যে তাকে নিয়ে এতটা কর্বার বন্দোবস্ত করেছে, তা সে মোটেই জান্ত না। বাড়ীতে এসে সে ছেলেদের সেখানে খেয়ে যেতে বল্লে।

ছেলেদের বিদায় দিয়ে চাকর-বাকরদের খাওয়া হোয়ে যাবার পর সুকুমার ও লীলা যখন বিছানায় এসে শুলে, তখন রাত্রি বারোটা বেজে গিয়েছে। সুকুমারকে ছেলেদের সঙ্গেই খেতে বস্তে হয়েছিল। লীলাকে ছেলেদের পরিবেশন কর্তে ও রান্নারও কিছু কিছু জোগান দিতে হয়েছিল, তার আর কিছু খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না! সে কিছু না খেয়েই শুয়েছিল।

প্রশংসার নেশায় মাতাল সুকুমারের কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিল না। তার জীবনে আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে! তার মনে পড়ছিল, বহুদিন আগে তারা যখন কলকাতায় কলেজে পড়্‌ত, তখন একজন বাঙালী নেতাকে তারা এম্‌নি কোরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। যদিও তাঁর কার্য্যক্ষেত্র ছোট, তবুও কে জানে, দেশের কাজ কোরে সে-ও দেশবাসীর তেমনি শ্রদ্ধা অর্জ্জন কর্‌বে কিনা? সেদিন ছাত্রেরা যখন দেশ-নায়কের গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন গাড়ীর সেই দড়িটা ধরে টান্‌বার জন্য তাকে কি রকম ঠেলাঠেলি কর্‌তে হয়েছিল, সে ছবিটা তার চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ কোরে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

লীলার কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিল না। সন্ধ্যার সময় সহস্র কর্ম্ম ও গোলোযোগের মধ্যেও তার মনের সাম্‌নে থেকে থেকে তার মার বিষাদমাখা মুখখানা ভেসে উঠ্‌ছিল। কাজকর্ম্ম সেরে বিছানায় এসে

শুয়েও সে মার চিন্তার হাত থেকে নিজের মনকে মুক্ত করতে পারছিল না। সে একবার পাশ ফিরতেই সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে—লীলা এখনো ঘুমোও-নি?

লীলার গলার স্বর শুনেই সুকুমারের ধাঁ কোরে আজকের বিকেলের কথাটা মনে পড়ে গেল। কিন্তু সেই সব অপ্রীতিকর কথা তুলতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাকে সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্রশংসার তরল আনন্দের ওপরে লজ্জার একটা ছোট্ট বুদ্বুদ ভেসে ভেসে তার মনকে পীড়া দিতে লাগল। অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকার পর সে আবার লীলাকে জিজ্ঞাসা করলে—লীলা, তোমার মার কোনো খোঁজ পেয়েছ?

—না।

—ভালই আছেন,—নিশ্চয়ই।

লীলা ব্যগ্র হোয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি মাকে দেখতে গিয়েছিলে?

সুকুমার একটু কুণ্ঠিত হোয়ে বল্লে—না, কিছু হোলে অমৃত নিশ্চয় খবর দিত।

লীলা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না। তার শুধু মনে হোতে লাগল যে, অমৃত-দা খবর না দিলে আজ আর তার মার সংবাদ পাবার উপায় নাই। মার অসুখ ও সঙ্গে সঙ্গে অমৃতর কথা হওয়াতে বহুদিন বিস্মৃত একটা ঘটনার কথা তার মনে পড়ে গেল। মার অসুখের সংবাদ পেয়ে সে বোর্ডিং থেকে অমৃতকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কি আকুল হোয়েই সে বাড়ীতে ছুটে এসেছিল! সেইবার বাড়ীতে আসার পর থেকেই তার জীবনের ওপর দিয়ে কি ঝড়ই না বয়ে চলেছে। তারই কিছুদিন পরে সেই সংবাদ—সেই সাংঘাতিক ইতিহাস, তার কাছে কেমন

কোরে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে কথা যদি চিরদিন তার কাছে আত্মগোপন কোরেই থাকৃত, তা হোলে কি ক্ষতি হোতো? কিছুই না। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক রকম ভাবনায় তার মাথা গরম হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে বিছানা থেকে উঠে মুখে ও মাথায় জল দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়্‌ল।

রাত্রি প্রায় চারটার সময় দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে সুকুমার ও লীলা দু-জনেরই ঘুম ভেঙে গেল। সুকুমার উঠে দরজা খুলে দেখ্‌লে যে, তাদের একজন চাকর একটা লণ্ঠন নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সুকুমার তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি রে কালুয়া?

কালুয়া বল্লে—অমৃত বাবু এসে বলে গেলেন ও-বাড়ীর মার অসুখ বড্ড বেড়েছে। দাদাবাবু ও বউমা যেন এখুনি সেখানে যায়।

গোলমালে বিরাজমোহিনীও উঠে পড়েছিলেন। তিনি কালুয়াকে বলে দিলেন—তুই বাবুদের সঙ্গে লণ্ঠন নিয়ে যা।

সুকুমার ও লীলা ছুট্‌তে ছুট্‌তে ভুবনের ঘরে এসে দেখ্‌লে যে, ভুবন স্থির হোয়ে পড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে একটা হেঁচ্‌কি উঠ্‌ছে তাতেই মাত্র প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়! ভুবনের শিয়রে খাটের একধারে অমৃত ও অন্যধারে একজন ডাক্তার বসে ছিলেন। তারা ঘরে ঢুকৃতেই ডাক্তার তাঁর জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে নেমে দাঁড়ালেন, লীলা আস্তে আস্তে সেইখানে গিয়ে বস্‌ল।

মার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে লীলা জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ দেখ্‌তে লাগ্‌ল। জীবন-মৃত্যুর এই দ্বন্দ্ব এইখানে বসে এর আগেও সে অনেকবার দেখেছে, কিন্তু তখন বার-বার মৃত্যুই পরাজিত হয়েছে। আজ মরণ এসে এ দেহখানার ষোলো আনা অধিকার কোরে ফেলেছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ সে চীৎকার কোরে কেঁদে উঠল—মাগো আমায়

ফেলে তুমি কোথায় চল্লে, এরা আমায় তোমার কাছে আস্‌তে দেয়-নি—

ভুবনের শ্রবণ তখন মৃত্যুর অমৃত-মন্ত্রে ভরে গিয়েছিল, লীলার আর্ত্ত-নাদের একটি বর্ণও তার কানে পৌঁছল না।

ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে ভুবনের আত্মা মুক্ত আকাশে মিলিয়ে গেল।

বাইরের সুখ-দুঃখকে লীলা অন্তর থেকে যতই ঝেড়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করুক না কেন, এ-গুলোর আক্রমণ থেকে সে কিছুতেই মুক্ত হোতে পারছিল না। সুকুমারকে সে ভালবাসতো না. বরং তাদের ওপর তার একটা ঘৃণাই ছিল। কিন্তু যেদিন সে অ-দৃষ্ট শক্তির বিধানকে ষোলো আনা স্বীকার কোরে নিলে, যেদিন সে নিজেকে এই শক্তির মুখে ভাসিয়ে দিয়ে বলেছিল—তবে এই শক্তিই জয়যুক্ত হোক, যা প্রতিপদে আমাকে, আমার বুদ্ধিকে, আমার শক্তিকে বাধা দিয়ে চলেছে, যেদিন সে মনে করেছিল যে, জীবনের বড় বড় বিপদগুলোই মাথার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে—সেদিন তার মনে হয়েছিল, আর কি আস্‌বে এস, কিছুতেই আমি বাধা দেব না, কারণ বাধা দেবার শক্তি আমার নাই; সুকুমার সেই সময় তাকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিল। তাকে পতিত্বে বরণ করাকে লীলা সুখ কিংবা দুঃখ কোনো কোঠার মধ্যেই ধরে-নি। তার মনে সেদিন যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তার মধ্যে এই শক্তির ওপর কতটা অভিমান আর আক্রোশ ছিল, তার খোঁজ সে নিজেই রাখে-নি। এই অভিমান তার অন্তরের একটা জায়গা দুর্ব্বল কোরে রেখেছিল, তাই বাইরের আক্রমণে যখন তখন সে কাবু হোয়ে পড়তে লাগল।

মার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই যেন লীলার পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন আল্‌গা হোয়ে গেল। সে বাড়ী থেকে কোথাও যেত না। বিরাজমোহিনী তাকে কয়েকবার মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বার-কয়েক যাবার পরই তিনি আবার আগের মতন একলাই মন্দিরে যাতায়াত কর্‌তে লাগ্‌লেন। লীলার কোথাও যাবার আগ্রহও ছিল না। মাঝে মাঝে তার

অমৃতকে দেখতে ইচ্ছা করত—তার দিনগুলো না জানি কেমন কাটছে, তাই জানত ইচ্ছা হোতো। কিন্তু অমৃতর সঙ্গে এ-বাড়ীর কি রকম সম্বন্ধ তা সে জানত। সেই জন্যই ইচ্ছা থাকলেও অমৃতদের বাড়ীতে যাওয়ার কথা সে স্বামীকে কিংবা শ্বাশুড়ীকে কিছু বলে-নি। শ্বাশুড়ী কিংবা স্বামীর কাছ থেকে কোনো রকম অনুগ্রহ নিতে তার মন সঙ্কুচিত হোয়ে উঠত।

বাইরের কাজে সুকুমার দিনে দিনে এতই জড়িয়ে পড়তে লাগল যে, ঘরের খোঁজ নেবার তার আর অবসরই হোতো না। কোথায় কে কি লিখেছে, কোন ইংরেজ তার খনির শ্রমজীবীদের ওপর কি অত্যাচার করে, এ-ছাড়া অন্য কোনো কথা প্রায়ই তার লীলার সঙ্গে হোতো না। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হোতে না হোতেই যে আলগা হোয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে, সে সন্ধান সুকুমার রাখছিল না।

বিরাজ লীলার ওপর তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট তা লীলা চেষ্টা কোরেও বুঝতে পারত না। লীলার প্রশংসার মধ্যেও তিনি এমন একটু বিষের হুল ফুটিয়ে দিতেন যে, সে বিষের জ্বালায় তাকে কয়েকদিন ধরে ছটফট করতে হোতো। একবার কলকাতা থেকে একটি পরিবার সোনালীতে দিন-কয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছিলেন। এঁদের সঙ্গে বিরাজদের বহু দিনের পরিচয়। এখানে আসবার পর বিরাজ একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে লীলার সমবয়সী দুটি মেয়ে ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ড্রইং-রুমে বসে গল্প হচ্ছে, এমন সময় আগন্তুক গিন্নি বল্লেন— বিরাজ তোমার বউমা-টি কিন্তু বড় লক্ষ্মী হয়েছে বাপু।

বিরাজ বল্লেন—হ্যাঁ, কিন্তু সুকুমার যখন ওকে বিয়ে করে, তখন আমার বড় ভয় হয়েছিল। কি জানি যে, মায়ের মেয়ে, শেষে একটা কাণ্ড বাধিয়ে না বসে।

আগন্তুক গিন্নি বোধ হয় লীলার সমস্ত ইতিহাসই জানতেন, তিনি

হাঁসপাতাল তৈরির কাজে খেটে খেটে অমৃতর শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়্‌ছিল। ঠিক সেই সময় থেকে আবার ভুবনের অসুখের বাড়াবাড়ি আরম্ভ হোলো। ভুবনের মৃত্যুর প্রায় দু-মাস আগে থেকে অমৃতকে রোজই রাত জাগ্‌তে হোতো। মারা যাবার আগে প্রায় সাত আট মাস ধরে ভুবনকে বিছানায় পড়ে থাকৃতে হয়েছিল। এই সময়টা দু-চার দিন অন্তরেই তার অসুখের বাড়াবাড়ি হোতো। বিয়ে হবার আগে লীলা তাকে সব সময়েই সাহায্য করৃত, কিন্তু তার হঠাৎ বিয়ে হোয়ে যাওয়ায় অমৃতকে একলাই সব দিক সাম্‌লাতে হোতো। ভুবনের মৃত্যুর পর তাকেও একবার বিছানা নিতে হয়েছিল। এই সময় একদিন কাশ্‌তে কাশ্‌তে তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল, কিন্তু সে-রক্তকে সে তথন মৃত্যুর দূত বলে ঠিক চিন্‌তে পারে-নি। মাসখানেক বিছানায় পড়ে থাকার পর আবার সে উঠে হাঁসপাতালের কাজে লেগে গেল। ভুবনের শেষ অনুরোধটা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি কাজে পরিণত করৃবার জন্য সে উঠে-পড়ে লেগে বছরখানেকের ভেতরেই শেষ কোরে ফেল্লে। ডাক্তার, নার্স, ডিস্‌পেনসারী সব বন্দোবস্ত কোরে নিশ্চিন্ত হোয়ে সে একেবারে বিছানা নিলে।

প্রথমে কয়েকদিন প্রবল জ্বর ও কাশী, তারপরে ঘুস্‌ঘুসে জ্বর ও খুক্‌খুকে কাশী, এম্‌নি চল্‌তে লাগ্‌ল। একদিন সকাল বেলা, মুখ ধুতে-ধুতে সে খানিকটা রক্ত বমি কোরে অসাড় হোয়ে পড়্‌ল। হাঁসপাতালের ডাক্তার এসে বুক পরীক্ষা কোরে বল্লেন—দুটো ফুস্‌ফুসই পচে গিয়েছে, অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়।

অমৃতর সঙ্গে বেশী লোকজনের মেলামেশা ছিল না বটে, কিন্তু যাদের সঙ্গে সে মেলামেশা করৃত সে তাদের অন্তরঙ্গ হোয়ে পড়্‌ত। তাদের অন্তরের সঙ্গে তার এমন পরিচয় হোয়ে যেত যে, তাদের সম্বন্ধে কিছু ভুল ভাবা কিংবা করা তার কাছে অসম্ভব বলে মনে হোতো। কিন্তু সেদিন রাত্রে লীলা যখন ভুবনের কাছে এসে মৌন-ভাষায় জানিয়ে দিলে যে, সুকুমারকে বিয়ে করৃতে তার কোনো আপত্তি নাই, তখন সে ভয়ানক আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। এত আশ্চর্য্য সে জীবনে কখনো হয়-নি।

হাঁসপাতালের কাজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই অমৃত সুহাসিনীকে কলকাতায় নার্সের কাজ শেখবার জন্য রেখে এসেছিল। অমৃত তাকে বুঝিয়েছিল যে, কোনো কাজ না কোরে চুপ্‌চাপ বসে থাকার চেয়ে যন্ত্রণা আর নাই। সুহাসিনীও কোনো কাজ না কোরে বসে থেকে-থেকে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল। অমৃতর দেখাদেখি সে-ও সেবার কাজে আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হোলো। নার্সের কাজ শিখে সোনালীতে ফিরে এসে ভুবনের হাঁসপাতালে কাজ করৃবে এই তার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেখানে এসেই প্রথমে অমৃতর সেবার ভার তার ওপর পড়্‌ল।

অমৃত মৃত্যু-দূতের হাতে নিজের হাত সঁপে দিয়ে নির্ভয়ে মরণের পথে এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। সংসারের সমস্ত রকম বন্ধন থেকে সে যতটা সম্ভব নিজেকে মুক্ত কোরে রেখেছিল; কেবল একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিল না। তার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা শুনে শত্রু-মিত্র অনেকেই তার সঙ্গে দেখা করৃতে আস্‌ত। প্রতি বারই দরজা খোলার শব্দ শুনে তার মনে হোতো—এই—এই বুঝি সে এল।

রোগ-শয্যায় পড়ে পড়ে অমৃত শুধু ভাব্‌ত—এত লোক তাকে দেখতে আসে, কৈ সে তো এল না! সোনালীময় তার অসুখের কথা

রটে গিয়েছে, সে খবর কি লীলা পায়-নি? অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার খাতিরেও তার একবার আসা উচিত ছিল। কখনো বা তার মনে হোতো—কিসের কৃতজ্ঞতা? চাইনা—চাইনা—এতদিনের বন্ধন সে কি শুধু শুক্‌নো একটু কৃতজ্ঞতার ভিখারী? কিন্তু কিছুতেই তার মন বুঝতে চাইতো না, মৃত্যুর পূর্ব্বে লীলাকে একবার দেখ্‌বার জন্য তার সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ হোয়ে বসেছিল। কিন্তু কোথায় লীলা! অমৃত ভাব্‌ত—একে একে এম্‌নি কোরে তার গোনাগুন্তি দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। রোগের যন্ত্রণায় সে রাত্রে ঘুমুতে পার্‌ত না। পাছে সুহাসিনীর কষ্ট হয় সেই ভয়ে সে চুপ্‌ কোরে পড়ে থাক্‌ত। নির্জ্জন ঘরে কুলুঙ্গীর মধ্যে ঘড়িটা টক্‌টক্‌, টকাটক্‌ কোরে চল্‌তে থাক্‌ত, আর তার বুকের মধ্যে কে যেন ঘা দিয়ে দিয়ে বল্‌ত—চলেছে দিন, চলেছে রাত,—শেষরাত্রে সোনালীর ষ্টেশন থেকে একটা ট্রেণ ছাড়্‌ত। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ্‌ কোরে ট্রেণের চলার খটাখট্‌, খড়াখট্‌ আওয়াজ তার বুকের মধ্যে একটা নাচন তুলে দিয়ে দূরে বহুদূরে মিলিয়ে যেত যেন বল্‌তে বল্‌তে—চলেছে দিন, চলেছে রাত। অমৃত ভাব্‌ত এমনি কোরে কত সকাল, কত সন্ধ্যা কেটে গেল, কৈ লীলা তো এল না। কখ্‌নো বা তার মনে হোতো, লীলা হয়তো ইচ্ছা কোরেই তার কাছে আস্‌ছে না। সে বেচারী সবে-মাত্র জীবনযাত্রা সুরু করেছে, এখন তার এ দৃশ্য সহ্য হবে না। বুকের ভেতর কে যেন গেয়ে উঠ্‌ত—তোমার হোলো সুরু, আমার হোলো সারা...

অমৃতের অসুখের সংবাদ লীলা সত্য-সত্যই পায় নি! একেই সে বাড়ী থেকে কোথাও যেত না, তার ওপরে লীলাদের বাড়ী থেকে অমৃতর বাড়ী অনেক দূরে। অমৃতও তার কাছে কোন সংবাদ পাঠায় নি। বিরাজ অমৃতর অসুখের কথা শুনেছিলেন, কিন্তু নিতান্ত দরকার

বিবেচনা না কর্‌লে লীলার সঙ্গে তিনি কোন কথা বল্‌তেন না। কাজেই অমৃতর অসুখের কথা লীলার কানে পৌছন সম্ভব ছিল না। সুকুমার অমৃতর অবস্থা বেশ ভাল কোরেই জান্‌ত। হাঁসপাতালের পরিচালকদের মধ্যে সুকুমারেরও নাম ছিল। এই নিয়ে অমৃতর সঙ্গে মাঝে মাঝে তার পরামর্শ কর্‌বার দরকার হোতো বলে অমৃতর সংবাদ তাকে বিশেষ কোরেই রাখ্‌তে হোতো। কিন্তু তার অসুখের কথা সে-ও লীলাকে কিছুই বলে-নি। সুকুমারের সঙ্গেও লীলার কথাবার্ত্তা কমে এসেছিল, তার কারণ সে কাজের মধ্যে ফুরসতই পেত না। বাইরের ও প্রেসের কাজ সেরে রাত্রে সুকুমার যখন বাড়ী ফির্‌ত, তখন আর তার গল্প কর্‌বার ধৈর্য্য থাকৃত না। খেয়ে-দেয়ে বিছানায় পড়্‌তে না পড়্‌তেই সে ঘুমিয়ে পড়্‌ত।

সেদিন সুকুমারের শরীরটা খারাপ থাকায় সে সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরেছিল। খাওয়ার পর সে লীলার সঙ্গে বসে গল্প কর্‌ছিল। এ-কথা সে-কথার পর সে লীলাকে বল্লে—সরকার মশায়ের ছেলের বড় ব্যারাম, বোধ হয় বাঁচবে না।

লীলা কিছু বুঝতে না পেরে বল্লে—কে সরকার মশায়?

—আরে, অমৃত—অমৃত! তোমাদের হাঁসপাতালের—

লীলার মুখের দিকে হঠাৎ চোখ পড়্‌তেই সুকুমারের কথা থেমে গেল। সে দেখ্‌লে হঠাৎ লীলার মুখখানা একেবারে কাগজের মত শাদা হোয়ে গিয়েছে। সুকুমার তাড়াতাড়ি উঠে এসে ব্যস্ত-সমস্ত হোয়ে লীলার হাত ধর্‌লে—কি—কি লীলা! কি হয়েছে—অসুখ কর্‌ছে?

লীলা ধীরে ধীরে তার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বল্লে—না কিছু, হয়-নি, —অমৃত-দার কতদিন অসুখ হয়েছে?

লীলার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে সুকুমারের ভয় হোয়ে গিয়েছিল।

সুকুমারের ভয় হোতো যে, লীলারও তার মার মত বুকের অসুখ হোতে পারে। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কাল থেকেই লীলাকে 'কড লিভার ওয়েল' খাওয়ানোর বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে।

লীলা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—অমৃত-দার কতদিন হোলো অসুখ হয়েছে ?

সুকুমার একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বল্লে—অসুখ তো অনেক দিনই হয়েছে, কিন্তু এতদিন সে-ও কারো কাছে বলে-নি, আমরাও কিছু জান্‌তে পারি-নি। ডাক্তার সাহেব সেদিন তার বুক দেখে বলে গিয়েছেন বাঁচবার আর কোনো আশা নেই।

লীলা সুকুমারের কথার কোনো জবাব দিল না। সুকুমার অনর্গল বকে যাচ্ছিল—নানা বিষয়ের নানা কথা। গুমোট সন্ধ্যায় মাঠের গাছগুলো যেমন স্থির হোয়ে ঝিমিয়ে পড়ে, লীলার মনটাও তেম্‌নি ঝিমিয়ে পড়েছিল। মধ্যে মধ্যে সুকুমারের এক-একটা কথা তার কানের মধ্যে ঢুকে মনের ওপর একটা ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গ তুলে দিয়ে যাচ্ছিল মাত্র। অনেকক্ষণ বকে যাবার পর সুকুমারের মনে হোলো, লীলা যেন তার কথা শুন্‌ছে না। সে বল্লে—লীলা তোমার শরীরটা আজ ভাল নেই বুঝি ?

লীলা তার কথার কোনো উত্তর দিলে না। কথা বলবার তার মোটেই ইচ্ছা কর্‌ছিল না। সে ভাব্‌ছিল—শরীর—শরীর—শরীর ! দুনিয়ায় আপনার পর সবাই শরীর নিয়েই ব্যস্ত। এ-জগতে মনের খোঁজ কেউ কি করে না ! মনের মানুষ সংসারে ক জন মেলে ? 'অমৃত-দা' বলে তার ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছা কর্‌তে লাগ্‌ল। সুকুমার উঠে ধীরে ধীরে লীলার হাত ধরে বল্লে—চল লীলা শোবে চল।

লীলা মন্ত্রচালিতের মত সেখান থেকে উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়্‌লে।

সমস্ত রাত্রি লীলার মনটা মুমূর্ষ অমৃতর বিছানার একটি কোনে পড়ে রইলো। সকালে সুকুমারের এক জায়গায় যাবার কথা ছিল; ভোর হোতে না হোতে লীলা তাকে তুলে দিলে। চা খেয়ে সুকুমার গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌তেই লীলাও তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে গাড়ীতে চড়ে বস্‌ল। সুকুমার লীলাকে গাড়ীতে এসে বস্‌তে দেখে একটু আশ্চর্য্য হোয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কোথায় যাবে? আমার যে ফিরতে ঢের দেরী হবে।

লীলা বল্লে—তুমি যাবার সময় আমকে অমৃত-দার ওখানে নামিয়ে দিয়ে যেও।

লীলার কথাটা সুকুমারের ভাল লাগ্‌ল না। সে ভাব্‌লে একে অমৃতর ছোঁয়াচে রোগ, তার ওপর মা যদি জান্‌তে পারেন যে, লীলা অমৃতর ওখানে গিয়েছিল তা হোলে তিনি নিশ্চয় একটা কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌বেন। সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মাকে বলে এসেছ?

লীলা তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে গাড়ী থেকে বাইরে মুখ বাড়িয়ে কোচুয়ানকে বল্লে—চালাও—

হুকুম পেয়ে কোচুয়ান ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। সুকুমার আবার লীলাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কিন্তু মাকে বলে এসেছ তো?

লীলা গম্ভীরভাবে বল্লে—না।

সমস্ত ব্যাপারটা সুকুমারের মোটেই ভাল লাগ্‌ছিল না। মাকে না বলে যাওয়া, তার ওপরে অমৃতর বাড়ী যাওয়া—এর ফল যে কি হবে! সুকুমারের মনে হচ্ছিল যে, তার মা নিশ্চয় ভাব্‌বেন যে, লীলা যখন তার সঙ্গে বেরিয়েছে, তখন সে-ই তাকে অমৃতর ওখানে নিয়ে গিয়েছে। অথচ সে যদি মার কাছে বলে যে লীলাকে সে নিয়ে যায়-নি, তা হোলে আবার অশান্তির সীমা থাক্‌বে না। লীলা যদি মাকে জিজ্ঞাসা কোরে আস্‌ত, তা হোলে কোনো গোলই হোতো না! ভাব্‌তে ভাব্‌তে

সে লীলার ওপর, নিজের ওপর, সমস্ত সংসারটার ওপরেই চটে যেতে লাগ্‌ল। না! আমার মত লোকের বিয়ে করাটাই আহাম্মুকি হয়েছে।

অমৃতর বাড়ীর দরজার কাছে লীলা যখন গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়্‌ল তখন সুকুমার তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমায় কি আবার নিতে আস্‌তে হবে?

সুকুমারের কথার মধ্যে এমন একটা বিরক্তির সুর ছিল যা লীলার ভাল লাগ্‌ল না। সে বল্লে—না, আমি একটা টোঙ্গা ভাড়া কোরে চলে যাব।

গাড়ী চলে যাবার পর অনেকক্ষণ অবধি লীলা অমৃতদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে কম্পিত-হস্তে দরজা ঠেলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল। বাড়ী নিঃশব্দ, মৃত্যুর মত নীরব। লীলা গোটা দুই তিন ঘর পার হোয়ে অমৃতর ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সুহাসিনী অমৃতর খাটের পাশে একখানা জলচৌকীর ওপর বসে ছিল, লীলাকে দেখ্‌তে পেয়ে উঠে এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে অবাক হোয়ে কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—চিন্‌তে পার্‌ছি না তো!

সুহাসিনী লীলাকে দুই একবার দেখেছিল মাত্র। তাও আবার ভাল কোরে দেখ্‌বার সুযোগ তার কখনো হয়-নি। তার ওপরে চার পাঁচ বছর আগের লীলার চেহারার সঙ্গে আজকের চেহারার প্রায় কোন সাদৃশ্যই ছিল না।

সুহাসিনীর কথা শুনে লীলা ধীর-মধুর হেসে বল্লে—আমাকে চিনতে পার্‌বে না বোন, আমি তোমার দিদি হই—আমার নাম লীলা।

সুহাসিনী কোন কথা বল্‌বার আগেই অমৃত শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কে রে সুশী?

সুহাসিনী লীলার একখানা হাত ধরে তাকে অমৃতর খাটের কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লে—লীলা দিদি এসেছেন।

সারারাত্রি রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কোরে সকাল বেলা অমৃত অসাড় হোয়ে চোখ বুঁজিয়ে পড়েছিল। চোখ বন্ধ কোরে থাকৃতে থাকৃতে তার একটু তন্দ্রা আস্‌ছিল; কিন্তু লীলার গলার স্বর সেই তন্দ্রার জাল ছিন্ন কোরে দিলে। গলার আওয়াজ শুনেই সে বুঝতে পেরেছিল, কে এসেছে। এ স্বর কি সে ভুলতে পারে? এ যে তার মর্ম্মের মধ্যে রক্ত হোয়ে বইছে! লীলা খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরে অমৃত চোখ চাইতে পারছিল না। সে চোখের পাতা দুটোকে জোর কোরে চেপে পড়ে রইলো।

লীলা খাটের ওপরে অমৃতকে দেখেই শিউরে উঠ্‌ল। সুহাসিনী পাশেই দাঁড়িয়েছিল, লীলা একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, তার বড় বড় চোখ দুটোতে জল ডব্‌ ডব্‌ করছে। সে কোন কথা না বলে অমৃতর শিয়রে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

অমৃতর মাথায় হাত দিতেই সে চোখ চাইলো। লীলা জিজ্ঞাসা করল—কেমন আছ অমৃত-দা?

অমৃত খানিকক্ষণ লীলার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে—আমার আর কটা দিনই বা আছে! তুমি ভাল আছ তো?

লীলা মুখে জোর কোরে একটু হাসি এনে বল্লে—কি যে তুমি বল, শীগ্‌গীর ভাল হোয়ে উঠ্‌বে। ও-সব কথা বোলো না।

অমৃত একটু কেশে গলা থেকে রক্তমাখা সর্দ্দিটা ফেলে দিয়ে বল্লে—আর বল্লেও মর্‌তে হবে, না বল্লেও মর্‌তে হবে। প্রত্যেক পলকে মৃত্যু আমাকে একটু একটু কোরে গ্রাস কর্‌ছে, সেকি আমি

বুঝতে পার্‌ছি না? ডাক্তার সাহেব থেকে আরম্ভ কোরে দেশশুদ্ধ লোক যে যখন আমায় দেখ্‌তে আসে, তখনই আমাকে আশ্বাস দিয়ে যায় —কোনো ভয় নাই, কোনো ভয় নাই। যেন আমি মৃত্যুর ভয়ে বড় কাতর হোয়ে পড়েছি। মর্‌তে আমার কোনো দিনই ভয় ছিল না, তার সঙ্গে বরাবর আমি খেলাই কোরে এসেছি। জীবনে কতবার যে আমি মৃত্যুর মুখে স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়েছি তার ঠিকানা নাই। মৃত্যুই আমার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ-রকম মৃত্যু আমি কখনো চাই-নি, এ রোগের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না—

এই অবধি বলে অমৃত আবার চোখ দুটো বন্ধ কোরে ফেল্লে। লীলা বল্লে—অমৃত-দা বেশী কথা বল্লে আবার যে যন্ত্রণা বাড়্‌বে ভাই।

কিছুক্ষণ চুপ্‌ কোরে থাক্‌বার পর অমৃত চোখ খুলে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু আমি তবুও মৃত্যুকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না। মৃত্যুর ডাক অনেকদিন আগেই আমি শুনতে পেয়েছিলুম। আমার মনে হোতো, বুঝি মাসীমার শেষ অনুরোধটা রাখ্‌তে পার্‌লুম না। ভয় হোতো, বুঝি বা হাঁসপাতালের কাজ শেষ কর্‌বার আগেই আমাকে যেতে হয়। কিন্তু আমার সে কাজ হোয়ে গিয়েছে, মৃত্যুর আগে আর একটা ইচ্ছা ছিল, মরবার আগে বড় ইচ্ছা হোতো যে একবার—একবার—তুমি কেমন আছ লীলা?

অমৃত ভয়ানক হাঁপাতে লাগ্‌ল। তার কোটরগত বুভুক্ষু চোখ দুটোর দৃষ্টি লীলার মুখের ওপর তখনো স্থির হোয়ে ছিল। লীলা অমৃতর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ সেই ভাবে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে অমৃতর চোখ

অবসাদে বন্ধ হোয়ে গেল—এই পরশটুকু পাবার আশায় এত দিন সে মর্‌তে পারে-নি।

অনেকক্ষণ এক ভাবে পড়ে থেকে নিস্তব্ধতা ভেঙে অমৃত বল্লে—লীলা, তুমি আমাদের বাড়ীতে এর আগে কখনো আস নি; কিন্তু এম্‌নি দুর্ভাগ্য আমার যে, এমন দিনে তুমি এলে তোমায় একটু আদর যত্ন করবার শক্তিও আমার নেই। আমারও এখান থেকে বিদায় নেবার সময় হয়েছে কিনা—

লীলা বল্লে—অমৃত-দা আমায় ক্ষমা কর ভাই। তোমার এমন অসুখ তা আমি মোটেই জান্‌তুম না। এরা কি আমায় কোনো সংবাদ দেয়!

অমৃত বিস্ময়বিহ্বল চোখে আবার লীলার দিকে চাইলে। একবার তার সন্দেহ হোলো যে, সে তাকে দেখ্‌তে আসে-নি বলে লজ্জায় মিথ্যা কথা বল্‌ছে না তো? কিন্তু লীলার মুখে সে কপটতার চিহ্নমাত্রও দেখ্‌তে পেলে না। তবে কি সত্যিই সে তার অসুখের সংবাদ পায় নি! লীলাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য তার মর্ম্মান্তিক ইচ্ছা হোতে লাগ্‌ল—যে কথাটা এখনো তার কাছে রহস্যের কুহেলীতে ঢাকা রয়েছে। তার ইচ্ছা হচ্ছিল, একবার জিজ্ঞাসা করে—তুমি সুকুমারকে বিয়ে কর্‌লে কেন? অমৃতর মুখ ফুটে বেরিয়ে পড়্‌ল—তবে—তবে—

কিন্তু তখুনি সে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—তবে, সুকুমার এতদিন আমার অসুখের কথা তোমায় কিছুই জানায়-নি?

—কিছু না। কাল রাতে আমি তার মুখে তোমার অসুখের কথ শুন্‌লুম।

অমৃতর দুটো জিজ্ঞাসু চোখ লীলার চোখের ওপর গিয়ে পড়্‌ল।

লীলা বোধ হয় সে চাহনির অর্থ বুঝতে পেরে তার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অমৃতর মাথার ওপর দেওয়ালে ভুবনের বড় ব্রোমাইড্ ছবিখানা দেখ্তে লাগ্ল।

অমৃত কিছুক্ষণ সেই ভাবে লীলার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুহাসিনীকে ডেকে বল্লে—সুশী, লীলাকে চা তৈরি কোরে খাওয়া—

মৃতদের তালিকার মধ্যে অরুণের নাম প্রকাশিত হোয়ে গেলেও সে মরে-নি। যুদ্ধের সময় হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের গোলে তার নাম বেরিয়ে গিয়েছিল। অরুণ মাথায় সাংঘাতিক চোট পেয়ে স্মৃতিশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল। হাঁসপাতালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক একবার তার স্মৃতি ফিরে আস্‌ত বটে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। যুদ্ধের হাঁসপাতাল থেকে সে যখন ছুটি পেলে, তখনো সব কথা ভাল রকম গুছিয়ে সে চিন্তা করতে পার্‌ত না বলে তার বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে ফ্রান্সের এক স্বাস্থ্যাবাসে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখানে প্রায় বছর খানেক কাটিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হোয়ে যখন সে ইংলণ্ডে ফিরে গেল, তখন বন্ধুদের কাছে নিজের মৃত্যু সংবাদ শুনে হেসে উঠ্‌ল।

অরুণের এই আনন্দ কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হোলো না। সে জান্‌ত না যে, স্বাস্থ্যাবাসে বসে দিনান্তের শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কল্পনার তুলি দিয়ে সে যখন নিজের ভবিষ্যৎকে নানা রংয়ে ফলিয়ে তুল্‌ছিল, ঠিক সেই সময়েই তার ভবিষ্যৎ-জীবনের চিত্রপটে অন্য ছবি আঁকা হচ্ছে।

ইংলণ্ডে ফিরে এসেই সে দেশে ফেরবার বন্দোবস্ত করতে আরম্ভ কোরে দিলে। ইংলণ্ডই এক রকম তার দেশ হোয়ে গিয়েছিল। সেখানকার বন্ধু-বান্ধব, যাদের সহবাসে এত দিন তার প্রবাসকে প্রবাস বলেই মনে হয়-নি, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আস্‌বার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই সে জান্‌তে পার্‌লে যে, লীলার বিয়ে হোয়ে গিয়েছে। আর বিয়ে হয়েছে—সুকুমারের সঙ্গে। দুর্ঘটনা যেমন কোনো রকম নিশানা

না দিয়েই নিতান্ত দুঃসাহসিকের মত গায়ের ওপর এসে পড়ে, দুঃসংবাদগুলোও অনেক সময় সেই রকম নেহাৎ গায়ে-পড়ার মত অযাচিত ভাবেই এসে উপস্থিত হয়। এই খবর জান্‌বার জন্য অরুণকে মোটেই চেষ্টা কর্‌তে হয়-নি। সোনালীর একটি ছেলে তখন সেখানে আইন পড়ছিল, দেশে ফের্‌বার আগের দিনেই তার সঙ্গে অরুণের ঘটনাচক্রে দেখা হোয়ে যায়। এ-কথা সে-কথার পর সোনালীর কথা উঠ্‌তেই সে অরুণকে এই খবর দিয়েছিল।

লীলার বিয়ের সংবাদ অরুণের কাছে কত বড় দুঃসংবাদ, তা সে ছাড়া আর কেউ জান্‌তে পার্‌লে না। বাপ-মা মরার শোক যে কি, তা সে জান্‌ত না; কারণ তাঁরা যখন মারা গিয়েছিলেন তখন বাপ মা কি জিনিস তা বোঝ্‌বার ক্ষমতাই তার হয়-নি। পিতামাতার অভাবটা সে বুঝতে পার্‌ত বটে, তবে তার সেই অভাবের জন্য দুনিয়ার সকলের কাছ থেকেই সে সহানুভূতি পেত। কিন্তু জীবনের এই সব থেকে বড় আঘাতে কোনো জায়গা থেকেই সে একটু সহানুভূতির সাড়া পেলে না—পাবার আশাও নাই।

লীলার বিয়ের সংবাদ পেয়েই অরুণের মনে হোতে লাগ্‌ল, যেন সমস্ত জগতটা তার কাছে খালি হোয়ে গেছে। কোথা দিয়ে যে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত্রি কেটে গেল, কখন এসে সে জাহাজে চড়্‌ল, কখন জাহাজ ছেড়েছে, কোথায় চলেছে, কি উদ্দেশ্যে চলেছে তার কোনো জ্ঞানই তার ছিল না।

ওপরে অনন্ত নীল আকাশ, আর নীচে অনন্ত নীল সমুদ্র, তারই মাঝখান দিয়ে তাদের জাহাজখানা চলেছে—সাম্‌নে পেছনে, আশে পাশে হেল্‌তে দুল্‌তে হোঁচট্ খেতে খেতে।—অরুণ ডেকের ওপরে একখানা চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে থাকৃত—এ যাত্রার যদি শেষ না হোতো।

এম্‌নি কোরে যদি ভেসে যাওয়া যেতো, জীবনের শেষ দিন অবধি—শেষ মুহূর্ত্ত অবধি। ভাবনা-বিহীন দিনগুলো জাহাজের কলকারখানার মত একভাবে ঘুরে চল্‌ত—একভাবে, বাধা বিঘ্নের দিকে দৃক্‌পাত না কোরে। তারপরে হঠাৎ একদিন কোনো রকম খবর না দিয়ে কল বিগ্‌ড়ে যাওয়ার মত মৃত্যু এসে সব গোলমাল মিটিয়ে দিয়ে যেত, তো মন্দ হোতো না।

আবার একদিন শীতের কুয়াশা-ঘন সকালে অরুণদের জাহাজখানা কাল্‌কাতার উটরম ঘাটের জেটিতে এসে ঠেক্‌ল। মাটিতে পা দিয়েই তার মনে পড়্‌ল চার পাঁচ বছর আগে এই রকম একটা দিনে সে এইখানে এসে নেমেছিল। তাকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য ঘাটে তার এটর্ণীর লোক দাঁড়িয়েছিল। জাহাজ থেকে নাম্‌তেই তারা একখানা টেলিগ্রাম এনে তার হাতে দিলে। টেলিগ্রামটা খুলে সে দেখ্‌লে যে, সুকুমার তাকে সোজা সোনালীতে চলে যেতে লিখেছে। অরুণ টেলিগ্রামখানা মুড়ে পকেটে পুর্‌তে পুর্‌তে গাড়ীতে উঠে বল্লে—হোটেল—

প্রায় একমাস অহোরাত্র চিন্তা কোরে অরুণ নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই ঠিক কোরে উঠ্‌তে পারে-নি। লীলাকে একবার শেষ দেখা দেখ্‌বার ইচ্ছা তার সমস্ত হৃদয়খানা জুড়ে বস্‌লেও তার মনে এই নিয়ে একটা দ্বিধা হচ্ছিল। লীলার কথা ভাবা-মাত্রই তার মনে পড়্‌ছিল, লীলার ওপরে তার আর অধিকার নাই, কোন অধিকার নাই। কেমন কোরে তা সম্ভব হোলো? যে আলো ধ্রুবতারার মত পথ দেখিয়ে তাকে এই ঝঞ্ঝার সমুদ্র পার কোরে দিয়েছে, তীরে এসে তাকে আলেয়া মনে কোরে কি কোরে ফিরে যাবে? এই আলোই যে তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সম্বল ছিল।

অরুণের মনে হোতে লাগ্‌ল যে, তার অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব নিষ্ফল হোয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে তার কেউ নাই, তার কোনো কাজ নাই, জীবনে কোন সাধ নাই—তবুও তাকে বাঁচতে হবে। কোন কাজ নাই শুধু বেঁচে থাক্‌বার জন্যেই বাঁচতে হবে! এ কি শাস্তি! কোন দেবতার এই নিষ্ঠুর দণ্ড!

প্রভাতের শুকতারার মত অমৃতর জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। লীলা ও সুহাসিনীর প্রাণপণ চেষ্টা তার প্রাণকে সেই জরাজীর্ণ খাঁচার মধ্যে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌লে না। অমৃতর মৃত্যুর আগে লীলা প্রায় চার মাস ধরে দিনরাত তার সেবা করেছে। বেলা বারোটা একটার সময় সে একবার বাড়ীতে খেতে আস্‌ত মাত্র। দিনরাত সেখানে এ-রকম ভাবে থাকা তার শ্বাশুড়ী কিংবা স্বামী কেউ পছন্দ কর্‌তেন না। সোনালীর দুই একজন মাতব্বর ব্রাহ্ম এই নিয়ে মাঝে মাঝে বিরাজকে দুই একটা কথা বল্‌তেন। দুপুর বেলা প্রত্যহ লীলা যখন একবার বাড়ীতে আস্‌ত, তখন বিরাজ তাকে ধমকে, মুখ গম্ভীর কোরে থেকে, নানা উপায়ে জানিয়ে দিতেন যে, এ-রকম কোরে সেখানে কাটান তাঁর মোটেই মনঃপুত হচ্ছে না। সুকুমারের সঙ্গে তার এই সময় প্রায়ই তর্কাতর্কি হোতো, কিন্তু সে সবার প্রতিবাদ ও আপত্তিতে নির্ব্বিকার থেকে অটলভাবে নিজের কর্ত্তব্য কোরে যেতে লাগ্‌ল—একেবারে অমৃতর শেষ দিন অবধি।

অমৃত ভুবনের একখানা বড় ছবি করিয়ে নিজের শোবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিল। মর্‌বার কয়েকদিন আগে সে একদিন লীলাকে বল্লে—লীলা, আমি মরে গেলে মাসীমার ছবিখানা তুমি নিয়ে যেও। এ বাড়ীতে তো আর কেউ থাক্‌বে না। সুশী হাঁসপাতালেই থাক্‌বে, ছবিখানা অযত্নে নষ্ট হোয়ে যেতে পারে।

অমৃতর মৃত্যুর পর সে মার ছবিখানা সেখান থেকে নিয়ে এসে তাদের বসবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিল। কিছুদিন পরে লীলা নিজের বাড়ী

থেকে তার বাবার ছবিখানাও নিয়ে এসে মার ছবি যে দেওয়ালে টাঙান ছিল তার সাম্‌নের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে দিলে।

বিরাজ লীলার সঙ্গে কথা বলা এক রকম বন্ধ কোরেই দিয়েছিলেন। নেহাৎ দরকার পড়্‌লে যা কিছু কথা হোতো, অমৃতর মৃত্যুর পর তাও বন্ধ হোয়ে গেল।

অমৃতর মৃত্যুর পর লীলার মনে হোলো যে, তার সংসারের সমস্ত কাজ সারা হোয়ে গেল। পৃথিবীতে আর এমন একটি লোকও রইলো না যার সুখ-দুঃখের কথা সে অন্তরের সঙ্গে ভাব্‌তে পারে। সুকুমারের বাড়ীতে চাকর-বাকরের অভাব ছিল না, সেজন্য সংসারের কাজকর্ম্ম তাকে কিংবা বিরাজকে দেখ্‌তে হোতো না। সে দিনরাত নিজের ঘরটিতে বসে কাটিয়ে দিত। কখনো বা বিকেলে সেই পাহাড়ে গিয়ে বস্‌ত, অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে বাড়ী ফিরে আস্‌ত। নিঃসঙ্গ দিনগুলো এম্‌নি কোরে কাটাতে কাটাতে কখনো তার মনে হোতো, কালচক্রের কলকারখানা বুঝি কোথায় বিগ্‌ড়ে গিয়েছে, এখন তাকেই এই বিরাট চক্রের ভার ঠেলে নিয়ে চল্‌তে হবে—কতদিন এম্‌নি কোরে চল্‌তে হবে তার ঠিকানা নাই—মৃত্যুর দিন অবধি—একলা।

সেদিন লীলা পাহাড় থেকে বেড়িয়ে এসে একলাটি ড্রইং রুমে বসেছিল। বাড়ীতে সুকুমার কিংবা বিরাজমোহিনী কেউ নাই, তাঁরা দুজনে বিকেলে কাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে গিয়েছেন। তাঁদের ফের্‌বার প্রায় সময় হোয়ে এসেছে। ইদানীং নিমন্ত্রণ হোলেও লীলা কারো বাড়ীতে যেত না। বেশী লোকের মাঝে সঙ্কুচিত হোয়ে পড়্‌ত বলে চিরদিনই সে কোথাও যেতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ কর্‌ত না, কিন্তু বিরাজমোহিনীর ধমকের ভয়ে তাকে তাঁর সঙ্গে বেরুতে

হোতো। আজকেও বিরাজের ইচ্ছা ছিল যে, লীলা তাঁদের সঙ্গে যায় কিন্তু লীলা সুকুমারের কাছে যাবার অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি ও সুকুমার লীলার ওপর বিশেষ বিরক্ত হোয়েই বেরিয়েছিলেন ;

লীলা ড্রইং-রুমে বসে কি একখানা বই পড়্‌ছিল, হঠাৎ ওপরে দেওয়ালের দিকে চোখ পড়্‌তেই সে দেখ্‌তে পেলে, তার মার ও বাবার ছবি দু-খানা, যেখানে টাঙান ছিল সেখান থেকে নামিয়ে রাখা হয়েছে। লীলা আশ্চর্য্য হোয়ে তাদের একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে— এখান থেকে ছবিগুলো নামিয়ে রেখেছে কে রে ?

ঠিক সেই সময় বিরাজ ও সুকুমার নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকলেন। বিরাজ দরজার বাইরে থেকে লীলার কথা শুনতে পেয়েছিলেন ; ঘরের মধ্যে ঢুকে, চাকর কিছু বল্‌বার আগেই তিনি বল্লেন— আমি ছবিখানাকে ওদের নামিয়ে রাখ্‌তে বলেছিলুম, ওদের ওপর মিছিমিছি তম্বি কোরো না।

লীলা বিরাজের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ্ কোরে থেকে বল্লে— কারো 'ওপরে তম্বি করা আমার স্বভাব নয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—ছবি দু-খানা নামিয়ে রাখা হোলো কেন ?

বিরাজের সহস্র তিরস্কারেও লীলা কোনো দিন কখনো প্রতিবাদ করে নি। সে যে তাঁর মুখের ওপরে এমন জবাব করতে পারে, সে কথা বিরাজের কল্পনার অতীত ছিল। লীলার কথা শুনে রাগে বিরাজের সমস্ত শরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। তিনি শ্লেষের সুরে বল্লেন—নামিয়ে রাখা হয়েছে তার কারণ, এ বাড়ী আমার অধিকারে আছে। আমার বাড়ীতে ও-সব লোকের ছবি টাঙান চল্‌বে না।

লীলা স্থিরভাবে বল্লে—কিন্তু এ-বাড়ীতে আপনারও যতটা অধিকার আমারও ঠিক ততটা অধিকারই আছে, এক বিন্দুও কম নেই। মনে

রাখ্‌বেন যে, আমিও এ-বাড়ীর বৌ। আর 'ও-সব লোকের ছবি' কথাটার মানে কি।—

লীলার কথায় বিরাজের মাথায় রক্ত চড়ে গেল—তিনি চীৎকার কোরে বলে উঠ্‌লেন—যত সব চরিত্রহীন—

লীলা দৃঢ়ভাবে বল্লে—সাবধান হোয়ে কথা বল্‌বেন। আপনি যাঁদের সম্বন্ধে কথা বল্‌ছেন, তাঁরা আমার বাবা মা। আপনি নিজের বাবা মাকে যতখানি শ্রদ্ধা করেন, আমি আমার বাবা মাকে তার চেয়ে কিছু কম শ্রদ্ধা করি, তা মনে কর্‌বেন না। আপনার বাবা-মা কি রকম লোক ছিলেন তা জানি না, কিন্তু আমি শুনেছি যে, আপনার স্বামী সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। সাধু-চরিত্র-সহবাসের মর্য্যাদা রাখ্‌বেন।

লীলার কথা শুনে বিরাজ একেবারে স্তম্ভিত হোয়ে গেলেন। তিনি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে সুকুমারের দিকে চেয়ে বল্লেন—সুকুমার আমাকে কি এ-সব সহ্য কর্‌তে হবে?

সুকুমারের মেজাজটা সেদিন মোটেই ভাল ছিল না। হাঁসপাতালের খরচের কতকগুলো টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছিল না বলে তার মনটা কদিন থেকেই বড় খারাপ হয়েছিল। অমৃত বিছানায় পড়ার পর থেকে টাকা-কড়ি হিসাবের ভার তার ওপরেই পড়েছিল। এই সময় থেকেই এই টাকাটার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ সকালে হাঁসপাতালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার এক অধিবেশন ছিল, সেখানে এই টাকার হিসাব নিয়ে তাকে বড়ই অপ্রস্তুত হোতে হোয়েছে। আজ আবার বিকেলে নিমন্ত্রণে যাওয়া নিয়ে লীলার সঙ্গে তার খুব বচসা হোয়ে গিয়েছে। তার ওপরে সেখানে যাওয়া ও আসার মধ্যে যতক্ষণ সময় কেটেছে, ততক্ষণ বিরাজ লীলার অবাধ্যতা একগুঁয়েমি ও এমন কি চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত কোরেও সুকুমারের মেজাজকে আরও খারাপ কোরে দিয়েছিলেন। বাড়ীতে ঢুকতে

না ঢুক্‌তেই আবার এই সব কাণ্ড দেখে তার মেজাজ আরও বিগ্‌ড়ে গেল। তার মার মুখের ওপরে যে, কেউ এমন জবাব দিতে পারে, এ-কথা তারও কল্পনার অগোচরে ছিল। লীলার কথা শুনে সে যেমন বিরক্ত হয়েছিল বিস্মিতও তার চেয়ে কিছু কম হয়নি। বিরাজের কথা শুনে সুকুমার লীলাকে বল্লে—লীলা!

লীলা সুকুমারের কথা থামিয়ে দিয়ে বল্লে—দাঁড়াও, আমিও জিজ্ঞাসা কর্‌ছি যে, আমাকেও কি এই সব সহ্য কর্‌তে হবে?

সুকুমার উত্যক্ত-স্বরে বল্লে—চুপ্‌ কর লীলা! তুমি বড় বাড়াবাড়ি কর্‌ছ। মার মুখের ওপর এমন কোরে চোপা কর্‌তে লজ্জা হোচ্ছে না তোমার?—একটু ভেবে দেখো—

লীলা বল্লে—খুব ভেবেছি, আজ চার বছর ধরে ভেবেছি। তোমাদের ব্যবহারটা একবার ভেবে দেখো।

—আমরা কি ভাব্‌ব। আমরা তোমায় যা কর্‌তে বারণ করেছি তুমি জোর কোরে তাই করেছ। অমৃতর ওখানে তুমি এই যে চার মাস দিনরাত রইলে—এটা কি রকম হোলো? সে ছিল একটা নামজাদা বদমাইস, তার ওখানে তুমি দিনরাত থাক্‌তে বলে লোকের কাছে আমাদের কত কথা শুন্‌তে হয়েছে তা জান?

সুকুমার বিরাজের দিকে ফিরে বল্লে—আবার এদিকে কি হয়েছে জান? হাঁসপাতালের খরচের টাকা অমৃতর কাছে থাক্‌ত। আমার হাতে হিসাব পড়ে দেখ্‌ছি কয়েক হাজার টাকার কোনো হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয় টাকাটা সে-ই সরিয়েছে।

বিরাজ একটু শ্লেষের হাসি হেসে তাড়াতাড়ি মুখের সাম্‌নে পাখা নাড়্‌তে লাগ্‌লেন।

সুকুমারের এই কথাগুলো শুনে লীলার সর্ব্বাঙ্গ যেন বিষিয়ে উঠ্‌ল।

সে বল্লে—অমৃত-দা বদমাইস ছিল বটে, কিন্তু তার গুণের একটি কণাও যদি তোমাদের থাকৃত, তা হোলে তোমরা দেবতা হোয়ে যেতে। যে লোক মরে গিয়েছে তার নামে কোনো প্রমাণ না পেয়ে চোর বদনাম দেওয়টা খুব সদ্‌গুণের পরিচয় না? জেনে রেখো যে টাকা অবহেলা কোরে সে ফেলে দিয়েছিল, সেই টাকা দিয়েই এই হাঁসপাতাল তৈরি হয়েছে। টাক্যর প্রয়োজন হোলে হাঁসপাতালের টাকা থেকে তার সরাবার দরকার হোতো না। তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য কর্‌বার লোকের অভাব ছিল না।

সুকুমার আগের মত শ্লেষের সুরেই বল্লে—হ্যাঁ লোকেও তাই বলে। আগেও বল্‌ত, এখনো বলে। তবে আগে কথাটা বিশ্বাস হয় নি। এখন ব্যাপারটা তেমন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।

লীলার মাথায় যদি কেউ মুগুরের আঘাত কর্‌ত, তা হোলেও সে বোধ হয় এতটা আহত হোতো না। অমৃতকে সে নিজের বড় ভাইয়ের মত দেখ্‌ত, তার সঙ্গে মেলা-মেশার জন্য তাদের নামে যে কুৎসা রটেছিল সেটাকে সে জীবনের একটা বড় দুর্ভাগ্য বলে মনে কর্‌ত। আজ আবার সুকুমারের মুখে সেই ইঙ্গিত শুনে তার সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। সুকুমারের এই কথার উত্তরে তার অনেক কথাই বল্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিল, কিন্তু সে-সব কথা এখন বলে আর লাভ কি? সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বল্লে—লোকের কথা নিয়ে তোমরাই থাক, সে কথায়—

সুকুমার ভয়ানক উত্তেজিত হয়েছিল। লীলাকে বিয়ে কর্‌বার সময় সে বলেছিল বটে যে, তাকে বিয়ে কোরে সে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে চায়, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার এ-ধারণাও হোয়ে গিয়েছিল যে, সে এই কাজ কোরে একটা বড় রকমের মহত্ত্ব দেখিয়েছে। তাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য সুকুমারকে এতদিন ধরে ঘরে বাইরে যত উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা সহ্য কর্‌তে হয়েছে, আর সেজন্য তার অন্তরে যত বিষ জমা হয়েছিল, সুযোগ

পেয়ে আজ তা সমস্ত বেরিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। লীলার কথা থামিয়ে দিয়ে সে বল্লে—হ্যাঁ লোকের সঙ্গে যাদের মিশ্‌তে হয়, লোকের কথাও তাদের গ্রাহ্য কর্‌তে হয়। লোকে যাদের সঙ্গে মেশেনা, তাদের লোক-নিন্দার বালাই থাকে না, কাজেই তারা বে-পরোয়া—

বিরাজমোহিনী এতক্ষণ প্রাণপণে নিজের মুখের ওপর পাখা চালাচ্ছিলেন। সুকুমারের কথা শেষ না হোতেই তিনি বল্লেন—কেন ও-সব ছোটলোকদের সঙ্গে—

ঠিক সেই সময় বস্‌বার ঘরের দরজাটা দু-ফাঁক হোয়ে খুলে গেল—।

দরজা খোলার শব্দে বিরাজ, সুকুমার, লীলা তিনজনেই এক সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে যে, চৌকাটের ওপারে সহাস্য-মুখে অরুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা থেকে এ পর্য্যন্ত যত মেঘ জমা হচ্ছিল, অরুণের আত্ম-প্রকাশে যেন সব কেটে গেল। সুকুমার অরুণকে দেখ্‌তে পেয়ে আনন্দে চীৎকার কোরে উঠ্‌ল—অরুণ!

অরুণ হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরের মধ্যে এসে ঢুক্‌ল। বহুদিন পরে আবার দুই বন্ধুতে প্রাণ ভরে কোলাকুলি কর্‌লে। অরুণ বিরাজের পায়ের ধুলো নিয়ে একখানা চেয়ারে বসে পড়্‌ল।

সবাই বস্‌বার পর সুকুমার বল্লে—আমাদের বাড়ীতে একটি নতুন লোগ এসেছে, তাকে তুমি চেন বোধহয়—লীলা।

অরুণের সঙ্গে সোনালীতে যে লীলার পরিচয় হয়েছিল, সে কথা বিলেতে সে সুকুমারকে বলেছিল। কিন্তু তার পরের কথাটা একমাত্র ভুবন ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জান্‌ত না। সুকুমারের কথা শুনে অরুণ অপ্রস্তুতের মত লীলার দিয়ে চেয়ে তাকে একটা নমস্কার কোরে বল্লে—কেমন আছেন?

লীলা প্রতি-নমস্কার জানিয়ে অশ্রুজড়িতকণ্ঠে বল্লে—ভাল আছি, আপনি ভাল আছেন?

জাহাজে চড়্‌বার দিন-কয়েক আগে অরুণ যখন নিজের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে সুকুমারকে তার কর্‌লে যে, সে সশরীরে সুস্থ দেহে দেশে ফিরে আস্‌ছে, তখন তারা কি রকম আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিল, মৃত ব্যক্তিকে এই রকমে যারা ফিরে না পেয়েছে তারা বুঝতে পার্‌বে না। বিরাজমোহিনী সেদিন দেড় ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা বসে বসে উপাসনা কর্‌লেন। সেদিন ঈশ্বরের দয়া সম্বন্ধে এত কথা ও উপদেশ তাঁর মনের মধ্যে লাফালাফি কর্‌তে লাগ্‌ল যে, উপাসনার জায়গায় সেদিন লীলার অনুপস্থিতিটা তিনি বিশেষ কোরে অনুভব কর্‌লেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে তার ওপরে বিরক্তির মাত্রা আরও একটু বেড়ে গেল। সুকুমার সেদিনে তার আপিসে গিয়ে এক কলমের জায়গায় আড়াই কলম প্রবন্ধ লিখে ফেল্লে। পরদিন সে সভা কোরে স্থির কর্‌লে যে, অরুণ ফিরে এলে সোনালীর জন-সাধারণ মিলে সমারোহ কোরে অভিনন্দন দেওয়া হবে।

লীলা তখন অমৃতকে নিয়ে ব্যস্ত। তার অজ্ঞাতসারে তারই ভাগ্য লিপিতে কি অঙ্কপাত হচ্ছে তার বিন্দু-বিসর্গও সে জান্‌তে পারে-নি। সুকুমারের সঙ্গে লীলার এ-সময় কদাচিৎ দেখা হোতো। তার ওপরে প্রতিদিন নিষেধ করা সত্ত্বেও লীলা অমৃতর ওখানে যেত বলে সুকুমার লীলার ওপরে ক্রমেই বিরক্ত হোয়ে উঠ্‌ছিল। লীলা দুপুর বেলা যখন বাড়ীতে স্নানাহার কর্‌তে আস্‌ত, তখন মাঝে মাঝে সুকুমারের সঙ্গে তার দেখা হোতো বটে, কিন্তু কথাবার্ত্তা বড় একটা হোতো না। কথা হোলেও নেহাৎ অমৃতর অবস্থার কথা ছাড়া অন্য কথা হোতো না। সুকুমারও লীলাকে অরুণের কোনো কথা বলে-নি।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে অরুণ মনে করলে যে, তার দুর্ভাগ্য যা কিছু ছিল তা শেষ হোয়ে গেল। এবার সে নতুন কোরে জীবনযাত্রা সুরু করবে। সংসার-যাত্রার দীর্ঘ পথ তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে; এই পথ বেয়ে চল্‌বার সঙ্গিনী সাগরের পরপারে তার জন্য অপেক্ষা করছে। লীলা,— দুঃখিনী লীলা! কিন্তু একটি মাত্র সংবাদে তার সমস্ত কর্ম্মশক্তি, সমস্ত উৎসাহ এক মুহূর্ত্তে পঙ্গু হোয়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তে তার মনে হোলো যে, তার জীবনের সব কাজ যেন শেষ হোয়ে গিয়েছে; কোনো আশা নাই, কোনো উদ্যমও নাই। কে এ যন্ত্রী মানুষের অলক্ষ্যে বসে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে? নিষ্ঠুর! লোকে তাকে দয়াময় বলে কিসের জন্য?

অরুণ ভাবতে লাগ্‌ল যে, মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে বলে স্বাস্থ্যাবাসে বসে নিশিদিন সে এই দয়াময়কে ডেকেছে? ওঃ কি দয়া! এই শক্তির বিরুদ্ধে কিছু করবার মানুষের কোনো ক্ষমতা নাই বলেই মানুষগুলো দিন-রাত এই নিষ্ঠুর শক্তিকে দয়াময় দয়াময় বলে খোসামোদ করে। মানুষ কি নিরুপায়!

সে ঠিক করেছিল যে, দেশে ফিরে একবার লীলাকে দেখে যে, এমন জায়গায় চলে যাবে যে, কেউ আর তার কোনো সন্ধান পাবে না। দেশের মাটিতে পা দিয়েই সুকুমারের টেলিগ্রাম-খানা হাতে পড়্‌তেই তার মনে হয়েছিল যে, এখনো এক জায়গায় তার স্নেহের বাঁধন অটুট রয়েছে। তখুনি সেখানে ছুটে যাবার জন্য তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল, কিন্তু যখন তার মনে পড়্‌ল যে, লীলা সেখানে আছে, তখনি তার সমস্ত অনুভূতি একেবারে বিষিয়ে উঠ্‌ল।

অরুণ কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারছিল না সে লীলা সুকুমারকে আর সুকুমারই বা লীলাকে বিয়ে করলে কি কোরে? তার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে, মাতৃহীন হোয়ে কোনো রকম অবস্থা বিপর্য্যয়ে লীলা হয়তো

সুকুমারকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু বিরাজ-মোহিনী এ বিয়েতে কি কোরে সম্মতি দিলেন! তাঁর অসম্মতিতে সুকুমারের বিয়ে করা সম্ভবই বা হোলো কি কোরে! হয়তো এই রহস্যটা তার কাছে চিরকাল রহস্যই থেকে যাবে।

নানারকম চিন্তার পর অরুণ সুকুমারের তারের জবাবে জানিয়ে দিলে যে, সোনালীতে ফিরতে তার মাসখানেকের ওপর দেরী হবে। কলকাতায় ও দেশে তার কতকগুলো বৈষয়িক কাজ আছে, সেগুলো না সারলেই নয়। যাবার আগে চিঠি লিখে কিংবা টেলিগ্রাম কোরে তাকে জানাবে।

সেদিন রবিবার। সন্ধ্যাবেলায় সুকুমার বাড়ী নাই। বিরাজ বেলাবেলিই মন্দিরে চলে গিয়েছেন, লীলা একলা বাড়ী আছে, এমন সময় চাকর এসে তার হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল। সুকুমারের কোনো বন্ধু হয়তো সোনালীতে আসছে এই মনে কোরে সে টেলিগ্রাম-খানা খুলে ফেল্লে। এ রকম ভাববার তার কারণ ছিল। পত্রিকার সম্পর্কে সুকুমারের দুই একজন বন্ধু মধ্যে মধ্যে সোনালীতে আসতেন ও তাঁদের জন্য আগে থাকতে ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতে হোতো। অরুণের প্রেরিত টেলিগ্রাম পড়ে প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারে-নি। সে ভাবলে সুকুমারের অরুণ বলে কোনো বন্ধুর হয়তো আসবার কথা ছিল, সেই এই সংবাদ পাঠিয়েছে—অদৃষ্টের এত বড় বিরাট পরিহাসের কথা সে কল্পনাও করতে পারে-নি। কিন্তু মানুষ যা কল্পনা করে না জগতে সচরাচর সেইটেই ঘটে থাকে। ঘটনাচক্র যদি মানুষের কল্পনার দাস হোতো তা হোলে……।

লীলা যখন সুকুমারের কাছে শুনতে পেলে যে, অরুণ অন্য কোনো অরুণ নয়, এ তাদেরই সেই অরুণ। যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়-নি? স্মৃতিশক্তি হারিয়ে সে হাঁসপাতালে পড়েছিল, এদিকে তার মৃত্যু-সংবাদ চারিদিকে

ঘটে গিয়েছে, তা সে জানত না, তখন তার কোনো ভাবান্তর হোলো না। সংবাদটা এমন অতর্কিতে এসে পড়েছিল যে, তার ঠিক মর্ম্মটা সে বুদ্ধি দিয়ে তখনি-তখনি ধারণা করতে পারলে না। তার মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তা করবার স্নায়ুগুলো হঠাৎ যেন বিরোধী হোয়ে উঠল! সমস্ত দিনরাত এই অবস্থায় কাটবার পর সংবাদটার গুরুত্ব সে ধীরে ধীরে অনুভব করতে আরম্ভ করলে।

অমৃতর মৃত্যুর পর সে মনে করেছিল যে, এক এক কোরে সে দুর্ভাগ্যের শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছে। তার কল্পনার অগোচরে তার বিরুদ্ধে যে এত বড় ষড়যন্ত্র চলেছে ঘুণাক্ষরেও সে সংবাদ সে পায়-নি। অরুণের মৃত্যু-সংবাদ শুনে একদিন সে যত কাতর হোয়ে পড়েছিল, সে জীবিত আছে জানতে পেরে আজ তার চেয়েও অস্থির হোয়ে পড়ল। অরুণকে মৃত জেনে মৃত্যু তার কাছে একটা লোভনীয় জিনিষ বলে মনে হোতো, কিন্তু মরবার চিন্তার মধ্যেও যে সুখটুকু ছিল এই সংবাদ তাও নষ্ট কোরে দিয়ে গেল।

অমৃতর মৃত্যুর পর তার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট চিন্তা ছিল না! অরুণের সংবাদ আসার পর থেকে অনেক দিন পরে তার মন একটা নির্দ্দিষ্ট চিন্তায় নিয়োজিত হোলো। সুকুমারকে বিয়ে করার জন্য সে যথেষ্ট অনুতপ্ত ছিল, কিন্তু অরুণ বেঁচে আছে জেনে তার এই অনুতাপ লক্ষগুণে বেড়ে গেল।

লীলা ভাবছিল—অরুণ বেঁচে আছে, সে হয়তো এইখানে এসেই থাকবে। সে এসে কি দেখবে? অরুণ—অরুণ, না না তাদের জীবনের মাঝখানে চিরকালের জন্য যবনিকা পড়ে গিয়েছে।

সেদিন থেকে লীলার জীবন দুর্ব্বিসহ হোয়ে উঠল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে কোনোদিন সে বাগানের কোনে বসে, কোনো

দিন বা পাহাড়টাতে গিয়ে বসে হৃদয়ের বোঝা খালি কর্‌বার জন্য কাঁদ্‌বার চেষ্টা কর্‌ত। কিন্তু তার বুকের মধ্যে যে অশ্রুসাগর জমাট হয়েছিল, তা শেষ হবার নয়।

প্রায় মাসখানেক নিরবিচ্ছিন্ন চিন্তার পর লীলা স্থির কোরে ফেল্লে—মৃত্যুই তার পক্ষে শ্রেয়, কারণ অরুণ বেঁচে থাক্‌বে আর সে তাকে পাবে না, তা সে সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। মৃত্যুর কথা ভাব্‌তে ভাবতে তার সেই দিনের কথা মনে পড়ে গেল, সেই যেদিন অরুণকে মৃত মনে কোরে মাকে মরণের পথে যাত্রী দেখে, সেই ঝড়ের রাতে মৃত্যুর অভিসারে বেরিয়ে পড়েছিল। সেদিন সেই যে বিষের শিশি সে বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়েছিল, সে শিশি আজও তার হাতবাক্সের মধ্যে রয়েছে। সে শিশিটা পাছে কারো চোখে পড়ে এই ভয়ে লীলা হাতবাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। সেদিন থেকে সেই বাক্স বন্ধই রয়েছে। সেদিন তার মনে হয়েছিল, জীবনে আর কি ব্যথা, আর কি দুর্ভাগ্য আস্‌তে পারে,—আর কি সম্ভব হোতে পারে? সে সব কথা মনে পড়াতে লীলায় অতি দুঃখেও হাসি এল।

লীলা ঠিক কোরে ফেল্লে যে, সে আত্মহত্যা কর্‌বে। কিন্তু অরুণ আস্‌বার আগে কিংবা সে আস্‌বার পরে তা সে ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিল না। অরুণ কবে সোনালীতে আস্‌বে তার কোনো স্থিরতা ছিল না, সে আজও আস্‌তে পারে, দু-দিন পরেও আস্‌তে পারে। এদিকে সুকুমারদের বাড়ীতে এই রকম নিঃসঙ্গ-জীবনও তার কাছে ক্রমেই অসহনীয় হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

একদিন দু-দিন কর্‌তে কর্‌তে প্রায় দু-মাস চলে গেল, কিন্তু অরুণ সোনালীতে এল না। লীলা ভাব্‌লে, হয়তো তার জন্যই অরুণ সঙ্কোচে সেখানে আসতে পার্‌চে না। তবে কি তাকে অরুণ আস্‌বার আগেই

মর্‌তে হবে। বেশ তবে তাই হোক্ প্রিয়তম, তবে তাই হোক্। এ জীবনে তোমায় পেলুম না, জানি-না জন্মান্তর আছে কিনা ; জন্ম-জন্মান্তর হয়তো আমায় এই দুঃখ ভোগ কর্‌তে হবে।। কিন্তু সে দুঃখ আমার পরম গৌরব, তোমার ভালবাসার স্মৃতিই আমার অভিজ্ঞান হোয়ে থাকুক্।

একদিন বিকেলে লীলা তার হাতীর দাঁতের বাক্সটা খুলে বিষের শিশিটা বার কোরে নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। সে ঠিক করেছিল, সেদিন রাতে সুকুমার তাকে যেখানে ধরেছিল সেই শূন্যগর্ভ খনিটার কাছে গিয়েই মর্‌বে। মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার সেই রাতের কথা-গুলো একে একে মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সেদিন কী দুর্যোগই না হয়েছিল! সেই প্রলয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেমন কোরে সে এই উঁচু-নীচু মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছিল—সে ছবিখানা যেন স্পষ্ট হোয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সেদিন মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বার জন্য তার যে উৎসাহটুকু ছিল, আজ তাও নাই। জীবন, মৃত্যু সবই যেন তার কাছে নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে। সেদিন সে মর্‌তে চেয়েছিল, মৃত্যুকে মিলনের সোপান মনে কোরে, কিন্তু আজ মর্‌তে চলেছে, মৃত্যু ছাড়া উপায়ান্তর নাই বলে।

সন্ধ্যা হবার অনেক আগেই লীলা সেই শূন্যগর্ভ খনিটার কাছে এসে পৌছল। সেদিন রাতে খনিটাতে জল-ভরা ছিল, এখন সে জল অনেক শুকিয়ে গিয়েছে। লীলা একেবারে জলের ধারে গিয়ে বস্‌ল। লীলা পেছন ফিরে একবার দেখে নিলে—আজ আর কেউ তেড়ে আস্‌ছে না ; মৃত্যুর পূর্ব্বে আজ সে পরম নিশ্চিন্ত, কোনো উৎকণ্ঠা নাই। লীলা সন্তর্পণে বুকের ভেতর থেকে বিষের শিশিটা বার কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এইটুকু শিশি, কিন্তু এর মধ্যে যে শক্তি আছে তাতে দশ-বারো জন লোকের কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মৃত্যু হোতে পারে। মৃত্যু! সে তো

পৃথিবীর সব থেকে পুরোন ঘটনা, সৃষ্টির জন্ম যেদিন হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুও সেদিন হয়েছে। কিন্তু তবুও মানুষের কাছে মৃত্যু প্রতিবারই নতুন রূপ ধরে এসে দেখা দেয়। সমস্ত বিশ্ব এই মৃত্যুর বেড়া জাল দিয়ে ঘেরা, একে ফাঁকি দিয়ে কেউ পালাতে পারবে না। এই মৃত্যুর ভয়ে মানুষ পাগলের মত ছুটোছুটি করে। কত ক্ষুদ্র শক্তি মানুষের? কিন্তু কি বিরাট দম্ভ! লীলা শিশিটাকে চোখের কাছে এনে আরও ভাল কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। শিশির ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—বিষ। বিষ। মানুষের অন্তরে যে বিষের খনি আছে, তাই চুঁইয়ে এই বিষ মানুষেরই হাতের তৈরি। এখুনি হোক্, কি কিছু পরেই হোক্ এই বিষ পেটে পড়্‌লেই তো তার মৃত্যু হবে। বিষদগ্ধ দেহখানা এই জলের ধারে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে থাক্‌বে। কতদিন পড়ে থাক্‌বে তার কোনো ঠিকানা নাই। যখন তারা সেই দেহখানা দেখ্‌তে পাবে তখন হয়তো দেহ পচে তা থেকে দুর্গন্ধ বের হোতে আরম্ভ কর্‌বে, ঘৃণায় নাকে কাপড় দিয়ে হয়তো লোকে দূরে সরে যাবে।

সুকুমার কি তার মৃত্যুতে দুঃখিত হবে? না, তার আর দুঃখ হবার তো কোনো কারণ নাই। মার কথা অবহেলা কোরে তাকে বিয়ে করেছিল বলে এখন সে অনুতাপই কর্‌ছে! কতদিন ঠারে-ঠোরে সে কথা সে তাকে জানিয়ে দিয়েছে। বিরাজমোহিনী!—তার আত্মহত্যার সংবাদ পেলে তাঁর বুক দশ হাত হোয়ে উঠ্‌বে। গর্ব্বে তিনি উচ্চকণ্ঠে লোক-সমাজে বলে বেড়াবেন—আমি যা বলেছিলুম, তাই হোলো। ও-রকম বাপ-মার মেয়ে আর কত ভাল হবে। তার মৃত্যুতে একটুও দুঃখিত হবে, কি একফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বে এমন-লোক কি পৃথিবীতে কেউ নাই? লীলার কেন মনে হোলো আজ যদি অমৃত বেঁচে থাক্‌ত তা হোলে তার মৃত্যু-সংবাদ শুনে নিশ্চয় সে দুঃখিত হোতো,

হয়তো বা দু-ফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌ত। পৃথিবীতে একমাত্র মানুষের মত মানুষের সংসর্গ সে তার কাছেই পেয়েছিল, কিন্তু লোকের চোখে সে ছিল পাকা বদমাইস। কিন্তু অমৃত-দাও আজ ইহলোকে নাই। আত্মহত্যা করেছি জানতে পারলে অরুণ কি মনে করবে? তার কথা কি আর অরুণের মনে আছে? মনের মধ্যে এই প্রশ্ন উদয় হওয়া মাত্র তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন থেমে গেল! আশ্চর্য্য নয়, কিছুই আশ্চর্য্য নয়, মানুষ মনে মনে এমন কোনো দুর্ভাগ্যের কল্পনা করতে পারে না, যা তার জীবনে ঘটা অসম্ভব। কিন্তু অরুণ তাকে ভুলে গিয়েছে সে কথা কিছুতেই তার মন বিশ্বাস করতে চাইছিল না। সমস্ত দুর্ভাগ্যের বিনিময়ে ঐ টুকু মুলধন সঞ্চয় কোরে যে সে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে।—হে সর্ব্ব-নিয়ন্তা আমার এইটুকু কেড়ে নিও না!

লীলার মনে পড়্‌ল, একদিন রাতে সে তার সমস্ত দুঃখের বোঝা এইখানে নামিয়ে রাখ্‌তে এসে আবার নতুন দুঃখের পসরা মাথায় তুলে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। সেদিন তার মনে হয়েছিল, আসুক না দুঃখ, তাপ কত আসবে!—আজ আবার ঘুরে-ফিরে তাকে সেইখানেই আসতে হয়েছে।

* * * * *

লীলার কিন্তু মরা হোলো না। অরুণের চিন্তা তার সমস্ত সংযম, সমস্ত দৃঢ়তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। লীলা সেইখানে বসে বসে ঠিক করলে, অরুণকে একবার শেষ দেখা না দেখে সে মরতে পারবে না। অরুণ কবে আসবে তার ঠিক নাই; কিছু ভয় নাই, তাকে দেখ্‌বার জন্য কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত সমস্ত দুঃখ সহ্য কোরে সে বেঁচে থাকতে পারবে। শিশিটা আবার বুকের মধ্যে রেখে দিয়ে সে আস্তে আস্তে বাড়ীতে ফিরে এল।

অরুণ আসা-মাত্র সুকুমারদের ঘরের আব্‌হাওয়া একেবারে বদ্‌লে গেল। আধঘণ্টা আগে যেখানে তুমুল ঝগড়া চলেছিল, সেখানে আনন্দের স্রোত বইতে লাগ্‌ল। সে তার স্বভাব-সুলভ আনন্দে, তার কথাবার্ত্তায় তাদের বাড়ীখানাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই জম্‌জমাট কোরে তুল্লে। বিলেত থেকে ফিরেই অরুণ সোনালীতে আসে-নি বলে বিরাজ অনুযোগ কর্‌তে লাগ্‌লেন। অরুণের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ায় সুকুমারেরা সোনালীতে কি করেছিল, তার মৃত্যু-উপলক্ষে সেখানে কি হয়েছিল, কোন কাগজ কি লিখেছিল, তাই নিয়ে তাদের মধ্যে খুব একচোট হাসা-হাসি পড়ে গেল। লীলা তাদের কোনো কথায় যোগ দিতে পার্‌ছিল না, চারজনের মধ্যে সে ছিল নির্ব্বাক শ্রোতা।

লীলা দেখ্‌ছিল, অরুণের চেহারার মধ্যে কোনো পরিবর্ত্তনই হয়-নি। তার প্রশস্ত ললাটে বীরত্বের চিহ্নস্বরূপ একটা আঘাতের দাগ ছাড়া আর কিছুই বদল হয়-নি। কিন্তু তার মুখের উপর যে একটা প্রশান্ত প্রফুল্লতা মাখান ছিল, তা আর নাই। কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়ে সে সেই আনন্দটাকে বার-বার ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা কর্‌লেও, লীলা লক্ষ্য কর্‌ছিল, তার হাসি আর তেমন স্থায়ী হচ্ছে না। বিশেষ, সুকুমার যখন তার মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে হাসা-হাসি কর্‌ছিল, তখন সেও হাস্‌ছিল বটে, কিন্তু লীলা বুঝতে পার্‌ছিল যে, সে হাসি তার অন্তরের আনন্দ প্রকাশ কর্‌ছে না। লীলার চোখে অরুণের মুখের এই ভাবগুলো যেমন ভাবে ধরা পড়্‌ছিল, বিরাজ কিংবা সুকুমারের চোখে তেমন ধরা পড়্‌ছিল না। লীলা দেখছিল যে, সে কথা বল্‌তে বল্‌তে থেমে গিয়ে এক-একবার সবার অলক্ষ্যে তার দিকে চাইছে—তার পর আবার তার বক্তব্য সুরু কর্‌ছে।

অরুণকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে লীলার শূন্য অন্তর ক্রমেই যেন পরিপূর্ণ হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তার অন্তর যেন ফুলে ফুলে বলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—

ভোলে-নি, ওগো সে আমায় ভোলে-নি। অনেকদিন পরে আবার তার বাঁচাবার ইচ্ছা হোতে লাগ্‌ল।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে গোলমালে, আনন্দে বিরাজ ও সুকুমার আত্মহারা হোয়ে উঠেছিলেন। ভোর চারটার ট্রেণে সুকুমারের কি একটা কাজে কলকাতায় যাবার কথা ছিল; কিন্তু অরুণ আসাতে কলকাতায় যাওয়ার কথা সে-সাফ ভুলে গেল।

লীলার এই সব আনন্দের অভিনয় আর ভাল লাগ্‌ছিল না। সে ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়্‌ল। ঘরের বাইরের বারান্দায় সুকুমার আর অরুণ দুজনে দু-খানা ইজিচেয়ারে শুয়ে গল্প কর্‌তে আর চুরুট ফুঁক্‌তে লাগ্‌ল। লীলা শুয়ে শুয়ে তাদের সমস্ত কথা শুনতে পাচ্ছিল। বিরাজমোহিনী একবার এসে তাদের বলে গেলেন—অরুণ শুয়ে পড় বাবা, ক্লান্ত হোয়ে এসেছ; সুকুমারকে আবার ভোর চারটের গাড়ীতে কলকাতায় যেতে হবে।

বিরাজের কথা শুনেই লীলার মনে হোলো, সুকুমার এখুনি এই বিছানায় তার পাশে এসে শোবে। আজ সন্ধ্যায় যা হোয়ে গিয়েছে; তার পরে সুকুমারের পাশে শুতে তার অন্তর বিদ্রোহী হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তাদের অন্তরে তার প্রতি যত ঘৃণা ছিল, আজ তারা সমস্ত উজাড় কোরে তার সম্মুখে ঢেলে দিয়েছে।

অন্তরের এই ঘৃণা সুকুমার কেমন কোরে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল তাই ভেবে লীলা আশ্চর্য্য হোয়ে যেতে লাগ্‌ল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল, বিছানা থেকে উঠে দরজাটা বন্ধ কোরে দিই। কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও সে দরজা বন্ধ কর্‌লে না। সে ঠিক কর্‌লে যে, আজকের রাতটা কোনো রকমে কেটে গেলে কালই সে নিজের বাড়ীতে চলে যাবে। স্বামী স্ত্রীর অভিনয় অনেকদিন হয়েছে, আর ভাল লাগে না। মর্‌বার আগের

কটা দিন সেইখানেই কাটাবে। শত্রু-পুরীর মাঝখানে ঐ বাড়ীখানাই ছিল তার সব চেয়ে নিরাপদ দুর্গ। কেমন কোরে তার মা তাঁর দুর্ব্বল ডানার আড়াল দিয়ে বাইরের সমস্ত ঝাপ্‌টা থেকে রক্ষা কোরে তাকে নিয়ে ঐ বাড়ীখানায় বাস করতেন, সে কথা মনে কোরে তার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়্‌ল। এইখানে আসার পর প্রতিদিন সেই মার নিন্দা আর গ্লানি শুনে শুনে অন্তর তার অশুচি হোয়ে গিয়েছে। কিসের জন্য, কার জন্য সে প্রতিদিন এই মাতৃনিন্দা সহ্য করছে! দুর্ব্বল—দুর্ব্বল, সে যে বড় দুর্ব্বল। নানা রকম চিন্তায় তার বুকের মধ্যে কি রকম একটা ধড়্‌ফড়ানি সুরু হোলো। সে দু-হাতে বুক চেপে ধরে অস্ফুট-স্বরে ডাকলে—মা—মাগো—।

শোবার ঘরে আস্‌বার সময় ড্রইং-রুম থেকে লীলা তার বাবা ও মার ছবি দু-খানা নিয়ে এসে একটা টেবিলের ওপরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রেখে দিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে সে মার ছবিখানা দেখ্‌তে লাগ্‌ল; দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই বিষণ্ণ মুখখানা তার চোখের সাম্‌নে যেন জীবন্ত হোয়ে উঠ্‌ল। সে যেন স্পষ্ট শুন্‌তে পেলে, তার মা তার দিকে চেয়ে বল্‌ছেন—কি মা? দুঃখু পেয়েছ? আমার কাছে আস্‌বে?

লীলা ধড়মড়্‌ কোরে উঠে বস্‌ল। তার পর বসে-বসেই চোখ বুঁজিয়ে আবার শুয়ে পড়্‌ল।

লীলার যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন ভোর হোতে অনেক দেরী। সে উঠেই দেখ্‌লে যে, সুকুমার পাশে শোয়-নি। সুকুমার সেই বিছানায় এসে শোয়-নি বুঝতে পেরে লীলা মনের মধ্যে যেন একটু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলে। বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে সে একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌তে পারলে যে, সুকুমার ষ্টেশনে চলে গিয়েছে; অরুণ তাকে ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে আবার ফিরে আস্‌বে। মুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারি কোরে লীলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল।

আধখানা চাঁদ তখন পূব-দিকের একটা উঁচু তালগাছের মাথার ওপর জ্বল্‌জ্বল্ করছিল। তারই একটু দূরে একটা বড় তারা ধক্‌ধক্ করছে। তারাটা যেন ধৈর্য্য ধরে আকাশের কোলে থাকতে পারছে না, সে যেন ঐ চাঁদের কোলে লাফিয়ে পড়তে চায়। চারিদিক নিস্তব্ধ, চন্দ্রাহত পৃথিবীর যেন মূর্চ্ছা হয়েছে। লীলা সেই চন্দ্রালোকিত পথ বেয়ে চলতে চলতে ভাবছিল—একা একা, পৃথিবীতে তার কোনো বন্ধু নাই, সহায় নাই। আজকে যেমন এই মরা পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে একলা সে পথ বেয়ে চলেছে, বাঁচতে হোলে সারা-জীবন তাকে এম্‌নি কোরেই চলতে হবে। এমন কোরে আর কত দিন কাটবে।

বেড়াতে বেড়াতে সে নিজেদের বাড়ীখানার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। রাস্তা থেকে তাদের সাদা বাড়ীখানা দেখা যাচ্ছিল। ভুবনের মৃত্যুর পর লীলা সে বাড়ী ভাড়া দেয়-নি, ভুবনের সেই সাজান বাড়ী তখনো যেমন ছিল, আজও তেম্‌নি আছে। বাড়ীর পরিচর্য্যা যাতে ঠিক রকম হয়, সেজন্য সে লোক রেখে দিয়েছিল। সে রাস্তা থেকে একবার মালীর নাম ধরে ডাক দিলে। কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে সে আবার এগিয়ে চলতে লাগল।

রাত্রির নিস্তব্ধতা চিরে দিয়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজ কোরে একটা ট্রেন ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ট্রেনের বাঁশী শুনে লীলা বুঝতে পারলে—এতক্ষণে চারটে বাজল। সে হাঁটতে হাঁটতে তার বাল্যের বন্ধু সেই বৃক্ষলতাহীন পাহাড়টার ওপরে গিয়ে বসে পড়ল।

আধখানা চাঁদ তখন পূব-গগনের গা গড়িয়ে অনেকটা নেমে পড়েছে। জ্যোৎস্না ম্লান হোতে হোতে মাঠ, পথ ও দূরের গাছগুলো আবছায়ায় ঢাকা পড়ে যেতে লাগল। দূরে, কাছে, লীলার আশে-পাশে গাছের ঝিঁঝি-পোকাগুলো গান শেষ করবার আগে প্রাণপণে জলদ তানে গলা

সেধে নিচ্ছিল। এই আলো ও অন্ধকারের সঙ্গমে লীলা সেই পাহাড়ে বসে বসে ভাব্‌ছিল—পৃথিবী যেন একটা বিরাট অন্ধকার খোলের মতন, আর মানুষগুলো এই অন্ধকারের মধ্যে ছুটোছুটি কর্‌ছে—সবাই ছুটে চলেছে, কিসের তাড়ায় তা কেউ জানে-না। এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে কখনো বা কারো হাতে আর একখানা হাত এসে ঠেকে। সেই হাতের পরশ পাওয়া-মাত্রই বুঝতে পারা যায় যে, এই স্পর্শে কি বিশ্বাস, কি নিবিড় বন্ধুত্ব মাখান রয়েছে। সেই হাতে হাত দিয়ে মানুষ নির্ভয়চিত্তে সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে—হঠাৎ কখন একটা প্রবল ঝট্‌কায় হাত ছাড়াছাড়ি হোয়ে যায়; সমস্ত জীবন ধরে মানুষ সেই হাতখানির স্পর্শ পাবার জন্য অন্ধকারে ঘুরে মরে, কিন্তু যে যায়, তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না।

লীলা এক মনে এই রকম নানা চিন্তায় বিভোর হোয়ে বসেছিল, বাইরের কোনো জ্ঞানই তার ছিল না, হঠাৎ অরুণের গলার আওয়াজ পেয়ে সে চম্‌কে উঠ্‌ল। অরুণ বল্‌ছিল—কে! লীলা এখানে একলাটি বসে আছ?

সুকুমারকে পৌঁছে দিয়ে অরুণ বেড়াতে বেড়াতে লীলাদের বাড়ী অবধি এগিয়ে এসেছিল। সেখান থেকে পাহাড়টা দেখে একবার সেখানে যাবার প্রলোভন সে সাম্‌লাতে পারে-নি। পাহাড়ের ওপরে সেই পরিচিত স্থানটীতে লীলাকে বসে থাক্‌তে দেখে সে আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিল। এ সময় এমন-ভাবে লীলাকে এখানে বসে থাক্‌তে দেখ্‌বে, এ-কথা সে স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারে-নি।

অরুণের কথা শুনে লীলা চম্‌কে উঠেছিল। সে কোনো কথা বলবার আগেই অরুণ আবার বল্লে—কতক্ষণ এখানে বসে আছ?

লীলা অরুণের একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পার্‌লে না। কে যেন প্রাণপণ শক্তিতে তার গলাটা চেপে ধর্‌তে লাগ্‌ল। তার বুকের ভেতরকার যন্ত্রগুলো বিদ্রোহী হোয়ে পাঁজরা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। তার বোধ হোতে লাগ্‌ল, যেন এখুনি সে মূচ্ছিত হোয়ে পড়্‌বে। মনের জোরে কোনো রকমে দেহটাকে ঠিক রেখে লীলা বল্লে—আপনি—তুমি ষ্টেশন থেকে সোজা এখানে চলে এসেছ বুঝি?

অরুণ বল্লে—হ্যাঁ, দেখ্‌লুম রাতটা বেশ পরিষ্কার, একটু বেড়াবার সখ হোলো।

অরুণ লীলার সাম্‌নে একখানা পাথরে ধপ্‌ কোরে বসে পড়্‌ল।

তারপর দুজনের কারো মুখে কোনো কথা নেই।

অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ থাকার পর অরুণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেমন আছ লীলা?

লীলা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে? তার মন বল্‌তে লাগ্‌ল—কেমন যে আছি, সে কথা কেমন কোরে জানাব? কেমন আছি সে কথা প্রকাশ করবার ভাষা এখনো তৈরি হয়-নি। তার চোখ জলে ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অশ্রুর আবেগ রোধ করবার চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে তার বুকের মধ্যে আবার সেই রকম অনুভূতি হোতে আরম্ভ হোলো। কিন্তু এতদিন যে উৎস-মুখে পাথর চাপান ছিল, অরুণের একটি মাত্র আহ্বানে সে পাথর সরে গিয়েছে, এখন সে সহস্র বাধা উপ্‌চে তার স্বাভাবিক গতি ফিরে পেয়েছে—লীলার মনের শক্তি তার অশ্রুর কাছে হার মান্‌লে। সে দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

অরুণ যে কি কর্‌বে তা ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিল না। লীলাকে

কাঁদ্‌তে দেখে তার অন্তরও উদ্বেলিত হোয়ে উঠ্‌ছিল; সে পুরুষ, চোখ জলে ভরে উঠ্‌লেও সে দৃঢ় হোয়ে বসে রইলো। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর অরুণ বল্লে—কেঁদ-না লীলা, তুমি কেমন আছ এখানে এসেই আমি তা জানতে পেরেছি। তোমার সঙ্গে তোমার শাশুড়ী ও সুকুমারের যে সব কথা হচ্ছিল তার প্রতিবর্ণ আমি দরজার আড়াল থেকে শুনেছি। আমি পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ তোমাদের অবাক কোরে দেবার জন্য—কিন্তু তার আগে তোমরাই আমাকে অবাক কোরে দিলে।

লীলা অরুণের কথা শুনে হাতের মধ্যে থেকে মাথা তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে তাকালে। তার চুলের একটি সরু গোছা সাম্‌নের দিকে ঝুলে পড়েছে, চোখের জলে কয়েক গাছা চুল গালে; কপালে ও মুখের এখানে-সেখানে লেগে রয়েছে। অরুণও লীলার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লে কিন্তু, আমি আশ্চর্য্য হোয়ে যাচ্ছি লীলা—আমি আশ্চর্য্য হোয়ে যাচ্ছি—সুকুমারকে তুমি বিয়ে কর্‌লে কেন?

লীলা বল্লে—ভুল—ভুল—মহাভুল! দাবা খেল্‌তে বসে একটি চালের ভুলে যেমন সমস্ত খেলা পণ্ড হোয়ে যায়, আমার জীবনের দাবা খেলায় কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে আমি আমার দাবাটাই হারিয়ে ফেলেছিলুম; প্রতিপক্ষ ছিল সতর্ক, সে আমার দুর্ব্বলতার সুযোগে বাজী জিতে নিয়েছে।

লীলা অরুণকে তাদের বিয়ের সমস্ত ইতিহাস খুলে বল্লে। তার মার মৃত্যুর কথা, অমৃতর মৃত্যুর কথা, তার বিবাহিত জীবনের সমস্ত ইতিহাস একটি একটি কোরে সমস্ত বলে গেল। সব কথা বলা শেষ হোয়ে গেলে লীলা বল্লে—তুমি কেন আমায় চিঠি লেখ-নি? সুকুমারের

কাছে শুনেছি যে, স্মৃতিশক্তি হারিয়ে অনেকদিন তুমি হাঁসপাতালে পড়েছিলে। ভাল হোয়ে কেন আমায় জানালে না যে, তুমি বেঁচে আছ? তুমি বেঁচে আছ এ-সংবাদটাও যদি পেতুম—

অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে অরুণ বল্লে—স্মৃতি ফিরিয়ে পাবার পরেও কিছুদিন আমাকে চিকিৎসার অধীনে থাকতে হয়েছিল, কারণ সব কথা তখনো আমি গুছিয়ে ভাবতে পারতুম না। যেদিন সম্পূর্ণ স্মৃতি ফিরে এল সেদিন আমার প্রথমেই মনে পড়েছিল—আমার লীলা, আমার সোনালীর সোণা রংয়ের মাঠ! তাড়াতাড়ি এখানে ফিরে আসবার জন্য আমি ভালো কোরে সেরে ওঠবার আগেই লণ্ডনে ছুটে গিয়েছিলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন শুনলুম তোমার বিয়ে হোয়ে গিয়েছে। তখন মনে হয়েছিল, বিস্মৃতির অতলে যা তলিয়ে গিয়েছিল, আবার কেন তা ভেসে উঠল।

অরুণের গলার স্বর বন্ধ হোয়ে এল। সে আর কিছু বলতে পারলে না, চুপ্ কোরে রইলো।

আবার কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নাই। একটু পরে অরুণ নিস্তব্ধতা ভেঙে বল্লে— চল লীলা, আমরা দুজনে এখান থেকে চলে যাই।

অরুণের কথা শুনে লীলা স্থির-দৃষ্টিতে একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে।

অরুণ বলতে লাগল—চল লীলা, আমরা এখান থেকে চলে যাই, এমন জায়গায় পালিয়ে চল, যেখানে এখানকার কোনো লোকে তোমার সন্ধান পাবে না, আমরা সেখানে গিয়ে আদর্শ সংসার পাতব।

হঠাৎ একটা পাখীর চীৎকার শুনে অরুণ থেমে গেল। যেন গাছের ওপরে একটা ছোট ছেলে ককিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর আবার নিস্তব্ধ,

নিঝুম। অন্ধকার তখনো যায়-নি। তখন ভোরের বাতাস লেগে গাছগুলো আড়ামোড়া দিয়ে জাগ্‌তে আরম্ভ করেছে মাত্র। ঠাণ্ডা বাতাস লেগে লীলার দেহ কেমন একটা অবসাদে ভেরে আস্‌ছিল। কিছুক্ষণ চুপ্‌ কোরে থেকে অবসাদটা ঝেড়ে ফেলে সে বল্লে—না অরুণ, তোমার সঙ্গে পালিয়ে আমি যেতে পার্‌ব না—কিছুতেই না—সে অসম্ভব—

বল্‌তে বল্‌তে লীলা কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হোয়ে কেঁদে উঠে বল্লে—তোমার পায়ে পড়ি অরুণ, আমায় অমন প্রলোভন দেখিও-না।

অরুণ বল্লে—কিন্তু আমি দেখ্‌ছি যে, সুকুমার তোমায় ভালবাসে না, তুমিও সুকুমারকে ভালবাস না, তুমি যদি এখানে থাক তা হোলে দিনে দিনে তোমাদের দুজনকার মনের ভাব নানা মূর্ত্তি ধরে প্রকাশ হোয়ে পড়্‌বে। তাতে সুকুমারের অবস্থা কতটা কি হবে বল্‌তে পারি না, কিন্তু তোমার জীবন আরও দুর্ব্বিসহ হোয়ে উঠ্‌বে, এ ক্ষেত্রে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন কোরে দেওয়াই উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল। কিন্তু আইনতঃ তা যদি অসম্ভব হয়, তা হোলে অন্ততঃ সুকুমারের আশ্রয় ছেড়ে তোমার অন্যত্র গিয়ে থাকা উচিত। তাই বল্‌ছিলুম—

হঠাৎ অরুণের গলার স্বর গাঢ় হোয়ে এল। সে কথা বল্‌তে বল্‌তে থেমে গিয়ে একটু পরেই বল্লে—লীলা, তুমি কি আমায় এখনো ভালবাস?

লীলা এতক্ষণ নির্জ্জীবের মত বসে কলের পুতুলের মত উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অরুণের এই প্রশ্ন যেন তার সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎ ছড়িয়ে দিয়ে। সে আবেগের সঙ্গে বলে ফেল্লে—ভালবাসি, ভালবাসি, অরুণ তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা। সুকুমারকে আমি ভালবাস্‌বার চেষ্টা করেছিলুম,

কিন্তু তাকে ভালবাস্‌বার অবসরই সে আমায় দেয়-নি। এই দুর্বিসহ জীবনের মধ্যে তোমার চিন্তাই আমার ছিল শান্তি। আমি দু-তুবার আত্মহত্যা কর্‌তে গিয়েছিলুম, মর্‌লে তোমায় দেখ্‌তে পাব এই আশায়। যখন শুন্‌লুম যে, তুমি বেঁচে আছ, তখন তোমায় পাব না এই চিন্তা আবার আমাকে মৃত্যুর দরজা অবধি টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন মর্‌তে পারি-নি—শুধু—শুধু, তোমায় একবার দেখ্‌ব বলে।

অরুণ উৎসাহিত হোয়ে লীলার একখানা হাত চেপে ধরে বল্লে—তবে তুমি আমায় ভালবাস—

—সেইজন্যই তোমার সঙ্গে আমি পালাব না। তোমার সঙ্গে চলে গেলে আমার যে নিন্দা হবে, সে নিন্দাকে আমি গ্রাহ্য করি-না। কিন্তু লোকে বল্‌বে যে, তুমি সুকুমারের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছ, লোকে বল্‌বে, অরুণ তার বন্ধুর স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বন্ধুত্বের ইতিহাসে তোমার নাম চির-কলঙ্কের মত দাগা হোয়ে থাক্‌বে। সে কথা আমি কল্পনাতেও সহ্য কর্‌তে পারি-না। আর—আর তুমি জান যে, আমার মা কুলত্যাগ কোরে আমার বাবার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন, আমার শাশুড়ী আমার মুখের সাম্‌নেই বলেন যে, কবে আমিও আমার মার মত পালিয়ে যাব। সমাজশুদ্ধ লোক বলে যে, পালিয়ে যাওয়াই আমার পক্ষে স্বাভাবিক—কারণ আমার মা ঘর ছেড়ে চলে এসেছিলেন। আজ যদি আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই, তা হোলে সমাজশুদ্ধ লোক আস্ফালন কোরে বল্‌বে যে, তাদের হিসাবই ঠিক হয়েছে। সমাজের লোকের সে আস্ফালনকে অবশ্য আমি গ্রাহ্য করি না, আমার মতন অবস্থায় পড়লে আমার শাশুড়ী কি কর্‌তেন তাও বল্‌তে পারি না। কিন্তু আমি যদি আজ তোমার সঙ্গে চলে যাই, তা হোলে আমার মতন অভাগিনী যারা সমাজে এসে বাস কর্‌তে চায়, তাদের আস্‌বার পথ বন্ধ হোয়ে যাবে। তাই সমাজকে অগ্রাহ্য কোরেও আমি এ কাজ

কর্‌তে পার্‌ব না। আমাকে ক্ষমা কর অরুণ, তোমাকে এ কথা জানাতে আমার অন্তরে যে কি বেদনা হচ্ছে, নিজের অন্তর দিয়ে তা বোঝ্‌বার চেষ্টা কর।

এই অবধি বলেই লীলা চুপ কর্‌লে। অরুণ তখনো তার হাতখানা ধরেছিল, লীলার চোখ থেকে দু-ফোঁটা অশ্রু তার হাতে এসে টপ্‌টপ্‌ কোরে পড়্‌ল। লীলা কিছুক্ষণ চুপ্‌ কোরে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু স্থকুমারের সঙ্গে আর আমি থাক্‌তে পার্‌ব না। এইভাবে প্রতিদিন অপমানিত ও অবজ্ঞাত হোয়ে জীবন ধারণ করা আমার পক্ষে অসহ্য হোয়ে উঠেছে। অনেকদিন আগেই আমি এই দেহভার নামিয়ে দিতুম, কিন্তু শুধু তোমাকে দেখ্‌বার জন্যই এতদিন তা কর্‌তে পারি-নি। এবার আমি নিশ্চিন্ত মনে সংসারকে অভিশাপ দিতে দিতে মর্‌তে পার্‌ব। আর আমার আশা কর্‌বার কিছুই নাই।

লীলার কথা শুনে অরুণ শিউরে উঠ্‌ল। সে তার হাত দু-খানা চেপে ধরে বল্লে—লীলা, লীলা, এ-কাজ তুমি কখনো কর্‌তে পার্‌বে না। আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি আত্মহত্যা কর্‌বে না? এই জীবন এমন কোরে হেলা-ফেলায় নষ্ট কর্‌বার জিনিষ নয়—

ক্রুদ্ধা সর্পীর মত গর্জ্জে উঠে লীলা বল্লে—তবে! তবে কি তুমি আমায় এইখানেই থাক্‌তে বল? এইখানে, প্রতিদিন, জাগ্রত অবস্থায় প্রতি মুহূর্ত্ত আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে যে, আমার জন্ম কলুষিত। প্রতিদিন আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হবে—তুমি সকলের নীচে, কারণ তুমি জারজ। তুমি সাবধান! কারণ তোমার পিতা চরিত্রহীন, মাতা চরিত্রহীনা। দিনের মধ্যে অন্ততঃ দু-বার কোরে আমাকে জানান হবে যে, তোমার মধ্যে যতটুকু ভাল, সে আমাদের মত লোকের সংস্পর্শে এসে হয়েছে, নইলে তুমি তো কিছুতেই ভাল হোতে পার না, তুমি যার গর্ভে

জন্মেছ, তুমি যার ঔরসে জন্মেছ তারা যে কেউ ভাল ছিল না। আমার স্বামী—যে একদিন বলেছিল—তোমাদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তোমাকে বিয়ে কোরে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই—যার কথা শুনে মানুষের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গিয়েছিল, সেই স্বামী কথায় ও ইঙ্গিতে রোজই জানাতে থাকবে—তোমায় বিয়ে কোরে আমার জীবন নিষ্ফল হোয়ে গিয়েছে। যার প্রত্যেক কথাতে ফুটে ওঠে—তোমাকে বিয়ে কোরে নিজে লোকচক্ষে হীন হোয়েও আমি তোমাকে সমাজে স্থান দিয়েছি। এই মহত্ত্বের জন্য আমার সমস্ত অবহেলা বিনাবাক্যে তুমি সহ্য করবে। যাকে আমি নিজের ভাইয়ের মত ভালবেসেছি, আমাদের ওপর ঈশ্বর ও মানুষে মিলে যত অত্যাচার করেছে, সবার মধ্যে একমাত্র যে এসে আগে অযাচিতভাবে বুক দিয়ে পড়েছে—আমাদের সংসার ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু তুমি তো জান যে, সেই ক্ষুদ্র সংসারটীর মধ্যে কত বড় বিশ্বজোড়া অশান্তি বাসা বেঁধে বসেছিল। সমস্ত অশান্তি, অন্তর ও বাহিরের সমস্ত আক্রমণের মধ্যে যে মূর্ত্ত কল্যাণের মত তার সমস্ত শক্তি দিয়ে লজ্জার বিনিময়ে আমাদের রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে—আমার স্বামী, সেই পবিত্র নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে। দাসী-চাকরদের সামনেও আমাকে এই সব সহ্য করতে হয়েছে, আর বাঁচতে হোলে চিরকাল তাই সহ্য করতে হবে। এই সব সহ্য কোরে তুমি আমায় বেঁচে থাকতে বল?

লীলা আবার হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

অরুণ বল্লে—শোন লীলা, মুখ তুলে, শোন, কেঁদ-না।

অরুণের দৃঢ় ও গম্ভীর স্বর শুনে লীলা চমকে উঠল। তার কথায় এ-রকম সুর সে আজ পর্য্যন্ত কখনো শোনে-নি। লীলা আঁচলে মুখ মুছে অরুণের দিকে চেয়ে দেখলে যে, তার চোখ-মুখ ঘিরে একটা

নির্ম্মমতা বিরাজ করছে। সে ইচ্ছা কোরেও তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলে না। এই কঠোরতা কিন্তু তার মুখের ওপর বেশীক্ষণ স্থায়ী হোলো না। দেখতে দেখতে তার মুখে আবার সেই পুরোন দিনের প্রসন্নতা ফিরে এল। সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই জ্বলজ্বলে চাহনি। লীলার মনে পড়ছিল, কতকাল সে এই মুখ দেখে-নি! আত্মহারা হোয়ে সে বর্ত্তমান হারিয়ে ফেল্লে। তার মনে হোতে লাগল, তারা যেন সেই পুরোন দিনের মত ছুটিতে মিলে পাহাড়ে বসে আছে। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের ফিকে অন্ধকার তার কাছে সন্ধ্যার আবছায়া বলে মনে হোতে লাগল।—এই বুঝি তাদের প্রথম সেই মিলনের দিন। এই মাত্র সে তার গান শেষ করেছে। গানের সুর আর কথা বাতাসে এখনো বেশী দূর উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে-নি। এখনো যেন শোনা যাচ্ছে—

কখন বেলা শেষের ছায়ায় পাখীরা যায় আপন কুলায় মাঝে
সন্ধ্যাপূজার ঘণ্টা কখন বাজে—

হঠাৎ অরুণের গলার শব্দ শুনে তার স্বপ্ন ভেঙে গেল। কে যেন তাকে সুখের কল্পনা-রাজ্য থেকে টেনে এনে বাস্তবের পাথরে আছড়ে ফেলে দিল।

অরুণ বল্লে—দেখ লীলা, এখানকার লোকেরা তোমার ওপর, তোমার মাঁর ওপর অবিচার করেছে, অত্যাচার করেছে সত্য কথা। নির্জ্জিতেরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে কোথাও আশ্রয় নেয়, না হয় অত্যাচারীদের হাতে আত্মসমর্পণ করে অথবা আত্মহত্যা কোরে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই তিনটি পথই দুর্ব্বল আর কাপুরুষেরা আবিষ্কার করেছে। মানুষের মনে অত্যাচার করবার, পীড়ন করবার যে পাশব প্রবৃত্তি আছে কোথাও সে সুযোগ পেয়ে নানারকম বীভৎস মূর্ত্তি ধরে দেখা দেয়, কোথাও বা সেটা সুপ্ত থাকে; অনুকূল অবস্থা পায় না বলে তার আর

স্ফূর্ত্তি হয় না। তুমি, আমি অথবা পৃথিবীতে যারা নিজেদের অত্যন্ত পীড়িত ও অত্যন্ত নিরীহ বলে মনে করি তাদের অন্তরেও এই ভাব সুপ্ত আছে, অনুকূল অবস্থার অভাবে তা ফুটে উঠ্‌তে পারে-নি। কিংবা যাদের পীড়ন কর্‌বার প্রবৃত্তি একেবারেই নেই তারা যখন অন্যের পীড়ন বিনা আপত্তিতে সহ্য করে তখন, তারাও ক্ষমার পাত্র নয়, কারণ সে পীড়িত হয় কেন? অত্যাচারীর অত্যাচার বিনা আপত্তিতে সহ্য করাও পাপ, কারণ তাতে অত্যাচারীকে আরও প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তোমার মার কথা একবার মনে কর। সুকুমারের মা যখন অমৃতকে বাড়ীতে আস্‌তে দিতে বারণ করেছিলেন, তখন তিনি কি ভাবে তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে কি না সহ্য কর্‌তে হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে সংকল্প-চ্যুত কর্‌তে পারা যায়-নি। সমস্ত জীবন কি শান্তভাবেই তিনি কাটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তোমার কাছে তাঁর জীবনের কথা যা শুনেছি, আর আমি নিজেও যা দেখেছি, তাতে আমি আশ্চর্য্য হোয়ে গেছি। কখনো কোনো দুঃখে তাঁকে ধৈর্য্য হারাতে দেখেছ? তাঁর মেয়ে হোয়ে তুমি আত্মহত্যা কর্‌তে চাইছ? ছিঃ লীলা!

লীলা বল্লে—মার মত সহ্যগুণ আমার নেই, মার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থার তুলনাও চলে-না। এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার আর কোনো উপায়ও নাই। তুমি ছাড়া জীবনে আমার কোনো বন্ধন নেই; কিন্তু তোমাকে আর পেতে পারি-না। নিষ্ঠুর ঝোড়ো-হাওয়া বনস্পতির কিছু কর্‌তে না পেরে যেমন অসহায় পাখীর বাসা উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্ত আমাকে দুর্ব্বল পেয়ে তোমার কাছে থেকে দূরে—বহুদূরে নিয়ে গিয়েছে।—তুমি ছাড়া জীবনে আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই, শুধু এই মাংসপিণ্ড আর বয়ে বেড়াতে পারি-না।

লীলার কথা শুনে অরুণ চুপ্ কোরে রইলো। তার হৃদয়ের মধ্যে

তখন তুমুল ঝড় উঠেছে, মদের ফেণার মত সে আবেগ উপ্‌চে পড়্‌তে চাইছিল। কিন্তু সে নিজেকে সংযত কোরে বল্লে—জীবনের উদ্দেশ্য নাই কেন? জীবনের একটা উদ্দেশ্য স্থির কর। অবিশ্যি আজকের রটনার পর আর সুকুমারদের ওখানে থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে। তুমি তাদের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে তোমার বাড়ীতে চলে যাও। তোমার মা ও অমৃত-দা যে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা কোরে গেছেন, সেইখানে সেবার কাজে জীবনকে লাগিয়ে দাও। মানুষ তোমাকে আঘাত দিয়েছে, তুমি চেষ্টা কর মানুষের মনে যে হিংসার প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে তা থেকে তাকে মুক্তি দিতে। আমাকেও তোমার কাজে টেনে নাও। পৃথিবীতে আমাদের দু-জনেরই কেউ নাই, আমরা তাই মানুষের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারব। মানুষের মনে মানুষের প্রতি অত্যাচার করবার যে ভীষণ প্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন হোয়ে আছে, তার স্বরূপ চেহারা তুমি তো দেখ নি লীলা—সে আমি দেখেছি;—মানুষ মার্‌বার জন্য মানুষ কত রকমের যন্ত্র তৈরি করেছে, কোন্ উপায়ে বেশী মানুষ একসঙ্গে মেরে ফেল্‌তে পারা যায় তার জন্য মানুষ দিনরাত্রি কত মাথা ঘামাচ্ছে, তার খোঁজ তুমি তো জান না! যুদ্ধক্ষেত্রে আমি দেখেছি, এক-একটা কামানের গোলা শত শত মানুষকে চিরকালের জন্য ঘুম পাড়িয়ে রেখে চলে যাচ্ছে; কারো মাথা নেই, কারো হাত নেই, কারো পা নেই, কারো বা আধখানা ধড় নেই। রক্তের চাপ জমাট বেঁধে কালো হোয়ে গিয়েছে। রক্তের গন্ধে বাতাস বিষিয়ে উঠেছে—যেন মানুষের মনের আসল মূর্ত্তিখানা রক্তের গন্ধ পেয়ে ভাল-মানুষীর খোলের মধ্যে আর লুকিয়ে থাকতে না পেরে আত্মপ্রকাশ কোরে ফেলেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছি সৈন্যরা যখন লড়াইয়ে মেতে ওঠে, তখন এক পক্ষের লোকেরা অন্যপক্ষের লোকের বুকে কি অবলীলায় সঙ্গীন বসিয়ে দেয়! আলাপ নেই, পরিচয় নেই, বিবাদ-শক্রতা নেই, কোনোকালে দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নেই, শুধু

একটা নির্ব্বোধ স্বার্থের জন্য মানুষ দিবারাত্র মানুষের বুকে এমনি কোরে তলোয়ার হেনে চলেছে। যুদ্ধের হাঁসপাতালে রুগীদের সেবা করতে করতে আমার মনে হোতো যে, আশ্চর্য্য নয়, এই মানুষই একদিন খৃষ্টকে ক্রুশে বিঁধিয়ে মেরে ফেলেছিল, আশ্চর্য্য নয় যে, এরাই একদিন সক্রেটিসের মত লোককে বিষ দিয়ে মেরেছিল, মানুষ জ্বালিয়ে মশাল তৈরি করেছিল। আশ্চর্য্য নয় যে, এই মানুষই একদিন আমাদের দেশের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মঠ সমেত পুড়িয়ে মেরেছিল। কিন্তু আমার আশ্চর্য্য লাগ্‌ত যে, এরাই আবার ভগবানের পূজা করে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, যারা ভগবানকে অস্বীকার করে তাদের এরা ঘৃণার চক্ষে দেখে। ভগবানকে স্বীকার কোরে এরা সমস্ত কাজই কোরে যায়, কিন্তু তাঁকে অস্বীকার কোরে, মানুষের মঙ্গলের জন্য তুমি যত কিছুই কর না কেন, এদের হাতে তোমার আর নিস্তার নাই।

আবেগের মুখে অনেকক্ষণ কথা বলে অরুণ হাঁপাতে লাগ্‌ল। তার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে লীলা অন্তরে ক্ষীণ একটা সাড়া পাচ্ছিল। এ আহ্বান সে এর আগে আর কখনো শোনে-নি। চারিদিক থেকে সে যেন শুনতে পাচ্ছিল—মানুষ পশু—মানুষ পশু।

তার চিন্তাস্রোত থামিয়ে দিয়ে অরুণ আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে— বিবর্ত্তনে মানুষের হাত-পা, আকৃতিরই শুধু পরিবর্ত্তন হয়েছে; পশুত্বের খোলস তার অঙ্গ থেকে ঝরে গিয়েছে বটে, কিন্তু তার আসল জায়গাটা পশুই থেকে গিয়েছে। তাই অমানুষরা আসল মানুষদের মহা-মানুষ বলে কল্পনা করে। মানুষের মন থেকে এই হিংসার প্রবৃত্তি মুছে ফেলে দিতে হবে। এই কাজে তুমি আমার সহায় হও লীলা। জগতে যাদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, তারা ছাড়া এ-কাজ তেমন কোরে আর কেউ করতে পারবে না। আত্মহত্যা করতে চাইছিলে? জীবন উদ্দেশ্যবিহীন মরুভূমির মত

হোয়ে গিয়েছে বল্‌ছিলে? এই কাজে লেগে যাও, মানুষকে মুক্তি দাও।

অরুণের কথায় লীলার অন্তর যেন ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, একটা ক্ষীণ উৎসাহের চাঞ্চল্যে তার সর্ব্বাঙ্গ একবার শিউরে উঠ্‌ল। অভিভূতার মত সে অরুণকে বল্লে—কি কোরে এ কাজ আরম্ভ কর্‌বে? আমি তোমায় কি সাহায্য কর্‌ব? আমার কি শক্তি আছে?

—নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখ। কি কোরে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে তা আমিও জানি না। শুধু জানি যে, কর্‌তে হবে। এ কাজে তুমি আমায় সাহায্য কর, তোমরা নারী শক্তিস্বরূপিণী, তোমরা যদি পুরুষকে সাহায্য কর, তা হোলে তারা অসম্ভবকেও সম্ভব কোরে তুলতে পারে। পুরুষের অত্যাচার, পুরুষের প্রভুত্ব তোমরা মেনে নিয়েছ বলেই নারীর ওপরে প্রভুত্ব কর্‌বার তাদের একটা সংস্কার হোয়ে গিয়েছে। এই প্রভুত্বের বোঝা ঠেলে ফেলে দিয়ে তোমরা বন্ধুর মত পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াও। জোর কোরে তাদের জানিয়ে দাও—তোমাদের পশুপ্রবৃত্তি যদি সম্বরণ না কর, তা হোলে তোমাদের সন্তান আর আমরা গর্ভে ধারণ করব না।

অরুণ আবার চুপ্‌ কর্‌ল। তারপর লীলার একখানা হাত ধরে স্নেহস্নিগ্ধ-স্বরে বল্লে—লীলা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ সহ্য করেছ, পীড়িতের দুঃখ তুমি জান। অন্যের চেয়ে অনেক বেশী বোঝ।—তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও বন্ধু! আমরা মানুষের এই পশুত্ব মানুষের চোখের সাম্‌নে একবার ভাল কোরে খুলে দেখিয়ে দিই। মানুষের তৈরি অর্থ-শাস্ত্র আর সমাজ-বিজ্ঞান, দানবের তৈরি রাজনীতি সব বিলুপ্ত কোরে দিয়ে একমাত্র শাস্ত্র রেখে দিতে হবে। এই শাস্ত্র মানুষকে মানুষের মত বাঁচ্‌তে শেখাবে। মানুষকে বুঝতে হবে যে, অবস্থার ভেদ কি চাম্‌ড়ার রংয়ে তফাৎ থাক্‌লেও

সে মানুষ। কামানের শক্তিই যে, একমাত্র শক্তি, এই সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত কোরে সমস্ত জগতকে একই মনুষ্যত্বের বন্ধনে বাঁধ্‌তে হবে। আমাদের জীবনে যদি এ-কাজ সম্ভব না হয়—কোনো ক্ষোভ নাই, আমরা যে বীজ বপন কোরে রেখে যাব, একদিন সে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হবে।

তখন সূর্য্যোদয় আরম্ভ হয়েছে। উদয়গিরি-চূড়ার সোণার রং পৃথিবীতে ঠিক্‌রে পড়ে চোক ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। অরুণের স্পর্শে লীলার ধমনীতে তড়িৎ-প্রবাহ ছুটছিল; তার দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে লীলার মনে হোতে লাগ্‌ল, অরুণ যেন তার কাছ থেকে সরে সেই দিগন্ত-সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ডাক্‌ছে। অরুণের কথাগুলো তখনো তার কাণে বাজ্‌ছিল—এস চলে এস, ধরার এই ক্লান্তি, এই অবসাদ দুর কর। তোমরা নারী, তোমরা সহায় হোলে পুরুষ অসম্ভবও সম্ভব কর্‌তে পারে—

লীলার মনে হোতে লাগ্‌ল, এ যেন সে অরুণ নয়, এ যেন দেবতা অরুণ সূর্য্যের রথ নিয়ে অত্যাচার ও শান্তির মিলন রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে। অত্যাচারের দিকে তার দুই হাত প্রসারিত—সে আহ্বানে কি বরাভয়! সেই মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে লীলার অবসাদ ঘুচে যেতে লাগ্‌ল। নির্য্যাতন সহ্য করার তামসিক অশুচিতা কেটে গিয়ে অন্তর তার এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হোয়ে উঠ্‌ল। সে হাত বাড়িয়ে অরুণের হাত ধরে বল্লে—তুমি আমায় গ্রহণ কর, আমায় তোমার কাজে পরিচালিত কর, আমায় উদ্ধার কর।

অরুণ লীলার হাত ধরে তুলে বল্লে—এস লীলা, এই কাজে তুমিই আমার ঠিক সহকর্ম্মিণী হোতে পার্‌বে। পুরোন দিনগুলোর কথা ভুলে যাও সখি! আমরা যা ভেবেছিলুম, বিধাতার তা ইচ্ছা ছিল না। আজ আমাদের জীবনে এই নতুন সূর্য্যোদয় হোলো, আবার নতুন কোরে

আমরা জীবন আরম্ভ করব। ঈশ্বরের কাছে এই ভিক্ষা চাই যেন আজকের এই নতুন সূর্য্য আমাদের ভবিষ্যৎ-জীবনকে অন্ধকার থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত করে।

লীলা ও অরুণ দুজনে সূর্য্যের দিকে মুখ কোরে এক সঙ্গে নীচু হোয়ে ঈশ্বরকে প্রণাম করলে।

তখন নবযুগের নবীন সূর্য্য দিগন্ত সীমা ছাড়িয়ে নীল সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়েছে.........

শেষ